কোরআনের মু'জিযাহ্

আল্লামাহ্ সাইয়েদ আবুল কাসেম খূয়ী (রহ্ঃ)- এর

আল্- বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

অবলম্বনে

নূর হোসেন মজিদী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

ইসলামের ‘আক্বাএদ্ বা মৌলিক উপস্থাপনাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান তিনটি বিষয় হচ্ছে তাওহীদ্, আখেরাত ও নবুওয়াত। তাওহীদ্ অর্থাৎ এ জীবন ও জগতের পিছনে একজন অদ্বিতীয় পরম জ্ঞানী সত্তা তথা আল্লাহ্ তা‘আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া এবং পার্থিব জগতে না হলেও মৃত্যুপরবর্তী অন্য কোনো জগতে ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল প্রকাশের জন্য মানবপ্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা, আর তা পূরণে মহাক্ষমতাবান আল্লাহ্ তা‘আলার সক্ষমতা অনুভব করার অনিবার্য দাবী হচ্ছে মানুষ এ পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ তা‘আলার পসন্দনীয় ও দায়িত্বশীল জীবন যাপন করবে।

মানুষ খোদায়ী পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী

এ ধরনের বাঞ্ছিত জীবন যাপনের জন্য মানুষ কতক বিষয়ে সহজাত পথনির্দেশের অধিকারী এবং কতক বিষয়ে তার বিচারবুদ্ধি (عقل - Reason) তাকে পথনির্দেশ দানে সক্ষম। কিন্তু কতক বিষয়ে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন কারণে তার সহজাত প্রকৃতি বিকৃত হতে পারে এবং বিচারবুদ্ধি ভুল করতে পারে। এ কারণে সে এ সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে পথনির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করে। মানুষের বিচারবুদ্ধি এ উপসংহারে উপনীত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী করেছেন এবং তিনি পথনির্দেশ প্রদানে অক্ষম হবার মতো দুর্বলতা থেকে উর্ধে তখন নিশ্চয়ই তিনি কোনো না কোনো ভাবে এবং কোথাও না কোথাও এ পথনির্দেশ নিহিত রেখেছেন।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের পথনির্দেশ প্রতিটি মানুষের কাছে আসা অপরিহার্য নয়। কারণ, তাহলে তা হতো সহজাত, ফলে মানুষ কোনো বিষয়েই দ্বিধা- দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতো না এবং মানবপ্রকৃতিতে পথনির্দেশের আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হতো না। অতএব, বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কতক সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির কাছে এ পথনির্দেশ আসবে এবং তাঁরা অন্যদের নিকট তা পৌঁছে দেবেন। এই পথনির্দেশেরই নাম নবুওয়াত্ ও রিসালাত্ এবং এ পথনির্দেশ যাদের নিকট আসে তাঁরা হলেন নবী ও রাসূল।

মু'জিযাহ্ : নবী চেনার মাধ্যম

এর পরই প্রশ্ন জাগে : নবী বা রাসূল কে? কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করলে কী করে বোঝা যাবে যে, তিনি সত্যিকারের নবী, নাকি নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার?

হ্যা, নবী হওয়ার দাবীদার কোনো ব্যক্তি সত্যি সত্যিই নবী কিনা তা জানার কয়েকটি পন্থা রয়েছে। এ সব পন্থার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মু'জিযাহ্ বা অলৌকিকতা।

মু'জিযাহ্ অর্থাৎ অলৌকিকতা বা অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে এমন অস্বাভাবিক অবস্থা বা ঘটনা যা একজন সত্যিকারের নবীর নবুওয়াত্ প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সরাসরি বা নবীর মাধ্যমে ঘটানো হয় বা সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটানো বা এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টিতে কোনো রকমের মানবিক জ্ঞান- বিজ্ঞান, চর্চা, সাধনা বা যোগ্যতা- প্রতিভা অথবা এ ব্যাপারে কার্যকরভাবে ব্যবহারযোগ্য কোনো পার্থিব উপায়- উপকরণের ভূমিকা থাকে না। যেমন : মৃতকে জীবিতকরণ, অন্ধকে দৃষ্টিদান, লাঠিকে জীবন্ত সাপে পরিণতকরণ, চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিতকরণ ইত্যাদি।

এখানে নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মু'জিযাহ্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো মাত্র এবং বিভিন্ন নবী- রাসূল ('আঃ) এ জাতীয় আরো অনেক মু'জিযাহ্র অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এ জাতীয় মু'জিযাহ্ ছিলো সাময়িক এবং সীমিত ক্ষেত্রে তথা সীমিত সংখ্যক লোককে প্রদর্শনের উপযোগী। অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান, মাটি দিয়ে পাখী তরী করে তাকে প্রাণশীল করে উড়িয়ে দেয়া, লাঠিকে জীবন্ত সাপে পরিণত করা, চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিতকরণ ইত্যাদি মু'জিযাহ্ যাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে তাদের জন্য তা অকাট্যভাবে প্রত্যয়উৎপাদক ছিলো। কিন্তু যারা তা অন্যের কাছ থেকে নেছে তাদের কাছে এ সবের অকাট্যতা নির্ভর করে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে বণকারীর প্রত্যয় ও তার মাত্রার ওপর। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যয় ও বণকারীর প্রত্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট মাত্রাভেদ হয়ে থাকে।

কোরআন মজীদ স্থান- কালোর্ধ মু'জিযাহ্

তবে সমস্ত নবী- রাসূলের ('আঃ) প্রদর্শিত বা তাঁদের অনু লে সংঘটিত সকল মু'জিযাহ্র মধ্যে সর্বশেষ নবী রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক পেশকৃত মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদ হচ্ছে এমন একটি অনন্য মু'জিযাহ্ যা স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে। অর্থাৎ কোরআন

মজীদ নাযিল্ হওয়ার সময় যেমন মু'জিযাহ্ ছিলো দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর পরেও এখনো তদ্রূপ মু'জিযাহ্ই রয়েছে। তেমনি দেশ- জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবপ্রজাতির জন্যই তা মু'জিযাহ্; অতীতে যেমন ছিলো, বর্তমানে যেমন রয়েছে তেমনি ভবিষ্যতেও তা মু'জিযাহ্ই থাকবে।

কোরআন মজীদের ভাষা ও সাহিত্যমান, বিষয়বস্তু, ভবিষ্যদ্বাণী এবং আরো অনেক বৈশিষ্ট্যের বিচারে এ গ্রন্থ যে কোনো মহাপ্রতিভাধর মানবিক লেখনিশক্তির উর্ধে। তাই কোরআন মজীদে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন্ মিলে চেষ্টা করে দেখতে পারে কোরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ, নিদেন পক্ষে এর কোনো একটি সূরাহর সাথে তুলনীয় মানের (ক্ষুদ্রতম সূরাহটির সাথে তুলনীয় হলেও আপত্তি নেই) কোনো সূরাহ্ রচনা করতে পারে কিনা। অবশ্য ইসলামের বিরোধী পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে চেষ্টা করাও হয়েছে, কিন্তু তাদের এ সংক্রান্ত সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

মু'জিযাহ্ নির্বাচনে খোদায়ী নিয়ম

এখানে মু'জিযাহ্ প্রসঙ্গে আরো দু'টি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) মু'জিযাহ্ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট নবী যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হতেন বা যে জাতির হেদায়াতের জন্য দায়িত্ব পালন করতেন সে জাতি জ্ঞান- বিজ্ঞান বা শিল্পকুশলতার যে দিকটিতে সর্বাধিক অগ্রসর থাকতো সংশ্লিষ্ট নবীকে প্রদত্ত মু'জিযাহ্ সমূহের মধ্যে অন্ততঃ সর্বপ্রধান মু'জিযাহটি সে বিষয়েই দেয়া হতো। এ ক্ষেত্রে নবীর মু'জিযাহর মোকাবিলায় ঐ জাতির মধ্যকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ক শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞদেরকে অপারগ প্রমাণ করে দেয়া হতো। এভাবেই সংশ্লিষ্ট নবীর নবুওয়াতের সত্যতা তুলে ধরা হতো এবং ঐ জাতির পরাজিত শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ মুখে অথবা স্বীয় অক্ষমতার মাধ্যমে উক্ত নবীর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হতেন।

নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) মু'জিযাহ্ প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়মের কারণেই দেখা যায়, মিসরে জাদুবিদ্যার চরমোন্নতির যুগে মিসরীয়দের কাছে প্রেরিত নবী হযরত মূসা ('আঃ)

লাঠিকে এমন এক সাপে পরিণত করেন যা সেখানকার ে ষ্ঠতম জাদুকরদের জাদুকে খেয়ে ফেলে। ফলে জাদুকররা বুঝতে পারে যে, হযরত মূসা (‘আঃ)- এর এ কাজ জাদুক্ষমতার উর্ধে এবং এ কারণে তারা তাঁর ওপরে ঈমান আনে।

অন্যদিকে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) যখন ফিলিস্তিনে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন তখন ফিলিস্তিন ছিলো রোমানদের শাসনাধীন এবং ইতিপূর্বেকার শাসক ণী গ্রীকদের ও তৎকালীন শাসক ণী রোমানদের সভ্যতা- সংস্কৃতির দ্বারা ফিলিস্তিনীরা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলো। ইতিপূর্বেই গ্রীকরা চিকিৎসাশাস্ত্রে দারুণ উন্নতি করেছিলো এবং ঐ সময় রোমানদের মধ্যেও চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। এ কারণে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)কে যে সব মু‘জিযাহ্ দেয়া হয় অর্থাৎ মৃতকে জীবিতকরণ, মাটির তরী পাখীর মূর্তিকে প্রাণদান, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় দান - এগুলোর মাধ্যমে তিনি সেখানকার ে ষ্ঠতম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদেরকে অপারগ প্রমাণ করে দেন।

এ বিষয়টি বিপরীতভাবে ধরে নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে, ধরা যাক, লাঠিকে সাপে পরিণতকরণ যদি হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর সর্বপ্রধান মু‘জিযাহ্ হতো এবং জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান যদি হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহ্ হতো, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কী হতো? সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মিসরীয়রা মনে করতো যে, হযরত মূসা (‘আঃ) একজন বড় ধরনের চিকিৎসাবিজ্ঞানী; মিসরের চিকিৎসকরা তাঁর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম না হলেও এবং তাঁর রোগনিরাময় কৌশল ধরতে না পারলেও যে সব দেশ চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধিকতর উন্নত হয়তো সে সব দেশের ে ষ্ঠতম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তাঁর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ও তাঁর সাফল্যকৌশল ধরতে সক্ষম। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের লোকেরা হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)কে একজন বড় ধরনের জাদুকর মনে করতো এবং বলতো : আমাদের মধ্যে কোনো বড় জাদুকর থাকলে নিশ্চয়ই সে এর সাথে মোকাবিলা করতে পারতো।

কিন্তু যে জাতির মধ্যে যে বিষয়ের ে ষ্ঠতম বিশেষজ্ঞদের অস্তিত্ব ছিলো সে জাতির সামনে বার বার সে বিষয়ে মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করায় এবং স্বয়ং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ তা মোকাবিলায় ব্যর্থ

হওয়ায় ও সে কাজকে মুখে বা স্বীয় অক্ষমতার মাধ্যমে মানবিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা- প্রতিভার উর্ধে বলে স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মু‘জিযাহ্ সেখানকার সাধারণ মানুষের মাঝে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

কোরআন মজীদ ও আরবী ভাষার চূড়ান্ত বিকাশ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বে ষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে তাঁর যুগ থেকে রু করে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত স্থান- কাল ও পরিবেশ- পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবপ্রজাতির পথনির্দেশের জন্য পাঠান। বস্তুতঃ সর্বে ষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীকে পাঠানোর এটাই অনিবার্য দাবী যে, তাঁকে তাঁর যুগ থেকে রু করে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত স্থান- কাল ও পরিবেশ- পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবপ্রজাতির পথনির্দেশের জন্য পাঠানো হবে। এমতাবস্থায় তাঁকে দেয় মু'জিযাহ্ সমূহের মধ্যে অন্ততঃ এমন একটি মু'জিযাহ্ থাকা অপরিহার্য ছিলো যা হবে স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতার উর্ধে, অন্যদিকে তাঁকে যে হেদায়াত- গ্রন্থ দেয়া প্রয়োজন তার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এমনই সীমাহীন হওয়া অপরিহার্য যাকে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) প্রদত্ত গ্রন্থ ও পুস্তিকা (ছ্বাহীফাহ্)র সাথে কোনোভাবেই তুলনা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এমন কোনো বিশালায়তন গ্রন্থ নাযিল্ করাও বাস্তবসম্মত হতো না যা থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হতো। তাই এ গ্রন্থের বশিষ্ট্য এমন হওয়া অপরিহার্য ছিলো যে, সংক্ষেপে কিন্তু ভাষাগত কৌশলের মাধ্যমে তাতে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য তাদের জীবনের সকল দিকের পথনির্দেশের সমাহার ঘটবে। আর এ ধরনের গ্রন্থ মানবিক ক্ষমতার উর্ধে বিধায় এ গ্রন্থকে ে ষ্ঠতম ও কালোত্তীর্ণ মু'জিযাহ্ হিসেবে গণ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বস্তুতঃ এ ধরনের একটি অনন্য বশিষ্ট্যের অধিকারী গ্রন্থ নাযিলের জন্য একটি যথোপযুক্ত ভাষার উদ্ভব অপরিহার্য। কিন্তু কেবল মানবিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে এ ধরনের একটি উপযুক্ত ভাষা তো না- ও গড়ে উঠতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বাভাবিক মানবিক গতিধারায় পরোক্ষ সহায়তার মাধ্যমে এ ধরনের একটি ভাষার বিকাশ ও তাকে উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করবেন এটাই বিচারবুদ্ধির দাবী।

আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই যে, আরবী ভাষা - যে ভাষায় কোরআন মজীদ নাযিল্ হয়েছে - একদিকে যেমন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিকাশের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়, অন্যদিকে এ ভাষার

গুণগত মান তথা প্রকাশক্ষমতা এমনই বিস্ময়কর মাত্রায় ব্যাপকতার অধিকারী ও উন্নত যে, বিশ্বের অন্য কোনো ভাষা এর ধারেকাছেও পৌঁছতে সক্ষম নয়।

রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাবের মোটামুটি সমসময়েই আরবী ভাষা তার চরমোন্নতির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং আরবী ভাষা- সাহিত্যের ৎে ষ্ঠতম প্রতিভাগুলোরও এ সময়েই আবির্ভাব ঘটে। তাদের সামনে কোরআন মজীদকে এক কালোত্তীর্ণ মু'জিযাহ্ রূপে পেশ করা হয়। আর ভাষাশৈলীর সৌন্দর্য ও মান এবং প্রকাশের ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতার বিচারে কোরআন মজীদের অনন্যতার কারণে এ গ্রন্থকে মানবিক প্রতিভার উর্ধে বলে ইসলামের দুশমন তৎকালীন ৎে ষ্ঠতম আরবী সাহিত্যপ্রতিভাসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো।

অন্যান্য আসমানী কিতাব্ মু'জিযাহ্ নয় কেন

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কালাম্ যেহেতু আল্লাহর কালাম্, সেহেতু তা যে ভাষাতেই নাযিল্ হোক না কেন, তা ঐ ভাষার ভাষা- সাহিত্যগত মানের বিচারে ৎে ষ্ঠতম ও নিখুঁততম হতে বাধ্য। আর মানুষের প্রতিভা যতোই তীক্ষ্ণ হোক না কেন, যেহেতু সে মানুষ, সেহেতু কোনো মানবিক প্রতিভার বক্তব্যই মানের দিক থেকে খোদায়ী কালামের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে না। অতএব, অন্যান্য আসমানী গ্রন্থও যখন নাযিল্ হয়েছিলো তখন তৎকালীন সংশ্লিষ্ট ভাষা- সাহিত্যের মানের ভিত্তিতে বিচার করলে তা মানবিক ক্ষমতার উর্ধে প্রমাণিত হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে :

(১) সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহ ঐ সব গ্রন্থ নাযিলের সময় স্বীয় বিকাশের চরমোৎকর্ষে উপনীত হয়েছিলো কিনা তা ঐতিহাসিক বিচারে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে যতোটা জানা যায়, একমাত্র আরবী ভাষা ছাড়া সকল ভাষারই পরবর্তীকালে ক্রমোন্নতি ঘটে এবং এ সব ভাষার মধ্যে জীবিত ভাষাগুলোর মানোন্নয়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঐ সব গ্রন্থ নাযিল- কালে ভাষা- সাহিত্যের মানের বিচারে সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ৎে ষ্ঠতম প্রমাণিত হলেও, ঐ সব গ্রন্থ যদি অবিকৃতভাবে টিকে থাকতো, তো পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট ভাষা-

সাহিত্যের উন্নতি হবার কারণে ঐ সব গ্রন্থের খোদায়ী কালাম্ হবার ব্যাপারে ভাষা- সাহিত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হতো।

(২) সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের মধ্যে ভাষা- সাহিত্যগত শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাসমূহ সমাজের সর্বাধিক সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হতো না বিধায় ঐ সব গ্রন্থকে সেগুলো নাযিল্ হবার সময় বা পরে কখনোই ভাষা- সাহিত্যের মানগত দৃষ্টিকোণ থেকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হয় নি। ফলে অন্য মু'জিযাহ্ দ্বারা সংশ্লিষ্ট নবীর নবুওয়াত প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর আনীত গ্রন্থকে লোকেরা আল্লাহর কিতাব্ মনে করেছে, ভাষা- সাহিত্যের মানগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনন্য বিবেচনা করে আল্লাহর কিতাব্ মনে করে নি। অর্থাৎ নবীর আনীত কিতাব্ হওয়ার কারণে একটি কিতাবকে আল্লাহর কিতাব্ মনে করা হয়েছে, এর বিপরীতে কিতাবকে মু'জিযাহ্ হিসেবে লক্ষ্য করে সেটিকে তার বাহকের নবুওয়াতের প্রমাণরূপে গণ্য করা হয় নি।

(৩) ঐ সব গ্রন্থ কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে বা বিকৃত হয়েছে এবং কতক গ্রন্থ মূল ভাষায় অবশিষ্ট নেই বা অন্য ভাষার অনুবাদ থেকে পুনরায় মূল ভাষায় অনূদিত হয়েছে (যা ঐ সব গ্রন্থের অনুসরণের দাবীদার মনীষীগণও স্বীকার করেন)। ফলে বর্তমানে ঐ সব গ্রন্থকে সংশ্লিষ্ট ভাষার ভাষা- সাহিত্যগত মানের মানদণ্ডে বিচার করা আদৌ সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে, যেহেতু পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহ সাময়িক প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট স্থান, কাল ও জনগোষ্ঠীর পথনির্দেশের জন্য নাযিল্ করা হয়েছিলো এবং সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহ স্বীয় সম্ভাবনার চরমোন্নতিতে উপনীত হয় নি বিধায় ভাষাগত ও সাহিত্যিক মানের বিবেচনায় ঐ সব গ্রন্থকে ঐ সব ভাষার সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থরূপে নাযিল্ করা সম্ভব ছিলো না (কারণ তা করা হলে ঐ সব গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট লোকদের বোধগম্য হতো না), সেহেতু পরবর্তীকালে ঐ সব ভাষার চরমোন্নতির যুগে যাতে ঐ সব ঐশী গ্রন্থ নিম্ন মানের বলে প্রতিভাত না হয়, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সব গ্রন্থকে বিলুপ্তি বা বিকৃতি থেকে সুরক্ষা প্রদান করেন নি।

ধু তা- ই নয়, এমনকি ঐ সব ঐশী গ্রন্থ নাযিলের যুগে যদি সংশ্লিষ্ট ভাষা স্বীয় সম্ভাবনার চরমোন্নতির অধিকারীও হতো তথাপি ঐ সব গ্রন্থের বিলুপ্তি বা বিকৃতি থেকে সুরক্ষা পাওয়ার কারণ ছিলো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে ঐ সব গ্রন্থকে কেবল সংশ্লিষ্ট ভাষার ৫ ষ্ঠতম গ্রন্থাবলীর সাথে তুলনা করেই ৫ ষ্ঠতম গণ্য করা হতো না, বরং অন্যান্য ভাষার ৫ ষ্ঠতম গ্রন্থাবলীর সাথেও তুলনা করা হতো। ফলে ৫ ষ্ঠতম ভাষার (আরবী) ৫ ষ্ঠতম গ্রন্থের (কোরআন) সাথে তুলনা করে ঐ সব গ্রন্থের মান সম্পর্কে নিম্নতর ধারণা সৃষ্টি হতো এবং সেগুলোর ঐশী গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কেও সন্দেহ সৃষ্টি হতো। সুতরাং ঐ সব গ্রন্থের বিলুপ্তি বা বিকৃতি মূল ঐশী গ্রন্থগুলোর সম্মান রক্ষার্থেই অপরিহার্য ছিলো।

এর বিপরীতে যে গ্রন্থ ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত স্থান- কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে অনিবার্যভাবেই সে গ্রন্থের এমন এক ভাষায় নাযিল্ হওয়া প্রয়োজন ছিলো যে ভাষা হবে সাহিত্যিক মানের বিচারে ৫ ষ্ঠতম তথা সংক্ষিপ্ততম কথায় সুন্দরতমভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের উপযোগী এবং সে ভাষার চরমতম উন্নতির পর্যায়ে তা নাযিল্ হওয়া অপরিহার্য যাতে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত কোনো যুগে কোনো দেশে ও কোনো ভাষায়ই ঐ গ্রন্থের সমমানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব না হয়। আর কার্যতঃও তা- ই হয়েছে।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদ উক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলী থেকে ভিন্নতার অধিকারী। অর্থাৎ যেহেতু কোরআন নাযিল- কালে আরবী ভাষা ও সাহিত্য তার উৎকর্ষতার চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো সেহেতু কোরআন মজীদ তখন যেমন আরবী ভাষার অপ্রতিদ্ব›দ্বী ৫ ষ্ঠতম গ্রন্থ ছিলো, এখনো তা- ই আছে এবং ভবিষ্যতেও তা- ই থাকবে; পরবর্তী কালের ভাষা- সাহিত্যের মানের বিচারে তার ৫ ষ্ঠতম গ্রন্থের মর্যাদা হারাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন নাযিলের যুগে আরবদের মধ্যে এ ভাষার ৫ ষ্ঠতম কবি, সুবক্তা ও আরবী ভাষার অলঙ্কারবিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটেছিলো এবং ঐ যুগের আরব জনগণের কাছে কবি, সুবক্তা ও আরবী ভাষার অলঙ্কারবিশেষজ্ঞগণ সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ফলে

কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তাঁদের অপারগতা কোরআনের ঐশী গ্রন্থ হবার ব্যাপারে জনগণের সামনে অকাট্য দলীলে পরিণত হয়।

কোরআনের মু'জিযাহর সাথে পরিচিতি অপরিহার্য

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তা হচ্ছে, যে কোনো মু'জিযাহকে কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণই মু'জিযাহরূপে পরিপূর্ণ প্রত্যয় সহকারে অনুভব করতে পারেন; সাধারণ জনগণ ঐ বিশেষজ্ঞদের স্বীকৃতি বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থতা থেকে প্রত্যয়ে উপনীত হতে পারে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব কেবল তাঁদের সামনেই পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিভাত হওয়া সম্ভব যারা আরবী ভাষা ও তার প্রকাশক্ষমতার ওপরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দক্ষতা বা ব্যুৎপত্তির অধিকারী। বরং তাঁরাও যতোই অলৌকিকত্ব পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করবেন ততোই তাঁদের কাছে এ মহাগ্রন্থের নব নব বিস্ময়কর দিক ধরা পড়বে - যা আরবী ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ব্যুৎপত্তির অধিকারী নয় এমন লোকের পক্ষে পুরোপুরি বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন যে কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব।

এখানে একটি পার্শ্বপ্রসঙ্গের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করছি। তা হচ্ছে, যার কাছে রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিভাত হয়েছে তার কাছে কোরআন মজীদের খোদায়ী কালাম্ হওয়ার বিষয়টি স্বতঃপ্রতিভাত। অন্যদিকে যার কাছে কোরআন মজীদ মানবীয় প্রতিভার উর্ধে এক অলৌকিক গ্রন্থরূপে প্রমাণিত হবে সে ব্যক্তির পক্ষে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের সত্যতা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব প্রতিভাত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার না করবে, তা যে নেহায়েতই অন্ধ গোঁড়ামি তা বলাই বাহুল্য।

সে যা- ই হোক, কোরআন মজীদের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম জনগণের প্রত্যয় থাকলেও এ প্রত্যয় হচ্ছে এজমালী (মোটামুটি) ধরনের। এ গ্রন্থের অলৌকিকত্বের মূল বশিষ্ট্য ও

তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খুব কম লোকেরই ধারণা আছে, অথচ প্রতিটি মুসলমানেরই এ সম্পর্কে অন্ততঃ একটি ন্যূনতম পর্যায় পর্যন্ত অবশ্যই ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যেভাবে ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে সব ধরনের উপায়- উপকরণ ও প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলা ও বিভ্রান্তিকর প্রচারাভিযান চলছে তখন এ প্রয়োজন আরো বেশী তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। আর যারা দ্বীনের প্রচার- প্রসারের কাজে সময়- ম ব্যয়ে আগ্রহী তাঁদের জন্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা অপরিহার্য প্রয়োজন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আরবী ও ফার্সী ভাষায় কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তেমনি রয়েছে কোরআনের ইতিহাস ও কোরআন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জ্ঞান- বিজ্ঞানের ওপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু বাংলা ভাষায় কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ সংক্রান্ত কোনো গ্রন্থ এ পর্যন্ত অত্র লেখকের চোখে পড়ে নি। তাই এ প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অবতারণা।

কোরআন মজীদের পরিচিতিমূলক গ্রন্থে ও কোরআন মজীদের তাফসীরের মুখবন্ধে সাধারণতঃ কোরআনের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু তা কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে ন্যূনতম পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে যে সব স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় সে সবের আয়তনের ব্যাপকতা ছাড়াও সে সবের রচনামান এমনই উঁচু স্তরের যে, আমাদের সমাজে সে সব গ্রন্থের অনুবাদ অনুধাবনের জন্যে প্রয়োজনীয় 'ইলমী পূর্বপ্রস্তুতির খুবই অভাব রয়েছে।

অন্যদিকে যে সব আরবী- ফার্সী গ্রন্থে অংশবিশেষরূপে কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ সম্পর্কিত আলোচনা স্থানলাভ করেছে সে সব আলোচনা বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদের এতদসংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে এ সবের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ৫ ষ্ঠ মুজতাহিদ্ ইরাকের নাজাফে অবস্থিত দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্রে দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশীকাল যাবত দ্বীনী জ্ঞান চর্চাকারী ও বিতরণকারী 'আল্লামাহ্ সাইয়েদ আবূল্ ক্বাসেম্ খূয়ী (রহ্ঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল্-

বায়ান্ ফী তাফসীরিল্ ক্বুরআন্- এর অংশবিশেষে কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা আয়তনের দিক থেকে যেমন মধ্যম, তেমনি প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য এবং তা বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদের প্রয়োজন পূরণে অনেকাংশে সহায়ক হবে বলে মনে হয়েছে। এ কারণে গ্রন্থটির সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের অনুবাদে হাত দেই এবং ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিলের রুতে এর অনুবাদের কাজ শেষ হয়।

অবশ্য আল্- বায়ান্- এর মু‘জিযাহ্ সংক্রান্ত অধ্যায়ের যে অনুবাদ করি তাকে আক্ষরিক অর্থে ধু অনুবাদ বলা চলে না। কারণ, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এতে পাদটীকা যোগ করা ছাড়াও মরহূম খূয়ীর আলোচনার ভিতর থেকে দু’- একটি অংশ যরূরী নয় বিবেচনায় বাদ দেই, কোথাও কোথাও আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে ভাবানুবাদ করি, কয়েকটি জায়গায় অধিকতর সুবিন্যাসের লক্ষ্যে বক্তব্য অগ্র- পশ্চাত করি এবং ক্ষেত্রবিশেষে বক্তব্য যোগ করে আলোচনার সম্পূরণ করি। এছাড়া পাঠক- পাঠিকাদের ব্যবহারের সুবিধার্থে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিবেচনায় তাঁর বক্তব্যে উপশিরোনাম প্রদান করি, যদিও অনেক উপশিরোনাম তাঁরই দেয়া ছিলো।

এছাড়া, স্বভাবতঃই একটি গ্রন্থের অংশবিশেষ হিসেবে লিখিত আলোচনা একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে লিখিত আলোচনা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং তাতে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সকল দিক প্রতিফলিত হয় না বিধায় এর সম্পূরণের মাধ্যমে একে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপদানের লক্ষ্যে এর রুতে তিনটি নিবন্ধ এবং শেষে পরিশিষ্ট আকারে আরো দু’টি নিবন্ধ, ‘আল্লামাহ্ খূয়ীর লেখা অংশসমূহের ভিতরে কতক উপশিরোনাম ও এ গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষা সমূহের ব্যাখ্যা যোগ করি।

‘আল্লামাহ্ খূয়ীর লেখার অনুবাদ ১৯৮৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিলের রুতে শেষ হলেও প্রায় বিশ বছর পর এটিকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপ দেয়ার উদ্যোগ নেই এবং নিজেই কম্পিউটার- কম্পোজের কাজে হাত দেই। গ্রন্থটির পূর্ণতা প্রদান ও কম্পোজের কাজ ২০১০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সমাপ্ত হলেও প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত গ্রন্থটি এভাবে থেকে যাওয়ার পর অতি সম্প্রতি মূলতঃ ফেসবুকে পরিবেশনের লক্ষ্যে এটি পরিমার্জনের কাজে হাত দেই। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে মরহূম খূয়ীর লেখার অনুবাদকৃত অংশগুলোতে আমার পক্ষ থেকে যোগকৃত

পাদটীকাগুলোর সংখ্যাধিক্য ও তার আয়তন একটি গ্রন্থের গতিশীলতার জন্য সহায়ক নয় বিবেচনায় প্রায় সবগুলো পাদটীকাকেই মূল পাঠে সমন্বিত করে নেই। (ফেসবুকের জন্য প্রস্তুত কপিতে অবশ্য অবশিষ্ট পাদটীকাগুলোও প্রথম বা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে মূল পাঠের ভিতরে দিয়েছি; আলাদা কোনো পাদটীকা দেই নি।) সেই সাথে আরো কিছু পরিবর্তন ও নতুন উপশিরোনাম যোগ করি। ফলে সব মিলিয়ে গ্রন্থটির আয়তনের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ দাঁড়িয়েছে অত্র গ্রন্থকারের রচনা এবং চল্লিশ ভাগের কিছু বেশী মরহূম খূয়ীর রচনার অনুবাদ।

অত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত বাইবেলের উদ্ধৃতি সমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে বাইবেলের অন্যতম প্রাচীন বঙ্গানুবাদ ধর্ম্মপুস্তক- এর সাহায্য নিয়েছি। (ধর্ম্মপুস্তক - ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের সংস্করণ যা লন্ডনে রয়েছে তার ফটোকপি থেকে ১৯৫০ সালে ব্রিটিশ ও ফরেণ বাইবেল সোসাইটির দ্বারা ২৩ নম্বর চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা হতে প্রকাশিত সংস্করণ ব্যবহার করেছি।) এছাড়া ইসলামী জ্ঞানচর্চায় অপেক্ষাকৃত নবীন যে সব পাঠক- পাঠিকা ইসলামী পরিভাষা সমূহের সাথে খুব বেশী পরিচিত নন এমন পাঠক- পাঠিকাদের, বিশেষ করে অমুসলিম পাঠক- পাঠিকাদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষা সমুহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছি।

অত্র গ্রন্থ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। একটি হচ্ছে এই যে, অত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত কোরআন মজীদের কতক আয়াতে (মূল আরবী আয়াতে) আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন আরবী বাকরীতিতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালীদের মুখে এক বচনে 'আমরা' ব্যবহারের প্রচলন ছিলো, এ কারণে তৎকালীন আরবের মোশরেকরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে নি। কিন্তু যদিও বাংলা সহ আরো অনেক ভাষায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বা বিনয় প্রকাশের জন্য এর প্রচলন রয়েছে তথাপি বাংলা বাকরীতিতে অনেক ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিনয়স্বরূপ 'আমরা' এবং কর্তৃত্বভাব প্রকাশের জন্য 'আমি' ব্যবহারেরও প্রচলন আছে। এ কারণে বাংলা ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য 'আমরা' শব্দের ব্যবহার বেখাপ্পা নায় বিধায় আমরা এক বচনে এর অনুবাদ করেছি। অত্র গ্রন্থে এ ধরনের সকল আয়াতের ক্ষেত্রেই আমরা এ রীতি অনুসরণ করেছি।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই যে, অত্র গ্রন্থে যে সব আরবী- ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর বানানের ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব মূল উচ্চারণ প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি। এ কারণে দীর্ঘ ঈ- কার ও দীর্ঘ ঊ- কার বজায় রাখা ছাড়াও কতক শব্দে, বিশেষ করে কম প্রচলিত শব্দে প্রতিবর্ণায়ন রীতি অনুযায়ী যথাসাধ্য মূল উচ্চারণ প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে ص- এর জন্য 'ছ্ব', ط- র জন্য 'ত্ব', ع- এর জন্য সংশ্লিষ্ট বর্ণের আগে (') চিহ্ন, غ- এর জন্য 'গ্ব', ق- এর জন্য 'ক্ব', আলেফ্ মামদূদাহ্ (آ) ও যবরের পরবর্তী আলেফ্ (ا)- এর জন্য ডবল আ- কার (াা) এবং সাকিন্ হামযাহ্ (ء)র জন্য (') চিহ্ন ব্যবহার করেছি। এছাড়াও আরো কিছু নিজস্ব বানান অনুসরণ করেছি।

আশা করি অত্র গ্রন্থখানি বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদের নিকট, বিশেষ করে যারা আল্লাহর দ্বীনকে ভালোভাবে জানতে, অনুসরণ করতে ও প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের নিকট সাদরে গ্রহণীয় হবে।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে পাঠক- পাঠিকাদের যে কোনো মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

গ্রন্থটি যদি পাঠক- পাঠিকাদেরকে কোরআন মজীদের মু'জিযাহর সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত করাতে সক্ষম হয় এবং বাংলাভাষী ইসলাম- গবেষকগণ এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন তাহলেই লেখকের ম সার্থক হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'ইতের নিকট মুনাজাত করি, তিনি যেন অত্র গ্রন্থকে তাঁর দ্বীনের খেদমতরূপে গণ্য করেন এবং মরহূম 'আল্লামাহ্ সাইয়েদ আবূল্ ক্বাসেম্ খূয়ীর, অত্র লেখকের, এ গ্রন্থের প্রকাশ- প্রচারের সাথে জড়িতদের ও এর পাঠক- পাঠিকাদের সকলের পরকালীন মুক্তির পাথেয়স্বরূপ করে দিন।

কোরআন ও নুযূলে কোরআন

কোরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব্। কিতাব্ বলতে আমরা সাধারণতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ বুঝি; অতীতে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিকেও কিতাব্ বলা হতো। তবে কোরআন মজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে কাগযে মুদ্রিত বা লিখিত গ্রন্থ আকারে আসে নি। বরং তা হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর অন্তঃকরণে নাযিল্ হয় এবং তিনি তা তাঁর ছ্বাহাবীদের সামনে মৌখিকভাবে পেশ করেন, আর সাথে সাথে, তাঁর পক্ষ হতে পূর্ব থেকে নিয়োজিত লিপিকারগণ তা লিপিবদ্ধ করেন এবং এর পর পরই তিনি সদ্য নাযিল্ হওয়া আয়াত বা সূরাহ্ পূর্বে নাযিলকৃত সূরাহ্ ও আয়াত সমূহের মধ্যে কোথায় স্থাপন করতে হবে তা বলে দেন এবং সেভাবেই সূরাহ্ ও আয়াতসমূহ প্রতিনিয়ত বিন্যস্ত হতে থাকে।

এভাবে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের আগেই সমগ্র কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়। অবশ্য তখন যে সব জিনিসের ওপর কোরআন লিপিবদ্ধ করা হয় তার ধরন ও আয়তন এক রকম ছিলো না। পরবর্তীকালে তৃতীয় খলীফাহ্ হযরত ‘উছমানের যুগে অভিন্ন আকার ও ধরনের তৎকালে প্রাপ্ত কাগযে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা থেকে ব্যাপকভাবে কপি করা হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন হাদীছের ভিত্তিতে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই যে, প্রথম খলীফাহ্ হযরত আবূ বকরের সময় কোরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়। কিন্তু গবেষণামূলক বিশ্লেষণে এ ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ, যেহেতু কোরআন মজীদের সংকলন ও বিন্যাসের কাজ স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) সম্পাদন করে যান এবং প্রতি রামাযানে তিনি কোরআন মজীদের ঐ পর্যন্ত নাযিলকৃত অংশ গ্রন্থাবদ্ধ ক্রম অনুযায়ী (নাযিল- কালের ক্রম অনুযায়ী নয়) নামাযে পাঠ করতেন। এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকরের সময় নতুন করে কোরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংকলন করার প্রশ্নই ওঠে না।

এ বিষয়টি এমন একটি ঐতিহাসিক বিষয় যা সকলের নিকট সুস্পষ্ট। কিন্তু কোরআন মজীদের নাযিল্- পূর্ববর্তী স্বরূপ এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ওপর তা নাযিলের প্রক্রিয়ার

বিষয়টি যেহেতু অন্য সকলের অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয় ও ঘটনা সেহেতু তা একইভাবে সুস্পষ্ট নয়।

বিরাজমান ভুল ধারণা

কোরআন মজীদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কতোগুলো ভুল ধারণা লক্ষ্য করা যায় যা দূর করার চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। এর মধ্যে একটা ভুল ধারণা হচ্ছে লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কোরআন মজীদের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং আরেকটি ভুল ধারণা কোরআন মজীদের নাযিল্ হবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে। এছাড়া কোরআন মজীদ ও অন্যান্য নবী- রাসূলের (‘আঃ) ওপর নাযিলকৃত কিতাব্ সমূহের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারেও ভুল ধারণা রয়েছে।

স্বয়ং কোরআন মজীদে (সূরাহ্ আল্- বুরূজ্ : ২১- ২২) লাওহে মাহফূযে (যার আক্ষরিক মানে ‘সংরক্ষিত ফলক’) কোরআন মজীদ সংরক্ষিত থাকার কথা বলা হয়েছে। কোরআন মজীদে বস্তুজগত ও মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত জগতের বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত সমূহকে “মুতাশাবেহ্” বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ধরনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের ও এর বিষয়বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে বস্তুজাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত ব্যক্ত করার সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ ধরনের আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা ও অকাট্য জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা ছাড়া কেউ জানে না (সূরাহ্ আালে ‘ইমরান্ : ৭)। [“মুতাশাবেহ্” (متشابه) মানে যার অন্য কিছুর সাথে মিল রয়েছে, কিন্তু হুবহু তা নয়।]

এ সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের মধ্যে এরূপ ধারণা বিস্তার লাভ করেছে যে, নীহারিকা লোক ছাড়িয়ে আরো উর্ধে কোথাও, হয়তো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে “লাওহে মাহফূয্” নামক ফলক অবস্থিত এবং তাতে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ রয়েছে। লোকেরা লাওহে মাহফূযকে বস্তুগত সৃষ্টি মনে করে থাকে। তাদের ধারণা, আমরা যে ধরনের পাথরের বা ধাতব নির্মিত ফলকের সাথে পরিচিত লাওহে মাহফূয্ তদ্রূপ কঠিন কোনো ভিন্ন ধরনের বস্তুতে তরী ফলক।

আর আমরা যেমন কালি দ্বারা লিখে থাকি, তেমনি সে লেখাও কালির লেখা, তবে হয়তো সে কালি ভিন্ন কোনো ও অত্যন্ত উন্নত মানের উপাদানে তরী।

ধারণা করা হয়, ফেরেশতা জিবরাঈল (‘আঃ) লাওহে মাহফূয্ থেকে কোরআন মজীদের আয়াত মুখস্থ করে এসে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কানে কানে পড়ে যেতেন এবং তিনি তা কানে নে বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্থ করে এরপর সবাইকে তা পড়ে নাতেন।

অনুরূপভাবে আরো ধারণা করা হয় যে, অন্যান্য আসমানী কিতাব্ও অন্যত্র সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেখান থেকে অন্যান্য নবী- রাসূলের (‘আঃ) ওপর নাযিল্ হয়েছিলো। এমনকি অনেকের মনে এমন ধারণাও রয়েছে যে, আমরা যে ধরনের বই- পুস্তকের সাথে পরিচিত আসমানী কিতাব্ সমূহ সে ধরনেরই, তবে আকারে বড় এবং সাধারণ কাগযের পরিবর্তে কোনো মূল্যবান পদার্থের দ্বারা তরী কাগযে লিখিত যা আমাদের পৃথিবীতে নেই এবং তার ওপরে অত্যন্ত মূল্যবান কোনো কালিতে লেখা রয়েছে।

অবশ্য হযরত মূসা (‘আঃ)- এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব্ তাওরাত্- এর অংশবিশেষ দশটি ফরমান লিখিত একটি ফলক আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ট্রিলিয়িন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে কঠিন বস্তুর ওপর তাওরাত্ লিখিত্ আছে এবং সেখান থেকে একটি অংশ হযরত মূসা (‘আঃ)- এর কাছে পাঠানো হয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছায় এ ফলক তরী হয়েছিলো। কারণ, তিনি যখনই কোনো কিছু হোক বলে ইচ্ছা করেন সাথে সাথে তা হয়ে যায়। মূলতঃ এটা ছিলো হযরত মূসা (‘আঃ)- এর অনু লে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ঘটানো একটি মু‘জিযাহ্ ঠিক যেভাবে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান হতে খাবারের খাঞ্চা পাঠানো হয়েছিলো।

এছাড়া কোরআন মজীদে ‘পবিত্র পৃষ্ঠাসমূহ’- এর কথা (সূরাহ্ আল্- বাইয়্যেনাহ্ : ২) এবং কোরআনে করীমের ‘গোপন কিতাবে’ লিখিত থাকার (সূরাহ্ আল্- ওয়াক্বেয়াহ্ : ৭৭- ৭৮) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতদুভয়ের কোনোটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত পৃষ্ঠা বা গ্রন্থ হবার ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান নেই। এরপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, তা হযরত মূসা

(‘আঃ)কে প্রদত্ত ফলকসমূহের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু, তাহলেও তা আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট লাওহে মাহফূয্- পরবর্তী পর্যায়ের সৃষ্টি, স্বয়ং লাওহে মাহফূয্ নয়।

ভুল ধারণার কারণ

এ সব ভুল ধারণার কারণ হচ্ছে, মানুষ যে বিষয়ে অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় সে বিষয়কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ছকে ফেলে সে সম্পর্কে ধারণা করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে মানুষকে কোনো কিছু বুঝাতে হলে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে আ য় করে বুঝানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বলতে হয়, অমুক জিনিসটি অনেকটা এই জিনিসটির মতো। কিন্তু এ থেকে ঐ জিনিস সম্পর্কে সামান্য আবছা ধারণা লাভ করা যায় মাত্র; কখনোই পুরোপুরি সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে।

ইরানে এক ধরনের ফল পাওয়া যায় যার নাম হচ্ছে ‘খোরমালু’। এটি দেখতে বাংলাদেশী ফল বুনো গাবের মতো। কিন্তু বুনো গাব যেখানে পাকলে হলুদ রং ধারণ করে সেখানে খোরমালু পাকলে তার রং হয় হাল্কা লাল, পাকা বুনো গাবের বীচি যেখানে খুবই শক্ত সেখানে খোরমালুর বীচি বেশ নরম এবং পাকা বুনো গাব ফল হিসেবে তেমন একটা সুস্বাদু না হলেও খোরমালু খুবই সুস্বাদু ও অত্যন্ত দামী ফল, আর বুনো গাবের বিপরীতে খোরমালু বীচি ও খোসা দ্ধ খাওয়া হয়; কেবল বোঁটাটাই ফেলে দিতে হয়।

এ বর্ণনা থেকে খোরমালু দেখেন নি ও খান নি এমন পাঠক- পাঠিকা কী ধারণা পেতে পারেন? মোটামুটি একটা বাহ্যিক ধারণা। কিন্তু ‘খোরমালু খুবই সুস্বাদু ফল’ এটা বুঝতে পারলেও এর প্রকৃত স্বাদ সম্পর্কে পাঠক- পাঠিকার পক্ষে কোনোভাবেই প্রকৃত ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। অতঃপর যদি এরূপ কোনো পাঠক- পাঠিকার জন্যে বাস্তবে খোরমালু খাবার সুযোগ আসে তখন

তিনি বুঝতে পারবেন খোরমালু মানে ‘অত্যন্ত সুস্বাদু নরম বীচিওয়ালা বুনো গাব’ নয়, বরং এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটি ফল।

এভাবে কোনো ে াতা বা পাঠক- পাঠিকাকে তার অভিজ্ঞতা বহির্ভূত যে কোনো জিনিস বা বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে তার অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত কোনো জিনিস বা বিষয়ের সাথে তুলনা করে তাকে বুঝাতে হবে যে, জিনিসটি বা বিষয়টি মোটামুটি এ ধরনের বা এর কাছাকাছি; ‘প্রকৃত’ ধারণা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধরনের মোটামুটি বা কাছাকাছি ধারণা থেকে ে াতা বা পাঠক- পাঠিকার মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, এভাবে ‘মোটামুটি বা কাছাকাছি ধারণা’ পাবার পর সে তাকে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার ছকে ফেলে ভুলে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

মোশরেকরা যে আল্লাহ্ তা‘আলাকে বস্তুগত ও শরীরী সত্তা মনে করেছে তারও কারণ এটাই। তারা শরীর ও বস্তু ছাড়া কোনো জীবনময় সত্তার কথা ভাবতেই পারে না। তারা মনে করে, সৃষ্টিকর্তাও শরীরী ও বস্তুগত সত্তা, তবে সে বস্তু অনেক উন্নত স্তরের এবং তাঁর শরীর অনেক বেশী শক্তিশালী, অবিনাশী ও অকল্পনীয় দ্রুততম গতির অধিকারী; তাই তিনি অমর অথবা অমৃত পান করার কারণে অমর হয়েছেন।

এ কারণেই দেখা যায়, মোশরেকদের কল্পিত দেবদেবীদের মূর্তিতে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবই রয়েছে। কারণ, তাদের মনে হয় যে, মানুষের যখন এ ধরনের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকাটা অপূর্ণতার লক্ষণ তখন সৃষ্টিকর্তার বা দেবদেবীর তা না থাকা কী করে সম্ভব? (অবশ্য মোশরেকদের অনেক দেবদেবীই হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যকার বিভিন্ন পুরুষ ও নারী ব্যক্তিত্ব যাদের ওপরে তারা ঐশিতা আরোপ করেছে। কিন্তু তারা আদি সৃষ্টিকর্তার জন্যও, যেমন : হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মার জন্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কল্পনা করে থাকে।)

এ প্রসঙ্গে একটি একটি চমৎকার বিখ্যাত উপমা রয়েছে - যা সম্ভবতঃ হযরত ‘আলী (‘আঃ) দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে, যেহেতু প্রতিটি প্রাণীই তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই অপরিহার্য ও পূর্ণতার পরিচায়ক মনে করে এবং তার কোনো একটি না থাকাকে অপূর্ণতা মনে করে, সেহেতু কোনো দুই শিংওয়ালা ফড়িং- এর যদি ছবি আঁকার ক্ষমতা থাকতো এবং তাকে যদি

সৃষ্টিকর্তার ছবি আঁকতে বলা হতো তাহলে অবশ্যই সে একটি ফড়িং- এর ছবি আঁকতো এবং তাতে দু’টি শিং আঁকতেও ভুলতো না। কারণ, ফড়িংটির মনে হতো, শিং- এর মতো এতো বড় যরূরী একটা অঙ্গ সৃষ্টিকর্তার না থেকেই পারে না।

বিচারবুদ্ধির রায়

তবে মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের জালে বন্দী নয়। কারণ, তার রয়েছে বিচারবুদ্ধি (intellect/ rationality - عقل)। আর মানুষের বিচারবুদ্ধি বস্তুবিহীন অস্তিত্ব, শরীরবিহীন জীবন, শব্দবিহীন সঙ্গীত ও বস্তুগত রং বিহীন ছবি ধারণা করতে সক্ষম।

একজন কবি বা গীতিকার কীভাবে কবিতা বা গীতি রচনা করেন? তাঁর অন্তরকর্ণে কি সুর, ছন্দ ও কথা ধ্বনিত হয় না? কিন্তু তাতে কী বায়ুতরঙ্গে সৃষ্ট শব্দের ন্যায় শব্দ আছে? তাঁর কানের কাছে বায়ুতে কি শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়? একজন চিত্রকর ঘরে বসে কীভাবে একটি সুন্দর দৃশ্য অঙ্কন করেন? তিনি তাঁর মনশ্চক্ষুতে শত রঙে রঙিন চমৎকার দৃশ্য দেখতে পান। কিন্তু তাতে কি বস্তু আছে? তাতে কি বস্তুগত রং আছে? নাকি তাঁর মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকোষ বিশ্লেষণ করলে সেখানে ঐ রঙিন ছবির একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া যাবে?

কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, কবি যা শোনেন এবং শিল্পী যা দেখেন তা সত্য নয়, বরং তা হচ্ছে মিথ্যা, কল্পনা; তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আসলে কি তাই? হ্যা, একে মিথ্যা বলা যায় যদি দাবী করা হয় যে, কবির কানের কাছে বায়ুতে শব্দতরঙ্গ তুলে এ কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিলো এবং তা নে তিনি লিখেছেন, তেমনি যদি দাবী করা হয় যে, শিল্পী যা সৃষ্টি করেছেন অনুরূপ একটি মডেল তাঁর চর্মচক্ষুর সামনে ছিলো। কিন্তু এরূপ তো দাবী করা হয় না। অতএব, তাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়।

কবি যা অন্তরকর্ণে শোনেন ও শিল্পী যা অন্তর্চক্ষুতে দেখেন তাকে যদি কল্পনা বলা হয়, তো বলবো, কল্পনাও এক ধরনের সত্য; অবস্তুগত সত্য, কাল্পনিক সত্য। যার অস্তিত্ব নেই তা

কাউকে বা কোনো কিছুকে প্রভাবিত করতে পারে না। তবে হ্যা, এ সত্য বস্তুজাগতিক সত্য নয়; ভিন্ন মাত্রার (Dimension - بُعد) সত্য। যদিও কল্পনার অস্তিত্বসমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বল, অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে, কিন্তু অবস্তুগত অস্তিত্ব হিসেবে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

একজনের কাছ থেকে নে বা প্রতীকী অক্ষরে লেখা বই- পুস্তক পড়ে কারো মধ্যে যে জ্ঞান তরী হয় এবং একই পন্থায় যে জ্ঞান অন্যের নিকট স্থানান্তরিত হয় তার অস্তিত্ব কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব কি? কিন্তু এই জ্ঞান কি বস্তুগত অস্তিত্ব? না, বরং এ হচ্ছে ভিন্ন মাত্রার এক অবস্তুগত অস্তিত্ব।

বর্তমান যুগে কম্পিউটার- সফট্ওয়্যার্ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা আছে। এ সফট্ওয়্যার্ কোনো বস্তুগত জিনিস নয়, বরং এক ধরনের প্রোগ্র্যাম বা বিন্যাস মাত্র। যদিও তা কম্পিউটারের মূল বস্তুগত উপাদানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাতে একটি বিশেষ বিন্যাস সৃষ্টি করে মাত্র, কিন্তু সে বিন্যাসটি কম্পিউটারের মূল উপাদান, আলোকসম্পাত ও বস্তুগত যন্ত্রপাতির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এ সব সফট্ওয়্যার্- এর কপি করা হয়, এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তরিত করা হয়, এগুলো বেচাকিনা হয়, ধু তা- ই নয়, বিভিন্ন সফট্ওয়্যার্ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই ও পরস্পরের ধ্বংস সাধন করে (যেমন : ভাইরাস্ ও এন্টি- ভাইরাস্)। এগুলো অবশ্যই এক ধরনের সৃষ্টি - এক ধরনের অস্তিত্ব, তবে অবস্তুগত অস্তিত্ব।

অস্তিত্বের প্রকারভেদ

সংক্ষেপে আমরা অস্তিত্বকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ অস্তিত্ব দুই ধরনের : অপরিহার্য সত্তা বা অস্তিত্ব (Essential Existence - واجب الوجود) - যিনি এ জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য অনাদি, অনন্ত, অসীম, অব্যয়, অক্ষয়, চিরন্তন পরম জ্ঞানী প্রাণ। এর বিপরীতে আছে সৃষ্টিসত্তা বা সম্ভব অস্তিত্ব (Possible Existence - ممکن الوجود) -

অপরিহার্য সত্তা ইচ্ছা করেছেন বলে যাদের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে; তিনি না চাইলে তাদের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব হতো না।

সম্ভব অস্তিত্ব হয় বস্তুগত, নয়তো অবস্তুগত, নয়তো বস্তুর আংশিক বশিষ্ট্যের অধিকারী সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। পুরোপুরি অবস্তুগত অস্তিত্ব আমাদের ‘সর্বজনীন অভিজ্ঞতা’র আওতাভুক্ত নয়, কিন্তু বস্তুগত অস্তিত্ব (যার দর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে) এবং কতক সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, যেমন : বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্র আমাদের অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত। এছাড়া নিরেট বস্তুগত অস্তিত্বের পাশাপাশি আছে বস্তুদেহধারী প্রাণশীল অস্তিত্ব - যার বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে মানুষ যার ভিতরে অবস্তুগত অস্তিত্ব বিচারবুদ্ধি রয়েছে - যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই।

আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা বস্তু- উর্ধ অপরিহার্য অস্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলার অস্তিত্ব এবং আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা বস্তুগত, প্রাণশীল ও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া ধর্মীয় সূত্র থেকে আমরা অবস্তুগত ব্যক্তিসত্তা ফেরেশতাদের এবং সূক্ষ্ম উপাদানে সৃষ্ট প্রাণশীল অস্তিত্ব জ্বিনদের কথা জানতে পারি।

এ পর্যায়ে এসে প্রশ্ন জাগে, কোরআন মজীদ যে লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রয়েছে তা কোন্ ধরনের অস্তিত্ব? তা কি বস্তুগত অস্তিত্ব, নাকি অবস্তুগত অস্তিত্ব?

আমরা লক্ষ্য করি, বস্তুগত সৃষ্টি - তা প্রাণশীলই হোক বা প্রাণহীনই হোক, সদাপরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল, তা সে ধ্বংস যতো ধীরে ধীরে এবং যতো দীর্ঘদিনেই হোক না কেন। অন্যদিকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ্ তা‘আলার নকট্যের অধিকারী ফেরেশতারা অবস্তুগত সত্তা। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলা ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত মানব প্রজাতির জন্য তাঁর হেদায়াত- গ্রন্থ কোরআন মজীদকে যে লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রেখেছেন তা ধ্বংসশীল বস্তুগত অস্তিত্ব হতে পারে না, বরং তার অবস্তুগত অস্তিত্ব হওয়া অপরিহার্য। আর যা অবস্তুগত অস্তিত্ব তাতে কালির হরফে কিছু লিপিবদ্ধ থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

কোরআনের স্বরূপ

তাহলে লাওহে মাহফূয্ নামক অবস্তুগত অস্তিত্বে কোরআন মজীদ কীভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে? কোরআন মজীদ হচ্ছে تبيانا لكل شيء - "সকল কিছুর সুবর্ণনা (জ্ঞান)।" (সূরাহ্ আন্- নাহল : ৮৯)

'সকল কিছু' মানে কী? 'সকল কিছু' মানে সকল কিছুই। অর্থাৎ সৃষ্টিলোকের সূচনা থেকে রু করে শেষ পর্যন্ত সব কিছু; যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছুই এবং ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যা কিছুর ঘটা অনিবার্য হয়ে আছে তার সব কিছু এবং যা কিছুর ঘটা ও না- ঘটা সমান সম্ভাবনাযুক্ত বা শর্তাধীন রয়েছে তা সেভাবেই, আর একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনার সুবিশাল শূন্য ক্ষেত্র এতে নিহিত রয়েছে। কোরআন মজীদ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।" (সূরাহ্ আল্- আন্'আম্ : ৩৮)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতো কিছু লাওহে মাহফূযে কীভাবে নিহিত রয়েছে? অর্থাৎ কোন্ প্রক্রিয়ায় নিহিত রয়েছে?

এর একটাই প্রক্রিয়া হতে পারে। তা হচ্ছে, ওপরে যার উল্লেখ করা হলো তার সব কিছুই এক অবস্তুগত ত্রিমাত্রিক বাঙ্ময় চলচ্চিত্র আকারে তাতে সংরক্ষিত রয়েছে - যার সকল দৃশ্য তার দর্শকের কাছে প্রতিটি মুহূর্তে সমভাবে দৃশ্যমান ও প্রতিটি বাণী সদা বণযোগ্য। ধু বর্ণ ও শব্দ নয়, বরং স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শযোগ্যতার বশিষ্ট্যও তাতে রয়েছে যদিও তা অবস্তুগত। যার অন্তরের চোখ ও কান তা দেখার ও শোনার উপযোগী এবং অন্তরের নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয়, তাঁর কাছে তা স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শযোগ্যতা সহ সতত শ্রুত ও দৃশ্যমান।

ঠিক একজন কবির হৃদয়ের কানে যেভাবে বায়ুতরঙ্গহীন কবিতা ধ্বনিত হয় এবং একজন শিল্পীর মানসপটে যেভাবে বস্তুগত উপাদান ছাড়াই একটি বহুরঙা সুন্দর দৃশ্য বিরাজমান, এটা তার সাথে তুলনীয়। তবে শিল্পী দুর্বল স্রষ্টা; তাঁর মনোলোকে যা অস্তিত্বলাভ করে তার স্থায়িত্ব সীমিত

ও স্বল্পস্থায়ী এবং তিনি তা অন্যকে হুবহু দেখাতে অক্ষম, কিন্তু যেহেতু লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শযোগ্যতা বিশিষ্ট অবস্তুগত সৃষ্টি হচ্ছে পরম প্রমুক্ত সত্তা কর্তৃক সৃষ্ট তাই তা এ ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং তিনি যাকে তার অভিজ্ঞতা (অর্ন্তলোকীয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা) দিতে চান তা তাঁকে দিতে পুরোপুরি সক্ষম।

বাণী এক : প্রকাশে স্তরভেদ

বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে, মানুষের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার মূল বাণী স্থান- কাল- গোত্র- বর্ণ- ভাষাভেদে স্বতন্ত্র হতে পারে না। তবে ব্যক্তির প্রয়োজন ও ধারণক্ষমতা বিভিন্ন হবার কারণে এবং স্থানগত ও কালগত প্রয়োজনের বিভিন্নতার কারণে মানুষের কাছে সে বাণীর বিস্তারিত ও বাহ্যিক রূপে কিছু বিভিন্নতা হতে বাধ্য। একটি অভিন্ন দৃশ্য যখন বিভিন্ন আয়নায় প্রতিফলিত হয় তখন আয়নার গুণ, ক্ষমতা ও স্বচ্ছতার পার্থক্যের কারণে এবং দৃশ্যটি থেকে তার অবস্থানের দূরত্ব ও কৌণিকতার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যে পার্থক্য দেখা যায় - যে পার্থক্য মূল দৃশ্যের বিভিন্নতা ও পার্থক্য নির্দেশ করে না, বরং তা গ্রহণকারীদের মধ্যে পার্থক্যের কারণে দৃশ্যের প্রতিফলনসমূহের মধ্যে গুণগত ও মানগত পার্থক্য মাত্র। তেমনি আয়না যদি ভগ্ন হয় তাতে দৃশ্যটি বিকৃত রূপে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। কিন্তু তা কোনো অবস্থাতেই মূল দৃশ্যের নিখুঁত অবস্থাকে ব্যাহত করতে সক্ষম হয় না।

একইভাবে স্থান, কাল, পরিবেশ ও ভাষাগত পার্থক্যের কারণে আল্লাহর কালাম্ বিভিন্ন নবী- রাসূল ('আঃ) যেভাবে লাভ করেছেন তাতে পর্যায়গত পার্থক্য ছিলো বটে, কিন্তু তাতে কোনো পারস্পরিক বপরীত্য ছিলো না। যে সব ক্ষেত্রে বপরীত্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নবী- রাসূলগণের ('আঃ) অবর্তমানে তাঁদের অনুসারী হবার দাবীদার লোকদের মধ্য থেকে কতক প্রভাবশালী লোক তাতে বিকৃতি সাধন করেছিলো।

সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সর্বশেষ ও সর্বে ষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যখন আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর ব্যক্তিগত সত্তার গুণগত ও মানগত চরমোৎকর্ষ এবং তাঁর

স্থান- কাল- পরিবেশ ও ভাষার পূর্ণতম উপযুক্ততার কারণে তিনি এ বাণী লাওহে মাহফূযে যেভাবে ছিলো হুবহু - কোনোরূপ হ্রাসকরণ, সংক্ষেপণ ও সঙ্কোচন ব্যতীত সেভাবেই লাভ করেন। তেমনি যারা লাওহে মাহফূযের অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় এমন মানুষদের নিকট যতোখানি সর্বোত্তম ও বোধগম্যভাবে এ বাণী পৌঁছানো সম্ভবপর আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার অনন্যতার কারণে হযরত জিবরাঈল (‘আঃ)- এর সহায়তায় ভাষার আবরণে তিনি ঠিক সেভাবেই তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হন।

আসলে লাওহে মাহফূযের স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কেবল এটাই সুনিশ্চিত যে, তা এক সমুন্নত অবস্তুগত অস্তিত্ব কোরআন মজীদ যাতে সংরক্ষিত। তবে অনেক ইসলাম- বিশেষজ্ঞের ধারণা, স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয় (ক্বালব)ই হচ্ছে লাওহে মাহফূয্। এ মত অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল্ (‘আঃ) আল্লাহ্ তা‘আলার কাছ থেকে ‘ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ নিয়ে লাওহে মাহফূয্ রূপ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়ে নাযিল্ হন এবং তাতে সংরক্ষিত করে দিয়ে যান। পরে আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশে ভাষার আবরণে সেখান থেকে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের সামনে নাযিল্ হয়।

কোরআন মজীদ যেভাবে মানুষের সামনে নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর যবানে উচ্চারণ ও পঠনযোগ্য ভাষার আবরণে নাযিল্ হয় তা ছাড়াও যে ভাষাগত বর্ণনা ছাড়াই বর্ণিত সব কিছুর অবস্তুগত রূপ আকারে তথা ‘ইলমে হুযূরী আকারে তাঁর অন্তঃকরণে নাযিল্ হয়েছিলো তার প্রমাণ এই যে, তাঁর চর্মচক্ষুর সামনে সংঘটিত হয় নি কোরআন মজীদে বর্ণিত এমন ঘটনাবলীও তিনি হুবহু চর্মচক্ষুতে দেখার মতো করে তাঁর অন্তর্চক্ষুর দ্বারা দেখতে পেতেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.)

“(হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন নি আপনার রব হস্তি- মালিকদের সাথে কী আচরণ করেছেন?” (সূরাহ্ আল্- ফীল্ : ১)

এখানে أَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেন নি) বলতে চর্মচক্ষুতে দেখার অনুরূপ দেখাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, চাক্ষুষ না দেখে বণ ও পঠন থেকে মানুষের যে জ্ঞান হয় অনুরূপ জ্ঞান বুঝানো উদ্দেশ্য হলে الم تعلم বলাই সঙ্গত হতো। অন্যদিকে আমরা জানি যে, আবরাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংসের ঘটনা নবী করীম (ছ্বাঃ) চর্মচক্ষে দেখেন নি। সুতরাং এখানে যে অন্তর্চক্ষুর দ্বারা চর্মচক্ষে দেখার অনুরূপ দর্শন বুঝানো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

দুই পর্যায়ের নাযিল

ওপরে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক ‘ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ সরাসরি আল্লাহ্ তা‘আলার কাছ থেকে জিবরাঈলের (‘আঃ) মাধ্যমে লাওহে মাহফূয্ রূপ স্বীয় অন্তঃকরণে লাভ করার অথবা লাওহে মাহফূয্ নামক অন্য কোনো অবস্তুগত অস্তিত্বে সংরক্ষিত কোরআন মজীদ জিবরাঈলের (‘আঃ) মাধ্যমে স্বীয় অন্তঃকরণে লাভ করার ও সেখান থেকে যেভাবে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে দুই পর্যায়ের নাযিলের বিষয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথম পর্যায়ে কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পবিত্র হৃদয়পটে নাযিল্ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর হৃদয়পট থেকে মানুষের মাঝে নাযিল্ হয়।

এ থেকে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন মজীদের প্রথম নাযিল্ অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পবিত্র হৃদয়পটে নাযিলের ঘটনাটি একবারে ঘটেছিলো। বস্তুতঃ বস্তুজাগতিক উপাদান ও বশিষ্ট্য তথা দুর্বলতা থেকে মুক্ত এ অবিভাজ্য কোরআন নাযিল্ একবারেই হওয়া সম্ভব ছিলো। আর তা নাযিল্ হয়েছিলো লাইলাতুল্ ক্বাদরে (মহিমান্বিত রজনীতে)। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন :

(ان انزلناه فى ليلة القدر.)

“নিঃসন্দেহে আমি তা (কোরআন) মহিমান্বিত রজনীতে নাযিল্ করেছি।” (সূরাহ্ আল্- ক্বাদর : ১)

এ আয়াতে “হু” (ه) কর্মপদ দ্বারা পুরো কোরআন নাযিলের কথাই বলা হয়েছে। তেমনি তাতে ‘নাযিল্’- এর কথা বলা হয়েছে; ‘নাযিল্ রু’ করার কথা বলা হয় নি।

অন্যত্র উক্ত রজনী’কে ‘বরকতময় রজনী’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে :

(حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ)

“হা- মীম্। শপথ ঐ সুবর্ণনাকারী গ্রন্থের; নিঃসন্দেহে আমি তা বরকতময় রজনীতে নাযিল্ করেছি।” (সূরাহ্ আদ্- দুখান্ : ১- ৩)

এখানেও পুরো কোরআন নাযিলের কথা বলা হয়েছে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ)

“রামাযান্ মাস্ - যাতে কোরআন নাযিল্ করা হয়েছে - যা (কোরআন) মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ (হেদায়াত) এবং হেদায়াতের অকাট্য প্রমাণাবলী ও (সত্য- মিথ্যা ও ন্যায়- অন্যায়ের মধ্যে) পার্থক্যকারী (মানদণ্ড)।” (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৮৫)

এখানে লক্ষণীয় যে, রামাযান মাসে কোরআন নাযিল্ হওয়ার ঘটনাকে এ মাসের জন্য বিশেষ মর্যাদার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে মহিমান্বিত রজনীতে (লাইলাতুল্ ক্বাদর) বা বরকতময় রজনীতেও কোরআন নাযিল্ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি রামাযান মাসেই এবং এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। এ কোরআন নাযিলের কারণেই লাইলাতুল্ ক্বাদর হাজার রাতের চেয়েও উত্তম। সুতরাং কোরআন নাযিলের কারণে রামাযান মাসের মর্যাদার মানে এ নয় যে, এ মাসের বিভিন্ন দিনে বা রাতে কোরআন মজীদের বিভিন্ন অংশ নাযিল্ হয়েছিলো। কারণ, এভাবে কোরআন নাযিল্ অন্যান্য মাসেও হয়েছিলো। আর লাইলাতুল্ ক্বাদর- এর এতো বড় মর্যাদার কারণ কেবল এ নয় যে, এ রাতে কোরআন নাযিল্ রু হয়েছিলো, বরং পুরো কোরআন নাযিলের কারণেই এ মর্যাদা।

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে কোরআন বা কোরআনের স্থলাভিষিক্ত সর্বনাম দ্বারা যে এ গ্রন্থের অংশবিশেষ তথা কতক আয়াত বা সূরাহ্ বুঝানো হয় নি, বরং পুরো কোরআনকেই বুঝানো

হয়েছে তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এই যে, অন্যত্র কোরআন মজীদের আয়াত ও অংশবিশেষ নাযিল্ করার কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ).

"ত্বা- সীন্। এ হচ্ছে কোরআন ও সুবর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত।" (সূরাহ্ আন্- নামল্ : ১)

এখানে উদ্দিষ্ট আয়াতসমূহকে 'কোরআন' না বলে 'কোরআনের আয়াত' তথা কোরআনের অংশবিশেষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্রও ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে কোরআনের অংশবিশেষ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا)

"নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ কিতাব্ থেকে যা নাযিল্ করেছেন তা যারা গোপন করে এবং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা বিক্রয় করে ...।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৭৪)

এ আয়াত থেকেও সুস্পষ্ট যে, এতে পুরো কিতাবকে বুঝায় নি, বরং কিতাবের অংশবিশেষ বা ঐ পর্যন্ত নাযিলকৃত অংশকে বুঝানো হয়েছে। আর এর এক আয়াত পরেই আল্লাহ্ তা'আলা শুধু "কিতাব্" বলে পুরো কোরআন মজীদকে বুঝিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে :

(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ)

"এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্যতা সহকারে কিতাব্ নাযিল্ করেছেন।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৭৬)

এ আয়াতে 'কিতাব্ নাযিল্ করেছেন' এবং পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে (আল্- বাক্বারাহ্ : ১৭৪) 'কিতাব্ থেকে যা নাযিল্ করেছেন' উল্লেখ থেকেই সুস্পষ্ট যে, তাতে পুরো কোরআনকে বুঝানো হয় নি, কিন্তু শেষোক্ত আয়াতে (আল্- বাক্বারাহ্ : ১৭৬) পুরো কোরআনকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু আমরা জানি যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর যবান থেকে লোকদের সামনে দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত অল্প অল্প করে কোরআন মজীদ নাযিল্ হয়েছে। বিশেষ করে আমরা জানি যে, কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াতগুলো নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের মাত্র তিন মাস আগে বিদায় হজ্বের পরে নাযিল্ হয়। এমতাবস্থায় তার আগেই পুরো কোরআন- এর উল্লেখ কী করে

হতে পারে? আর ‘কোরআন’ বলতে যদি তার অংশবিশেষকে বুঝানো হয় তো সে ক্ষেত্রে কোনো কোনো আয়াতে কোরআনের অংশের উল্লেখের মানে কী? সুতরাং সন্দেহ নেই যে, যে সব ক্ষেত্রে ধু কোরআন বা কিতাব্ উল্লেখ করা হয়েছে, অংশ বা আয়াত উল্লেখ করা হয় নি সে সব আয়াতে পুরো কোরআন বুঝানো হয়েছে, অথচ তা বুঝানো হয়েছে কোরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিলের বেশ আগে। এমতাবস্থায় এ উভয় তথ্যের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় হতে পারে? দৃশ্যতঃ এ ধরনের কথায় স্ববিরোধিতা বা প্রকাশক্ষমতার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে তৎকালীন ইসলাম- বিরোধীরা কোনো ত্রুটিনির্দেশের জন্য এগিয়ে আসে নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে (পুরো) ‘কোরআন’ নাযিল্ ও কোরআনের আয়াত বা অংশবিশেষ বা সূরাহ্ নাযিল্ বলতে একই ধরনের ‘নাযিল্’ বুঝাতো না।

কোরআন নাযিলের ধরন

পুরো কোরআন মজীদ যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর বস্তুদেহের কর্ণকুহরে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে নাযিল্ করা হয় নি, বরং তাঁর হৃদয়পটে নাযিল্ করা হয়েছে তা- ও কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(و انه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين.)

"(হে রাসূল!) নিঃসন্দেহে এটি (এ কিতাব্) জগতবাসীদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত - যা সহ বিশ্বস্ত রূহ্ (জিবরাঈল) আপনার অন্তঃকরণে নাযিল্ হয়েছে যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন - সুবর্ণনাকারী প্রাঞ্জল (আরবী) ভাষায়।" (সূরাহ্ আশ্- 'আরা' : ১৯২- ১৯৫)

অন্য এক আয়াতেও হযরত জিবরাঈল্ ('আঃ) যে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর অন্তঃকরণে কোরআন পৌঁছে দিয়েছিলেন তা- ই উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ)

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন : যে কেউ জিবরীলের দুশমন হয় (সে জেনে রাখুক), নিঃসন্দেহে সে (জিবরীল্) আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তা (কোরআন) আপনার অন্তঃকরণে নাযিল্ করেছে।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ৯৭)

এখানে হযরত জিবরাঈল্ ('আঃ) যে, পুরো কোরআন নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর অন্তঃকরণে পৌঁছে দিয়েছিলেন সুস্পষ্ট ভাষায় তা- ই বলা হয়েছে।

অন্যদিকে কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কণ্ঠ থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে নাযিল্ হয়েছিলো অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে - এ এক অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য যে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিতর্কের অবকাশ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআন মজীদের এই প্রথম নাযিল্ অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পবিত্র হৃদয়ে একবারে সমগ্র কোরআন মজীদ নাযিলের স্বরূপ কী ছিলো?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর মাধ্যমে যে মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পরিপূর্ণতম বহিঃপ্রকাশ ঘটবে - এ ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকর্মের সূচনাপূর্ব পরিকল্পনারই অংশবিশেষ। তাই খোদায়ী পরিকল্পনার আওতায় বিশেষভাবে রক্তধারার পবিত্রতা সংরক্ষণ সহ খোদায়ী হেফাযতে এ দায়িত্ব পালনের উপযোগী হয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন। তদুপরি তাঁর হৃদয়ে একবারে সমগ্র কোরআন মজীদ নাযিলের পূর্বে তাঁর হৃদয়কে প্রশস্ত (شرح صدر) করা হয়। এ প্রশস্ততা যে বস্তুদেহের হৃদপিণ্ডের প্রশস্ততা ছিলো না, বরং অন্তঃকরণের গুণগত ও মানগত প্রশস্ততা ছিলো তা বলাই বাহুল্য।

এভাবে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়কে গুণগত ও মানগত দিক থেকে লাওহে মাহফূযে পরিণত করা হয় অথবা লাওহে মাহফূয্ যদি স্বতন্ত্র কোনো অবস্তুগত অস্তিত্ব হয়ে থাকে তো তাঁর অন্তঃকরণকে লাওহে মাহফূযের সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয় - যাকে আত্মিক মি'রাজ নামে অভিহিত করা চলে। তাঁর হৃদয় এ পর্যায়ে উন্নীত হবার কারণেই তা লাওহে মাহফূযে পরিণত হয় বা তার পক্ষে লাওহে মাহফূযের ধারণক্ষমতার সমান ধারণক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং জিবরাঈল্ কর্তৃক সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে অথবা লাওহে মাহফূয্ নামক অন্য অবস্তুগত অস্তিত্ব থেকে নিয়ে আসা কোরআনকে কোনোরূপ হ্রাস, সঙ্কোচন ও সংক্ষেপণ ছাড়া হুবহু গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এভাবে আল্লাহর কাছ থেকে বা বর্ণিত স্বতন্ত্র লাওহে মাহফূয্ থেকে কোরআন মজীদ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর লাওহে মাহফূয্ রূপ হৃদয়ে নেমে আসে বা নাযিল্ হয়।

অর্থাৎ কোরআন নাযিল্ মানে কোরআনের বস্তুগত উর্ধলোক থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা নয়, বরং অবস্তুগত জগত থেকে বস্তুজগতের অধিবাসীর অবস্তুগত হৃদয়ে নেমে আসা; হৃদপিণ্ড নামক শরীরের বিশেষ মাংসপিণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করা নয়, বরং তাকে আ য় করে অবস্থানরত অবস্তুগত হৃদয়ে প্রবেশ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা 'ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদের যে স্বরূপের কথা উল্লেখ করেছি, এ ধরনের কোরআনের এক বারে নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়ে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা? যেহেতু তা ব্যাপক বিশাল ও সুদীর্ঘকালীন বস্তুজাগতিক ও অবস্তুজাগতিক সব

কিছুর অবস্তুগত রূপ, সেহেতু অবস্তুগত হলেও এহেন স্থানগত ও কালগত ব্যাপকবিস্তৃত কোরআন এক বারে কী করে তাঁর হৃদয়ে নাযিল্ হওয়া সম্ভব?

এ প্রশ্নের তাত্ত্বিক জবাব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে সেখানে অসম্ভব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, যেহেতু বস্তুজাগতিক ও অবস্তুজাগতিক সত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বশিষ্ট্যের অধিকারী সেহেতু বস্তুজাগতিক সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার আলোকে অবস্তুজাগতিক সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ বস্তুজগতেও আমরা দেখতে পাই যে, যে সব অস্তিত্ব যতো স্থূল তার গতি ততো কম ও স্থানান্তরক্ষমতা ততো শ্লথ এবং যে বস্তুর স্থূলতা যতো কম বা তা যতো বেশী সূক্ষ্মতার কাছকাছি তার গতি ততো দ্রুত এবং তার স্থানান্তরক্ষমতা ততো বেশী। আমরা দেখতে পাই, কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থ, তরল পদার্থের তুলনায় বায়বীয় পদার্থ ও বায়বীয় পদার্থের তুলনায় বিদ্যুত দ্রুততর গতিতে ও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্থতঃ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে ধারাবাহিক চলচ্চিত্রটি দেখতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে তা কয়েক মিনিটের মধ্যে কপি করা যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় পুরোপুরি অবস্তুগত কোরআন মজীদ নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়পটে স্থানান্তরে পরিমাপযোগ্য কোনো সময় লাগা অপরিহার্য নয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল ('আঃ) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে হেরা গুহায় প্রথম বার ওয়াহী পৌঁছে দেয়ার সময় তাঁকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। এভাবেই কি হযরত জিবরাঈল ('আঃ) পুরো অবস্তুগত কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়পটরূপ লাওহে মাহফূযে স্থানান্তরিত করেছিলেন? সম্ভবতঃ তা- ই।

এ ঘটনা হেরা গুহায় সংঘটিত হয়ে থাকুক অথবা নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর গৃহে বা অন্য কোথাও, এতে সন্দেহ নেই যে, এটা লাইলাতুল্ ক্বাদর- এ ঘটেছিলো। আর, কেবল এর পরেই জিবরাঈল্ ('আঃ) সেখানে হোক বা অন্যত্র হোক ভাষার আবরণে প্রথম আয়াতগুলো হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে (সম্ভবতঃ তাঁর অন্তরকর্ণে) পাঠ করে শোনান। এ আয়াতগুলো,

যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরাহ্ আল্- ‘আলাক্ব- এর প্রথম পাঁচ আয়াত হতে পারে, অন্য কোনো আয়াত বা সূরাহ্ও হতে পারে। এতে কোনোই পার্থক্য নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কতক খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছের বর্ণনায় যেমন বলা হয়েছে যে, প্রথম ওয়াহী নাযিলের সময় হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) বুঝতেই পারেন নি যে, তাঁকে নিয়ে কী ঘটছে অর্থাৎ তাঁকে নবী করা হয়েছে, এ কারণে তিনি ঘাবড়ে যান - এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর ৎ ষ্ঠতম নবী ও রাসূলকে (ছ্বাঃ) ওয়াহী নাযিল্ করে নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত করবেন অথচ নবী করীম (ছ্বাঃ) তা বুঝতেই পারবেন না বলে অস্থির ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন এবং এরপর তিনি একজন খৃস্টানের কথায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন - তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ অকল্পনীয়। আল্লাহ্ তা‘আলা অতীতের কোনো নবী- রাসূলের (‘আঃ) সাথে এ ধরনের আচরণ করেন নি। সুতরাং এ ধরনের বর্ণনা - যা মুতাওয়াতির্ নয় - ‘আক্বলের কাছে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, কিছু লোকের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পূত চরিত্র এবং হেরা গুহায় আল্লাহ্ তা‘আলার ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন নি, বরং আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায়ই তাঁকে নবী হিসেবে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিলো এবং এ কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর পূর্বপুরুষদের রক্তধারার পবিত্রতা এবং তাঁর চরিত্র ও নতিকতা হেফাযতের জন্য বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর আগমন আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় নির্ধারিত ছিলো বলেই অতীতের প্রত্যেক নবী- রাসূল (‘আঃ)ই তাঁর আগমনের কথা জানতেন এবং তাঁরা তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) নবী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং জন্মসূত্রেই তাওহীদ্ ও আখেরাতে অকাট্য ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত হবার আগে তিনি ‘ঈমান’- এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ও ‘ওয়াহী’র স্বরূপের সাথে পরিচিত ছিলেন না।

কোরআনের ভাষাগত রূপ আল্লাহর

বিভিন্ন সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে তাঁর নবুওয়াতের বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত করা ও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য আদেশ আসার পূর্বেও তিনি আসমান- যমীনের নিগূঢ় সত্য অবলোকন করতেন। এর বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। অতএব, অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ নিগূঢ় সত্যের প্রত্যক্ষকরণ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো। কিন্তু তাঁকে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত করা হলো এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাঁর জন্য বড় সমস্যা ছিলো এই যে, যে মহাসত্য ('ইলমে হুযূরী রূপে অবস্তুগত কোরআন মজীদ) তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলো - যা কোনো কালির হরফে লেখা কিতাব্ ছিলো না (সম্ভবতঃ এ কারণেই - লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কিতাব্ পাঠের জন্য অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজন ছিলো না বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরক্ষর রেখেছিলেন), তা মানুষের কাছে প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা তাঁর জানা ছিলো না। তাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল ('আঃ) ভাষার আবরণে পর্যায়ক্রমে এ মহাসত্যকে তাঁর মুখে জারী করেন।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর মুখে এ কোরআন ভাষার আবরণে জারী হলো বটে, কিন্তু এর ভাষা তাঁর নিজের নয়। বিশেষ করে তিনি তৎকালীন আরবের কোনো কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মী, বা অলঙ্কারবিদ্যাবিশারদ ছিলেন না; এমনকি তিনি লিখতে- পড়তেও জানতেন না। অতএব, মানুষের সকল ভাষার মধ্যে প্রকাশক্ষমতার বিচারে শ্রেষ্ঠতম ভাষা আরবী ভাষার এ শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের ভাষা ও বক্তব্য তাঁর নিজের হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এ গ্রন্থ যার পক্ষ থেকে তাঁর হৃদয়পটে নাযিল্ হয়েছিলো তথা প্রবেশ করেছিলো তিনি স্বয়ং একে সম্ভাব্য সর্বোত্তমরূপে মানুষের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তিত করে হযরত জিবরাঈল ('আঃ)- এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়ে ও মন- মগযে গ্রথিত করে দেন এবং তাঁর মুখে অন্যদের নিকট প্রকাশ করেন।

কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়ে যে সত্য প্রবেশ করেছিলো এবং তিনি যে সত্য অহরহ প্রত্যক্ষ করছিলেন এভাবে মানুষের ভাষার আবরণে প্রকাশের মাধ্যমে কি সে সত্যের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ সম্ভব ছিলো? বস্তুতঃ বণ কখনোই প্রত্যক্ষকরণের - ধু চক্ষু দ্বারা নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষকরণের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠে কোনোদিনই অভিজ্ঞতা হাছ্বিল হয় না।

তাছাড়া প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষাগত সীমাবদ্ধতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, আরবী ভাষা মানুষের ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রকাশসম্ভাবনার অধিকারী ভাষা হলেও তা মানুষের ভাষা ব নয়। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয়াদির জন্যে কোনো ভাষায়ই যথোপযুক্ত শব্দাবলী ও প্রকাশকৌশল থাকতে পারে না, তা সে ভাষা যতোই না প্রায় সীমাহীন প্রকাশসম্ভাবনার অধিকারী হোক। এমতাবস্থায়, মানুষের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত জগতের সত্যসমূহকে মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের শব্দাবলী ও পরিভাষা সমূহ ব্যবহার করে মোটামুটি এজমালীভাবে প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অতএব, সুস্পষ্ট যে, ভাষার আবরণে যে কোরআন মজীদ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হলো তা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়স্থ কোরআন মজীদের একটি পর্যায়গত ও মাত্রাগত অবতরিত রূপ ব নয়। এ হচ্ছে কোরআন মজীদের দ্বিতীয় দফা নাযিল্ বা মানগত অবতরণ। কোরআন মজীদের এ পর্যায়গত বা মানগত অবতরণ ঘটে সাধারণ মানুষের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম রূপে ।

নুযূলের আরো পর্যায়

কিন্তু কোরআন মজীদের নুযূল বা গুণগত অবতরণ এখানেই শেষ নয়। আমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এর আরো নুযূল দেখতে পাই - যা অবশ্য প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে ‘নুযূল্’- এ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

বস্তুতঃ কোনো কিছুকেই তার স্থান, কাল ও প্রেক্ষাপট থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কোনো বক্তার বক্তব্য বিভিন্নভাবে শোনা যায়, যেমন : সরাসরি বক্তার সামনে বসে শোনা হয়,

বা তার রেকর্ড বাজিয়ে শোনা যায়, বা সরাসরি নেছে এমন কোনো ে াতার কাছ থেকে হুবহু শোনা যায়, অথবা মুদ্রিত আকারে পড়া যায়। এর প্রতিটির প্রভাব ে াতা বা পাঠক- পাঠিকার ওপর স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, বক্তা এবং তাঁর বক্তব্যের ে াতা বা পাঠকের মাঝে স্থানগত ও কালগত ব্যবধানও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাবশালী। এ ক্ষেত্রে বক্তা ও লেখক থেকে ে াতা ও পাঠকের স্থানগত ও কালগত ব্যবধান যতো বেশী হবে বক্তব্যের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ততোই মাত্রাগত অবনতি ঘটবে। অতএব, এ- ও এক ধরনের নুযূল বা অবতরণ তথা মানগত অবনয়ন বটে, যদিও ঐতিহ্যিকভাবে কোরআন বিশেষজ্ঞগণ এ জন্য "নুযূল্" পরিভাষা ব্যবহার করেন নি। তার চেয়েও বড় কথা, কোরআন মজীদের নুযূলের এ ধরনের পর্যায়সমূহ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পর্যায় থেকে অনেক নীচে বিধায় তা বাঞ্ছিত পর্যায় নয়। সুতরাং কোরআনকে সঠিকভাবে তথা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বাঞ্ছিত পর্যায়ে অনুধাবনের জন্য এবং সে লক্ষ্যে স্বীয় অনুধাবনক্ষমতার কাম্য পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো বক্তার বক্তব্যের তাৎপর্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় গ্রহণের উপায় কী? নিঃসন্দেহে এর উপায় হচ্ছে, জ্ঞানগতভাবে ে াতাকে বা পাঠককে স্থান, কাল, ভাষা ও পরিবেশগত ব্যবধান সমূহ অতিক্রম করে বক্তার সম্মুখে উপবিষ্ট ে াতার পর্যায়ে এবং গুণগতভাবে যতো বেশী সম্ভব বক্তার কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। এ কারণেই, সে যুগের যে সব যথোপযুক্ত ব্যক্তি কোরআন মজীদকে সরাসরি হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কাছ থেকে নে অনুধাবন করেন সেভাবে বোঝার জন্য এ যুগের মানুষকে অনেক কিছু অধ্যয়ন করে জ্ঞানগত দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর স্থান- কালে উপনীত হতে হবে এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক মাত্রায় বুঝতে হলে আত্মিক, নতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে যে সব ছ্বাহাবী তাঁর সর্বাধিক কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন এ সব দিক থেকে ে াতা বা পাঠককে তাঁদের স্তরে উন্নীত হতে হবে।

অন্যদিকে কোনো অনারব ব্যক্তিকে এ পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে তাঁকে অবশ্যই তৎকালীন আরবী ভাষা- সাহিত্যের ওপর সে যুগের কবি- সাহিত্যিক- বাগ্মীদের সমপর্যায়ের দক্ষতার অধিকারী হতে

হবে। কোরআন মজীদের পাঠক- পাঠিকা এ সব ক্ষেত্রে যেদিক থেকেই যতোখানি পশ্চাদপদ হবেন সেদিক থেকেই কোরআন মজীদের তাৎপর্য তাঁর নিকট পর্যায়গত দিক থেকে ততোখানি নিম্নতর মাত্রায় প্রকাশিত হবে। এ- ও এক ধরনের নুযূল্ বা অবতরণ, তবে তা বাঞ্ছিত মাত্রা ও পর্যায়ের অবতরণ নয়।

এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ নীচের উদাহরণটি প্রযোজ্য হতে পারে :

অঙ্কশাস্ত্রের একজন ডক্টরেট, একজন মাস্টার ডিগ্রীধারী, একজন গ্রাজুয়েট, ... একজন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী - এদের প্রত্যেকেই অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু তাঁদের অঙ্কজ্ঞানের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ডক্টরেটের জ্ঞানের তুলনায় মাস্টার ডিগ্রীধারীর জ্ঞান নিম্নতর ....। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে যে অঙ্কজ্ঞান দিয়েছেন - যা লাভ করে ঐ ছাত্র মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেছেন তা মাত্রাগত দিক থেকে ঐ শিক্ষকের সমপর্যায়ের অঙ্কজ্ঞান নয়, বরং পর্যায়গত দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। এভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী পর্যন্ত ক্রমেই নীচে নেমে এসেছে।

এ ব্যাপারে সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত উপমাটি অধিকতর উপযোগী :

মানব প্রজাতির ইতিহাসের জ্ঞান বিভিন্ন স্তরের হতে পারে। কোনো ইতিহাসবিশারদের জ্ঞান পরিমাণগত দিক থেকে যতো বেশী হবে ও গুণগত দিক থেকে যতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হবে তাঁর জ্ঞান ততো উচ্চতর স্তরের এবং যার জ্ঞান পরিমাণগত দিক থেকে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়ার বিচারে যতো কম হবে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান অপেক্ষাকৃত ততো নিম্নতর স্তরের হবে।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, কোনো জাতির বা সমগ্র মানব প্রজাতির ভাগ্য নির্ধারণে কেবল বড় বড় ব্যক্তিত্ব ও বড় বড় ঘটনা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং একান্তই মামূলী ধরনের মানুষের দনন্দিন অরাজনৈতিক কাজ ও ছোট ছোট ঘটনাও ইতিহাসের বড় ধরনের গতি পরিবর্তনের কারণ হতে পারে।

 ধু মানুষের ভূমিকা নয়, ইতর প্রাণীর ভূমিকা, এমনকি জড় বস্তুর অবস্থাও এ ব্যাপারে প্রভাবশালী হতে পারে। ইতিহাসে এ ধরনের কিছু কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। পাথরে আঘাত লেগে ঘোড়ার পা ভেঙ্গে গিয়ে সেনাপতি বা রাজার পড়ে গিয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার ফলে যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে এমন ঘটনার কথাও জানা যায়। লেডি যোশেফাইনের দুর্ব্যবহার জনিত মানসিক অশান্তি নেপোলিয়ান বোনাপার্টির যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হয়েছিলো বলে জানা যায়। এমনকি বেশী খাওয়া বা কম খাওয়ার প্রতিক্রিয়াও যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হতে পারে। সাম্প্রতিক কালের একটি বজ্ঞানিক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ফিলিপাইনে একটি প্রজাপতির পাখা ঝাপটানোর ফলে বাংলাদেশে ঝড় হতে পারে। অতএব, কোনো সাধারণ মানুষকে, এমনকি কোনো ইতর প্রাণীকে একটি পিঁপড়ার কামড়ের প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণের কারণ হতে পারে। সুতরাং মানব প্রজাতির ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে যিনি মানব প্রজাতির সূচনা থেকে রু করে মানুষ, প্রাণীকুল, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের প্রতিটি ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী; এরূপ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে।

এবার এমন একজন কাল্পনিক ইতিহাসবিদের কথা ধরা যাক যিনি হযরত আদম ('আঃ)- এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বেঁচে আছেন এবং বর্তমান যুগে জ্ঞান আহরণের যে সব অত্যুন্নত উপায়- উপকরণ আছে (যেমন : কৃত্রিম উপগ্রহ, ইন্টারনেট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি) রু থেকেই তিনি সে সবের অধিকারী, তাঁর ইতিহাসজ্ঞান হবে আমাদের ইতিহাসজ্ঞানের তুলনায় অকল্পনীয়রূপে বেশী। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এরূপ ইতিহাসজ্ঞানী প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি জড় পদার্থের ভিতর ও বাইরের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নন। অতএব, মানবপ্রজাতির গোটা ইতিহাস সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় তাঁর জ্ঞান হবে খুবই নিম্ন মানের, যদিও আমাদের ইতিহাসজ্ঞানের তুলনায় অকল্পনীয়ভাবে উঁচু মানের।

এখন এ ধরনের কাল্পনিক ইতিহাসবিজ্ঞানী যদি আমাদের যুগের কোনো ব্যক্তিকে তাঁর জ্ঞান দিতে চান তাহলে নিঃসন্দেহে লক্ষ লক্ষ বছরে আহরিত জ্ঞান তাঁকে হুবহু প্রদান করা সম্ভব হবে

না, বরং সংক্ষেপণ ও সঙ্কোচন করে এ জ্ঞান দিতে হবে। ধরুন একাধারে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো কাজে সময় ব্যয় না করে কেবল প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মানব প্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান হবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির তুলনায় নিম্নতর পর্যায়ের। এভাবে এ জ্ঞান পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপণ ও সঙ্কোচন হয়ে একটি পঞ্চম ে ণীর ছাত্রকে মানবপ্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যে জ্ঞান দেয়া হয় তার অবস্থা চিন্তা করুন। এভাবে প্রতিটি স্তরেই একটি বিষয়ের জ্ঞান পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হতে গিয়ে পরিমাণগত, মানগত ও গুণগত দিক থেকে নীচে নেমে আসছে; একেই বলে জ্ঞানের নুযূল্ ঘটা।

কোরআন মজীদের জ্ঞান স্থানগত, কালগত ও গ্রহণকারীর মানগত দিক থেকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) থেকে যতো দূরে এসেছে ততোই তার মান নীচে নেমেছে। এভাবে তার বিভিন্ন স্তরের অবতরণ বা নিম্নগমন (নুযূল) ঘটেছে। আর, আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআনের জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন জ্ঞানে এবং আত্মিক, নতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীতে সজ্জিত হয়ে জ্ঞানগত ও মানগত দিক থেকে নিজেকে যতোই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবেন ততোই নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর কোরআন- জ্ঞান ও তাঁর কোরআন- জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে। ধু তা- ই নয়, পরবর্তীকালীন জ্ঞান- বিজ্ঞানের সংযোগ হওয়ার ফলে স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর মজলিসে হাযির থেকে কোরআন বণকারীদেরও অনেকের তুলনায় ঐ ব্যক্তির কোরআন- জ্ঞান বেশী হবে। অবশ্য যারা আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহে ইলহামের অধিকারী হয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন - তা তাঁরা যে যুগেরই হোন না কেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

সাত যাহের্ ও সাত বাত্বেন্

একই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, কোরআন বিষয়ক পণ্ডিতগণ ও মুফাসসিরগণের অনেকের অভিমত অনুযায়ী, কোরআন মজীদের সাতটি ‘যাহের্’ বা বাহ্যিক তাৎপর্য ও সাতটি ‘বাত্বেন্’ বা গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। এর প্রথম যাহেরী তাৎপর্য হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগে ‘সর্বজনীনভাবে’ কোরআন মজীদ থেকে যে তাৎপর্য গ্রহণ করা হতো তা- ই। কিন্তু কোরআন মজীদ নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে এ থেকে আরো বহু বাহ্যিক তাৎপর্য বেরিয়ে এসেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সে সব তাৎপর্য এমনই বিস্ময়কর যা অতীতে কল্পনাও করা যেতো না। উদাহরণস্বরূপ, সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহর ২৬১ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة. و الله يضاعف لمن يشاء. و الله واسع عليم.)

“যারা আল্লাহর পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের (এ কাজের) উপমা হচ্ছে, যেন একটি শস্যদানায় সাতটি শীষ উদগত হলো - যার প্রতিটি শীষে একশ’টি করে দানা হলো। আর আল্লাহ্ যাকে চান বহু গুণ বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ অসীম উদার ও সদাজ্ঞানময়।”

বলা বাহুল্য যে, এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয়ের ভ প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে যা আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্য (যাহের্) থেকে সুস্পষ্ট। কিন্তু একই সাথে এ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যেই একটি তথ্য ও একটি ভবিষ্যদ্বাণীও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তা হচ্ছে, একটি শস্যদানা থেকে সাতশ’ বা তার বেশী শস্যদানা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন একটি শস্যদানা থেকে সাতশ’ বা তার বেশী শস্যদানা উৎপন্ন হবে।

উক্ত আয়াত থেকে যে আমরা এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করছি তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় অসম্ভব এমন কিছুর উপমা দেবেন - তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোরআন মজীদ নাযিলের যুগের কৃষিব্যবস্থায় একটি ধান বা গম অথবা অন্য কোনো দানা জাতীয় শস্য থেকে সাতশ' দানা উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টি ছিলো অকল্পনীয়, কিন্তু সে যুগেও একটি ফলের বীজ থেকে গজানো গাছে ধু এক বার নয়, বরং প্রতি বছর সাতশ' বা তার বেশী ফলের উৎপাদন অসম্ভব ছিলো না। আরব দেশে উৎপন্ন খেজুর ছিলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমতাবস্থায় যদি উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতো ধু আল্লাহর পথে ব্যয়ের ভ প্রতিফল বর্ণনা করা তাহলে এ ক্ষেত্রে ফলের বীজের উদাহরণই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা দানা জাতীয় শস্যের উদাহরণ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এর পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে; হয়তো বা একাধিক বিশেষ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, তবে অন্ততঃ উপরোক্ত তথ্য বা ভবিষ্যদ্বাণী যে তার অন্যতম উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ নেই ।

অবশ্য কোরআন মজীদের নাযিলের যুগের পাঠক- পাঠিকাগণ উক্ত আয়াতের প্রথম যাহের্ বা প্রথম বাহ্যিক তাৎপর্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের নিকট হয়তো এটি এ আয়াতের একমাত্র বাহ্যিক তাৎপর্য বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান যুগে ধান ও গমের বহু উচ্চফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতিমধ্যেই একটি দানা থেকে সাতশ' দানা বা তার বেশী উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যে ধু আল্লাহর পথে দানের ভ প্রতিফলই বর্ণনা করা হয় নি, বরং একটি বাস্তবতা সম্পর্কে তথ্য ও ভবিষ্যদ্বাণীও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এভাবে কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের, প্রতিটি সূরাহর ও সামগ্রিকভাবে পুরো কোরআন মজীদের সাতটি যাহের্ বা বাহ্যিক তাৎপর্য রয়েছে বলে অনেক কোরআন- বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও মুফাসসির মনে করেন।

একইভাবে কোরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের, প্রতিটি সূরাহর ও সামগ্রিকভাবে পুরো কোরআন মজীদের সাতটি বাত্বেন্ বা গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। যেমন : সমগ্র কোরআন মজীদের অন্যতম বাত্বেন্ বা গূঢ় তাৎপর্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিলোক অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে রু করে সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিলোক এবং এর সকল কর্মকাণ্ড। কোরআন মজীদ তার

নিজের ভাষায় تبيانا لكل شيء (সকল কিছুর সুবর্ণনা) - এ থেকে তা- ই বুঝা যায়। কারণ, كل شيء (প্রতিটি জিনিস) বলতে ছোট- বড় কোনো কিছুই বাকী থাকে না।

অবশ্য এ হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদের অবস্থা এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে যা কিছু ঘটেছে ও কোরআন মজীদ নাযিল্- কালে যা কিছু অনিবার্যভাবে ও শর্তাধীনে ঘটিতব্য ছিলো তার সবই তাতে নিহিত ছিলো ও রয়েছে, আর ঘটিতব্যগুলো পরবর্তীকালে ঘটেছে ও অবশ্যই ঘটবে। এ কারণেই লাওহে মাহফূয্ তথা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদ হচ্ছে কিতাবুম্ মুবীন (সুবর্ণনাকারী গ্রন্থ)। আর আমাদের কাছে যে পঠনীয় ও বণীয় কোরআন রয়েছে তা হচ্ছে উক্ত কোরআনেরই নুযূলপ্রাপ্ত (অবতরণকৃত তথা মানগত দিক থেকে নীচে নেমে আসা) রূপ।

কোরআন মজীদের আরেক বাত্বেন হলেন স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)। কারণ, তিনি ছিলেন কোরআন মজীদের মূর্ত রূপ। এর মানে ধু এ নয় যে, কোরআন পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর চরিত্র ও জীবনধারা জানা যাবে, বরং এর মানে হচ্ছে, সমগ্র কোরআন মজীদে তিনি প্রতিফলিত। ফলে যিনি কোরআন মজীদের সাথে পরিচিত হলেন তিনি স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর সাথেই পরিচিত হলেন এবং কোরআন মজীদকে যতোটুকু জানলেন স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)কে ততোটুকু জানতে পারলেন।

অবশ্য কারো যেন এরূপ ধারণা না হয় যে, হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর দনন্দিন পার্থিব জীবন অর্থাৎ তিনি কোনদিন কখন কী খেলেন, কখন ঘুমালেন, কখন কোথায় গেলেন ইত্যাদি কোরআন মজীদের গভীর অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত ও পুরোপুরি জানা যাবে। কারণ, মানুষকে এ সব বিষয় জানানো ঐশী কালামের উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর জীবনে ছোট- বড় এবং গ্রহণীয়- বর্জনীয় যা কিছু শিক্ষণীয় ছিলো তার সবই কোরআন মজীদ থেকে জানা যাবে। আর হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ), অন্যান্য নবী- রাসূল (‘আঃ), এমনকি কাফের-

মোশরেবকদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সব ঘটনা কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে সে সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে সবে নিহিত শিক্ষা পৌঁছে দেয়া।

লাওহে মাহফূযে ও স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদে 'সকল কিছুর বর্ণনা' এভাবেই নিহিত রয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও কোরআন মজীদের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। অর্থাৎ সৃষ্টির রু থেকে সকল কিছু খুটিনাটি সহ সব কিছুই, প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি কর্ম, এমনকি যার মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় কিছু নেই তা সহ, আল্লাহর জ্ঞানে প্রতিফলিত। কিন্তু কোরআন মজীদে অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে বা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সত্তায় কেবল করণীয় ও বর্জনীয় এবং মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি- অবনতিতে প্রভাব বিস্তারক বিষয়াদির জ্ঞান ও তদসম্বলিত ঘটনাবলী নিহিত রাখা হয়েছে বলে মনে হয় (নিশ্চিত জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে)।

কোরআন মজীদের গভীরতম বাত্বেন্ হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ, কোরআন মজীদের মাধ্যমে তিনি নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা নন। অতএব, তাঁর পক্ষে মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরং কেবল তাঁর গুণাবলী ও তাঁর কাজের মাধ্যমে তাঁকে জানা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও কাজের সাথে যিনি যতো বেশী পরিচিত তিনি ততো বেশী মাত্রায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে পরিচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে সৃষ্টির মাধ্যমে, সমগ্র সৃষ্টিলোকের সৃষ্টির মাধ্যমে ও লাওহে মাহফূযে বা নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর সত্তায় নিহিত কোরআন মজীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন যার নুযূলপ্রাপ্ত বা মানের অবতরণকৃত রূপ হচ্ছে পঠনীয় ও বণীয় কোরআন।

অতএব, কোরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তার অস্তিত্বের তাজাল্লী - তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। অর্থাৎ কোরআন মজীদে যা কিছু আছে তার সব কিছু মিলে এক মহাসত্যের সাক্ষ্য বহন করছে, সে মহাসত্য হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা।

কোরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল্ হলো

কোরআন মজীদ কেন আরবী ভাষায় নাযিল্ হলো? অনেক সময় এ ধরনের প্রশ্ন করতে শোনা যায় এবং ঈমানদারদের পক্ষ থেকে নিজ নিজ জ্ঞান মতো এ প্রশ্নের জবাব দিতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এ প্রশ্নের জবাব হয় আত্মরক্ষামূলক (Defensive)। অর্থাৎ কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যে কোনো আপত্তি খণ্ডন করা ঈমানী দায়িত্ব কেবল এ অনুভূতি থেকে জবাব - সংশয়কে -দেয়া হয়। কিন্তু সে জবাব কতোখানি যথার্থ বা তা প্রশ্নকর্তাদের অন্তর থেকে সন্দেহ অকাট্যভাবে দূর করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে খুব কমই চিন্তা করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই এ সব জবাব হয় মনগড়া এবং প্রকৃত অবস্থা ও কোরআন মজীদের চেতনার সাথে সম্পর্কহীন। কিন্তু অ- যথার্থ জবাব দিয়ে কোরআন মজীদের প্রতিরক্ষা করতে হবে - কোরআন মজীদ এহেন দুর্বলতার উর্ধে। তাই এ প্রশ্নের যথার্থ জবাব সন্ধান ও প্রদান অপরিহার্য।

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্নকর্তার বা প্রশ্নকর্তাদের উদ্দেশ্য কী দেখতে হবে এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক জবাব দিতে হবে।

দায়িত্ব এড়ানোর বাহানা

একদল প্রশ্নকর্তা এ প্রশ্ন করে কোরআন মজীদ অধ্যয়ন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও আলস্য রয়েছে তার সপক্ষে ছাফাই গাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা বলে, কোরআন মজীদ যদি আরবদের মাতৃভাষায় নাযিল্ না হয়ে আমাদের মাতৃভাষায় নাযিল্ হতো তাহলে আমরা তা পড়ে ও অধ্যয়ন করে সহজেই বুঝতে পারতাম।

তাদের এ বক্তব্য কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তির ওপর ভিত্তিশীল নয়। কারণ, কোরআন মজীদকে প্রশ্নকর্তাদের মাতৃভাষায় নাযিল্ করা হলে অন্য ভাষাভাষীরা একই রকম বাহানা তুলতো। তাছাড়া কোরআন মজীদ যাদের মাতৃভাষায় নাযিল্ হয়েছে সেই আরবদেরও সকলে কোরআনের ওপর ঈমান আনে নি এবং যারা ঈমান আনার দাবী করেছে বা করছে তাদেরও সকলেই যে সঠিক অর্থে কোরআন মজীদ বুঝতে পেরেছে বা বোঝার চেষ্টা করেছে তা নয়।

অবশ্য কোরআন মজীদ অত্যন্ত সহজ- সরল ও গতিশীল প্রাঞ্জল ভাষায় নাযিল্ হয়েছে; আরবী ভাষাভাষী ও আরবী- জানা লোকদের কাছে এটি মোটেই দুর্বোধ্য মনে হবে না। তা সত্ত্বেও যে সব আরব খুব বেশী চেষ্টাসাধনা না করে কেবল পড়েই কোরআন মজীদকে বোঝার অর্থাৎ এর সঠিক তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করে সঠিকভাবে ও পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারে নি তাদের বুঝতে না পারার কারণ, কোরআন মজীদ কোনো মামূলী গ্রন্থ নয় যে, যে ভাষায় তা নাযিল্ হয়েছে ঐ ভাষাভাষী যে কোনো ব্যক্তি অথবা ঐ ভাষা জানে এমন যে কোনো ব্যক্তি তা পড়লেই তার পুরো তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

অবশ্য এ কথার মানে এ নয় যে, কোরআন বিশেষজ্ঞ নয় এমন আরব ব্যক্তি কোরআন পড়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। বরং মোটামুটি এর বাহ্যিক তাৎপর্য বুঝতে পারবে; অনারব লোকেরাও নিজ নিজ ভাষায় কোরআন মজীদের অনুবাদ পড়ে মোটামুটি একই পরিমাণ বা বাহ্যিক তাৎপর্য বুঝতে পারে। কিন্তু বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত স্থান- কাল ও পরিবেশ- পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে নাযিলকৃত গ্রন্থ হিসেবে কোরআন মজীদের ভিতরে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তার সাথে ঐ সব ব্যক্তির বুঝা তাৎপর্যের আসমান- যমীন পার্থক্য - তা তাদের মাতৃভাষা আরবীই হোক, বা অন্য কোনো ভাষাই হোক। অবশ্য তারা যা বুঝেছে তা সঠিক এবং নির্ভুলও হতে পারে। কিন্তু কোরআন মজীদ এমন এক ব্যতিক্রমী জ্ঞানসূত্র যে, এর পাঠকের গুণগত ও মানগত স্তরভেদে তার কাছে এর জ্ঞান বিভিন্ন গুণগত মাত্রায় ও ব্যাপকতায় প্রকাশ পায়। [এ প্রসঙ্গে 'কোরআন ও নুযূলে কোরআন' শীর্ষক আলোচনায় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির মানব প্রজাতির ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য সংক্রান্ত যে উপমা দেয়া হয়েছে তা স্মর্তব্য।]

কোরআন মজীদ হচ্ছে, তার নিজের ভাষায়, تبيانا لكل شيء (সকল কিছুর সুবর্ণনা) অর্থাৎ সৃষ্টিলোকের সূচনা থেকে রু করে শেষ পর্যন্ত সব কিছু; যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছুই এবং ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যা কিছুর ঘটা অনিবার্য হয়ে আছে তার সব কিছু এবং যা কিছুর ঘটা ও না- ঘটা

সমান সম্ভাবনাযুক্ত বা শর্তাধীন রয়েছে তা সেভাবেই, আর যা অনিশ্চিত বা অনির্ধারিত উন্মুক্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র তা- ও সেভাবেই এতে নিহিত রয়েছে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঘটা ও না- ঘটার সমান সম্ভাবনাযুক্ত বা শর্তাধীন ক্ষেত্র এবং উন্মুক্ত ভবিষ্যতের ক্ষেত্র সম্পর্কে কোরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب)

- "তিনি যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং (যা ইচ্ছা) বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকটই রয়েছে গ্রন্থজননী।" (সূরাহ্ আর্- রা'দ্ : ৩৯) আর দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সদাই নব নব সৃষ্টি করে চলেছেন। এমনকি মানুষের ভবিষ্যতও এর আওতার বাইরে নয়। কারণ, এরশাদ হয়েছে :

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)

- "(হে মানবমণ্ডলী!) তিনি যদি চান তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে দেবেন এবং (তোমাদের পরিবর্তে) নতুন কোনো সৃষ্টিকে নিয়ে আসবেন। আর আল্লাহ্ এ কাজে পুরোপুরি সক্ষম।" (সূরাহ্ ইবরাহীম্ : ১৯) অর্থাৎ ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত ধরণীর বুকে আল্লাহর খলীফাহ্ হিসেবে মানুষই থাকবে, নাকি আল্লাহ্ তার পরিবর্তে অন্য কোনো নতুন সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করবেন - এ বিষয়টি তিনি অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত রেখে দিয়েছেন।

অন্য কথায় বলা চলে যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়ার উপযোগী সকল জ্ঞানের এক সুকৌশল ও সুনিপুণ সমাহার। তাই কোরআন মজীদের নির্ভুল ও মোটামুটি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় তাৎপর্য গ্রহণের জন্য এক ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যাদের মাতৃভাষা আরবী ও যাদের মাতৃভাষা আরবী নয় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টাসাধনার মধ্যে খুব সামান্যই পার্থক্য ঘটে। অন্যথায় যাদের মাতৃভাষা আরবী তাদের সকলেই কোরআন মজীদের তাৎপর্য ভালোভাবে (অন্ততঃ একটি ন্যূনতম মাত্রায়) অবগত থাকতো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা থেকে স্বতন্ত্র। কোরআন মজীদের ন্যূনতম তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য চেষ্টাসাধনা

করা তো দূরের কথা, আমরা মুসলমানরা (আরব- অনারব নির্বিশেষে) কোরআন মজীদের নিয়মিত তেলাওয়াত্ ক'জন করে থাকি?

যাদের মাতৃভাষা আরবী নয় তাদের পক্ষেও কোরআন মজীদের তেলাওয়াত্ আয়ত্ত করা কোনো কঠিন ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। তা সত্ত্বেও আমরা সকল মুসলমানই কি কোরআন তেলাওয়াত্ আয়ত্ত করেছি? এমনকি যারা কোরআন মজীদের তেলাওয়াত্ আয়ত্ত করেছে তারাও কি সকলেই নিয়মিত তেলাওয়াত্ করে? যদি না করে তাহলে তা কি কোরআন মজীদের প্রতি মহব্বতের পরিচায়ক? তেলাওয়াত্ জানা থাকা সত্ত্বেও যারা নিয়মিত তেলাওয়াত্ করে না এ মহাগ্রন্থ তাদের মাতৃভাষায় নাযিল্ হলেই যে তারা তার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করতো তার কী নিশ্চয়তা আছে?

কেউ যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর কালামের প্রকৃত তাৎপর্য জানতে আগ্রহী থাকে তাহলে তার জন্য আরবী ভাষা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞান আয়ত্ত করাই স্বাভাবিক। বিদেশে চাকরি করার জন্যে অনেকেই তো বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে থাকে; ধু ইউরোপীয় দেশসমূহের ভাষা নয়, চীনা, জাপানী ও কোরিয়ান ভাষা পর্যন্ত লোকেরা শিক্ষা করছে, মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির জন্য আরবী ভাষাও শিক্ষা করছে। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি কোরআনের তাৎপর্য বুঝতে চায় সে কেন আরবী ভাষা শিখবে না? এ জন্য বেশী বয়সে মাদ্রাসায় ভর্তি হবারও প্রয়োজন নেই; একটু চেষ্টা করলে এবং কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকলেই শেখা যায়।

অতএব, এ ধরনের প্রশ্নকারীদের বাহানা পুরোপুরি অযৌক্তিক।

কোরআন বর্জনের বাহানা

কোরআন মজীদ কেন আরবী ভাষায় নাযিল্ হলো? আমাদের মাতৃভাষায় নাযিল্ হলো না কেন? এ প্রশ্ন যারা করে তাদের মধ্যকার আরেক দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বাহানায় কোরআন মজীদকে পরিত্যাগ করা। তাদের দাবী হচ্ছে, যেহেতু সব নবী- রাসূল ('আঃ)ই তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় ওয়াহী লাভ করেছেন এবং একই ভাষাভাষী সমগোত্রীয় লোকদের হেদায়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন, অতএব, নবী করীম (ছ্বাঃ) যেহেতু আরবদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং

কোরআন মজীদ আরবী ভাষায়ই নাযিল্ হয়েছে, সেহেতু তিনি ছিলেন ধু আরবদের নবী এবং কোরআন ধু আরবদের জন্যই নাযিল্ হয়েছে।

এভাবে তারা নিজ ভাষায় নিজ জাতির জন্য নতুন নবী আবির্ভূত হওয়ার দাবী তোলার পক্ষে অথবা তারা তাদের জীবন ও আচরণে যে ধর্মসম্পর্কহীনতার পথ (Secularism) অবলম্বন করেছে তা অব্যাহত রাখার পক্ষে একটা যৌক্তিক ভিত্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করে।

মজার ব্যাপার হলো এই দ্বিতীয় আপত্তিকারী দলের লোকেরা কিন্তু কোরআন মজীদের সাথে পুরোপুরি অপরিচিত নয়; বরং তাদের অনেকে আরবী ভাষার সাথে পরিচিত এবং আরবী কোরআন পড়ে মোটামুটি বুঝতে পারে, অথবা তারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় বা তৃতীয় কোনো ভাষায়, যেমন : বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীতে কোরআন মজীদের অনুবাদ পাঠ করেছে; বরং বেশ মনোযোগ দিয়েই পাঠ করেছে। এ কারণেই তারা তাদের দাবীর সপক্ষে স্বয়ং কোরআন মজীদের আয়াতকেই ব্যবহার করার অপচেষ্টা করেছে।

কোরআন মজীদ যে ধু আরবদের জানা- বুঝা ও হেদায়াতের উদ্দেশ্যেই আরবী ভাষায় নাযিল্ হয়েছে - এটা প্রমাণ করার জন্য তারা এর বেশ কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে যে সব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদকে আরবী ভাষায় নাযিল্ করার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এ সব আয়াতের উদ্দেশ্য তারা যা দাবী করেছে আদৌ তা নয়। তবে এ সব আয়াত নিয়ে আলোচনার পূর্বে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের ও কোরআন মজীদের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতার ওপরে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) ও কোরআনের বিশ্বজনীনতা

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের ও কোরআন মজীদের বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতা সম্পর্কে সংক্ষেপে এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ ও ছুহীফাহ্ সমূহ সংরক্ষণের জন্য কোনো নিশ্চিত ব্যবস্থা নেন নি, কিন্তু কোরআন মজীদকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি যারা রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত স্বীকার করে না তারাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোরআন মজীদ তিনি যেভাবে পেশ করে গেছেন কোনোরূপ বিকৃতি বা পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু সেভাবেই বর্তমান আছে।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতে দ্বীনকে পূর্ণতা দানের কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন আয়াতে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে সমগ্র মানবকুলের জন্য নবী, শেষ নবী ও জগতসমূহের বা সকল জগতবাসীর জন্য রহমত বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব, নবী করীম (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদ যে তাঁর যুগ থেকে রু করে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত স্থান- কাল ও পরিবেশ- পরিস্থিতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য নবী ও হেদায়াত তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর শেষ নবী হওয়া ও তাঁর নবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে হলেও কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। কারণ, ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা তাঁকে নবী হিসেবে মানে না এবং কাদিয়ানীরা তাঁকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না। রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত ও তাঁর নবুওয়াতের বিশ্বজনীনতার প্রমাণ এই যে, বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে পথনির্দেশ পাওয়া অপরিহার্য। এমতাবস্থায় পূর্বে আগত পথনির্দেশ হারিয়ে গেলে বা বিকৃত হয়ে গেলে পুনরায় পথনির্দেশ আসাও অপরিহার্য। স্বয়ং ইয়াহূদী- খৃস্টান পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে, তাওরাত্ ও ইনজীল্ সহ বাইবেলের পুস্তকগুলোতে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে। বিশেষ করে

বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) অনেকের চরিত্রের ওপর এমন কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে যা বিশ্বাস করলে তাঁদেরকে নবী- রাসূল (‘আঃ) বলে গ্রহণ করা যায় না। ধু তা- ই নয়, ঐ সব পুস্তক যে সব নবী- রাসূলের (‘আঃ) নামে উল্লিখিত হয়েছে সে সব পুস্তক যে তাঁরা রেখে গেছেন তা অকাট্যভাবে ও ঐতিহাসিক ধারাক্রমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এ সব পুস্তকের সবগুলোই তাঁদের পরে লিখিত বা পুনর্লিখিত হয়েছে। ধু তা- ই নয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যে ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন এবং নবী ছিলেন তা- ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য মুসলমানরা তাঁদেরকে নবী- রাসূলরূপে স্বীকার করে ও দ্ধা করে, তবে তা ঐতিহাসিকভাবে তাঁদের অস্তিত্ব ও নবুওয়াত প্রমাণিত হবার কারণে নয়, বরং কোরআন মজীদে উল্লিখিত থাকার কারণে।

এহেন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ শত শত বছরেও কি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য কোনো নবীর আগমন অপরিহার্য ছিলো না?

বিগত প্রায় দুই হাজার বছরের মধ্যে [হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ঊর্ধলোকে আরোহণের পর/ খৃস্ট মতে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পর] নবুওয়াতের দাবীদারদের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছাড়া বিচারবুদ্ধির আলোকে আর কারো মধ্যেই নবুওয়াতের বশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় যদি তাঁকে নবী হিসেবে এবং কোরআন মজীদকে আল্লাহর কিতাব্ হিসেবে স্বীকার করা না হয় তাহলে বলতে হবে আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের জন্য পথনির্দেশের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে পথনির্দেশ বিহীন ফেলে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর মহান সত্তা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা অন্যায়।

তাছাড়া বিকৃতি সত্ত্বেও তাওরাত, ইনজীল্ ও আরো অনেক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আরবের বুকে শেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এখনো বিদ্যমান আছে। বিগত প্রায় দুই হাজার বছরের মধ্যে নবুওয়াতের দাবীদার এমন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে নি যার সম্পর্কে এ সব ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য হতে পারে এবং ইয়াহূদী- খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মনেতাগণ কাউকে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে কথিত পারাক্লিতাস বা মেসিয়াহ্ বলে চিহ্নিত করেন

নি। এমতাবস্থায় ঐশী গ্রন্থের দাবীদার একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ কোরআন মজীদ ও তাঁর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান একান্তই অন্ধত্ব ও অযৌক্তিকতার পরিচায়ক। আর কোরআন মজীদ সমগ্র মানব প্রজাতির জন্য নিজেকে পথনির্দেশ এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে বিশ্বজনীন নবী ও শেষ নবী বলে দাবী করেছে - যা প্রত্যাখ্যানের কোনো যুক্তিই তাদের কাছে নেই।

অন্যদিকে কাদিয়ানীরা রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে সর্বে ষ্ঠ নবী হিসেবে স্বীকার করলেও শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না। তাদের এ দাবী মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত- গ্রন্থ নাযিল্ হওয়ার এবং তা সংরক্ষিত থাকার পর নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

কোরআন মজীদে যে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে "খাতামুন্নাবীয়্যীন্" (নবীগণের মোহর) বলে উল্লেখ করা হয়েছে কাদিয়ানীরা এর বিকৃত ব্যাখ্যা করে এই যে, তাঁর মোহর ধারণ করে নতুন নবীর আগমনের ধারা বহাল আছে। তারা 'তাঁর মোহর ধারণ'- এর ব্যাখ্যা করে এই যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাঁকে সর্বে ষ্ঠ নবী হিসেবে স্বীকার করেছে। অথচ এর মানে দাঁড়ায় এই যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকার করলো, তিনি গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে স্বীকার করেন নি। কোরআন মজীদে যদি গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী থাকতো কেবল তাহলেই বলা যেতো যে, সে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর মোহরধারী নতুন নবী।

মোদ্দা কথা, ইয়াহূদী, খৃস্টান ও কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর শেষ নবী হওয়ার সত্যতা অস্বীকার বিশেষ কোনো স্বার্থে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সত্যকে প্রত্যাখ্যান ব নয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক জবাবের পর্যালোচনা

কোরআন মজীদ কেন আরবী ভাষায় নাযিল্ হলো? এ প্রশ্নের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিতে গিয়ে অনেকে বলেছেন : যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) আরবদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন

এবং তাঁর মাতৃভাষা ছিলো আরবী সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল্ করেছেন। তিনি যদি অন্য ভাষাভাষী কোনো জাতির মধ্যে (উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজীভাষীদের মধ্যে) আবির্ভূত হতেন তাহলে কোরআন মজীদ সে ভাষাতেই নাযিল্ হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা কেন হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে আরবদের মধ্যে পাঠালেন? এ প্রশ্নেরও বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেয়া হয়। তা হচ্ছে, আরবদের তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ শেষ নবীর আবির্ভাবের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলো।

আসলেই কি তা-ই? প্রকৃত ব্যাপার কি এরূপ যে, যেহেতু ঐ যুগে আরবদের সমাজ-পরিবেশ সমকালীন বিশ্বে জঘন্যতম ছিলো সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে তাঁর ে ষ্ঠতম ও সর্বশেষ রাসূলকে (ছ্বাঃ) পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন? আর তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ-পরিবেশ যদি এর চেয়েও খারাপ হতো তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বাংলাদেশে পাঠাতেন? অথবা যদি বিশ্বের কোথাওই কখনোই ঐ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হতো তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে পাঠাতেন না এবং কোরআন মজীদ নাযিল্ করতেন না? নাকি তাঁকে পাঠাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তৎকালীন আরবের পরিবেশকে ঐ পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন? কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাহর কাজে কেবল ইতিবাচক হস্তক্ষেপই করে থাকেন এবং মানুষকে পাপাচারের ও অমানবিকতা তথা জাহেলিয়াতের দিকে ঠেলে দেয়ার মতো জঘন্য কাজের দুর্বলতা থেকে তিনি পরম প্রমুক্ত।

নবীর আবির্ভাব পূর্বনির্ধারিত

তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো নবীকে পাঠানোর স্থান নির্বাচনের বিষয়টি যদি এ নীতির ওপরই ভিত্তিশীল হতো যে, যখন যেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশী পাপপঙ্কিল ও যুলুম-অত্যাচারপূর্ণ তিনি সেখানে তাঁর নবী পাঠাবেন তাহলে ইতিপূর্বে একই জায়গায় (যেমন : ফিলিস্তিনে) একই সময় বা পর পর একাধিক নবী পাঠানো এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে পূর্ববর্তী নবীর পর দীর্ঘদিনের ব্যবধান সত্ত্বেও নবী না পাঠানোর কারণ কী ছিলো?

তাছাড়া পূর্ববর্তী কালে নবী-রাসূলগণ ('আঃ), আল্লাহর ওয়ালীগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণ যে আরবের বুকে সর্বশেষ ও সর্বে ষ্ঠ নবী (ছ্বাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা কীভাবে সম্ভব হয়েছিলো?

এ সব ভবিষ্যদ্বাণীর মানে তো এটাই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর আরবে ও আরবদের মধ্যে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত ছিলো। আর যখন তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত ছিলো তখন তথাকথিত পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী তাঁর অন্যত্র আবির্ভূত হওয়ার কথা ধারণা করা আদৌ সম্ভব কি? এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ 'যদি' বলার অবকাশ থাকে কি? এ ক্ষেত্রে বলা চলে কি 'তিনি যদি বাংলাভাষীদের মধ্যে আবির্ভূত বা প্রেরিত হতেন তাহলে কোরআন মজীদ বাংলা ভাষায় নাযিল্ হতো'?

[মজার ব্যাপার হলো, যারা বাংলা ভাষার কথা বলেন তাঁরা ভুলে যান যে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর আবির্ভাব ও কোরআন মজীদ নাযিল কালে বাংলা ভাষার আদৌ জন্ম হয় নি। কারণ, প্রধানতঃ ঐ সময় থেকে বহিরাগত ফার্সীভাষী ও ফার্সী-জানা ব্যবসায়ী ও ইসলাম-প্রচারকদের আগমন ও এতদ্দেশের জনগণের সাথে ভাববিনিময়ের ফলে সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী কালের প্রক্রিয়ায় আরবী ও ফার্সী ভাষার এবং স্থানীয় জনগণের নাম ও সাহিত্য বিহীন কথ্য আঞ্চলিক ভাষাসমূহের শব্দাবলীর সংমি ণে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করে। এ বিষয়ে মৎপ্রণীত বাংলা ভাষার মাতৃপরিচয় গ্রন্থে (অপ্রকাশিত) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।]

অতএব, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখানে কোনো 'যদি'র অবকাশ নেই। বরং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যে আরবদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মাতৃভাষা আরবী হবে, আর কোরআন মজীদ আরবী ভাষায় নাযিল্ হবে তা অকাট্যভাবে পূর্বনির্ধারিত ছিলো; এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব ছিলো না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি (খলীফাহ্) বানিয়েছেন। এ কারণে তিনি তাদেরকে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ভালো-মন্দ ও উন্নতি-অধোগতির প্রায় সীমাহীন সম্ভাবনা নিহিত রেখেছেন। অন্যথায় সে সীমাহীন জ্ঞান ও ক্ষমতার

অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত বলে গণ্য হতো না। অর্থাৎ মানুষকে কোনো ছকবাঁধা পথে চলতে বাধ্য করা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা নয়, বরং তিনি তাকে বহু বিকল্প বিশিষ্ট এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

এটা হচ্ছে সাধারণভাবে ও সামগ্রিকভাবে গোটা মানব প্রজাতি সংক্রান্ত অবস্থা। কিন্তু এ সৃষ্টিলোককে, বিশেষ করে মানুষকে সৃষ্টি করার পিছনে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ সৃষ্টিলক্ষ্য রয়েছে। কারণ, সকল প্রকার প্রয়োজন ও দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত মহান আল্লাহ্ তা'আলা উদ্দেশ্যহীন কিছু করবেন এটা তাঁর সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। বরং তাঁর এ সৃষ্টিকর্মের পিছনে অবশ্যই কোনো ইতিবাচক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তিনি তাঁর এ সৃষ্টিলক্ষ্য বাস্তবায়নের বিষয়টিকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা- অনিচ্ছা ও খেয়ালখুশীর ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর এ সৃষ্টিলক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু অপরিহার্য তা তিনি সৃষ্টিকর্মের সূচনার আগেই তথা সৃষ্টিকর্মের পরিকল্পনার মধ্যেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এভাবে যা ক্বাযায়ে ইলাহীতে (খোদায়ী সিদ্ধান্তে/ পূর্বনির্ধারণে) নির্ধারিত রয়েছে তথা সৃষ্টিপরিকল্পনায় যা অনিবার্যরূপে নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে কোনো অবস্থাতেই তার অন্যথা হতে পারে না।

অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী নবী পাঠাবেন বলে তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনায় নির্ধারণ করে রাখেন। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, কোথায় কখন কোন্ নবীকে পাঠাবেন এবং তাঁদের পূর্বাপর ধারাক্রম ইত্যাদি কী হবে তা তিনি পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। তাই তাঁদের অনেকের সম্পর্কে, বিশেষ করে রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণ ('আঃ) সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। অতএব, নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর আরবী ভাষাভাষী হওয়া এবং কোরআন মজীদের আরবী ভাষায় নাযিল্ হওয়া যে পূর্বনির্ধারিত ছিলো তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই সাথে এ- ও সন্দেহাতীত বিষয় যে, কোরআন নাযিলের জন্য উপযোগী ভাষার বিকাশ সাধন তথা আরবী ভাষার উৎপত্তি ও চূড়ান্ত বিকাশও আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

আরবী ভাষার বিকাশে খোদায়ী হস্তক্ষেপ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের জন্য আরবী ভাষাকে বেছে নিলেন কেন? অন্য কোনো ভাষাকে কেন বেছে নিলেন না?

এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমে পাল্টা প্রশ্ন করতে হয়, আসলে কোরআন মজীদের মতো মহাগ্রন্থ - যাতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়ার উপযোগী সকল জ্ঞানের সমাহার ঘটানো হয়েছে তা আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় নাযিল্ হওয়া আদৌ সম্ভব কি?

বলা হতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। নিঃসন্দেহে। তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার বিকাশপ্রক্রিয়াকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হতো যার ফলে তা আরবী ভাষায় পরিণত হতো। কারণ, কোরআন মজীদের ন্যায় সংক্ষিপ্ত আয়তনের গ্রন্থে সীমাহীন জ্ঞানের সমাহার ঘটাবার ও তাকে ক্বিয়ামত্ পর্যন্তকার স্থান- কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য মু'জিযায় পরিণত করার জন্যে এহেন 'প্রায় সীমাহীন' সম্ভাবনার অধিকারী ভাষার উদ্ভব ঘটানো ছিলো অপরিহার্য।

যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার এ গ্রন্থ নাযিলের জন্য এহেন সম্ভাবনাময় একটি ভাষার উদ্ভব অপরিহার্য ছিলো সেহেতু তিনি একটি ভাষার সূচনা ও বিকাশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যাতে সে ভাষায় কোরআন মজীদ নাযিল্ করা সম্ভবপর হয়। যেহেতু সৃষ্টিলক্ষ্য বাস্তবায়ন বা সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন না এবং তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের 'একটি' ভাষার বিকাশ ঘটানো অপরিহার্য ছিলো সেহেতু তিনি একটিমাত্র ভাষার বিকাশকে এ লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করেন। একাধিক ভাষাকে এ পর্যায়ে বিকশিত করানো অপরিহার্য ছিলো না বিধায় তিনি তা করেন নি। তাই অন্যান্য ভাষার সম্ভাবনার বিকাশ মানবিক প্রতিভা- প্রচেষ্টার ফলে যতোখানি সম্ভবপর ততোখানি সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে অথবা হবে। তাছাড়া মানুষের সকল ভাষাকে অভিন্ন মাত্রায় বিকশিত করলে শেষ পর্যন্ত

তা একটিমাত্র ভাষায় পরিণত হতো এবং সে ক্ষেত্রে ভাষাবৈচিত্র্যের মধ্যে যে মহান লক্ষ্য নিহিত রয়েছে তা হাছিল্ হতো না।

বিস্ময়কর সম্ভাবনাময় ভাষা আরবী

বস্তুতঃ মানুষের ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার সম্ভাবনা বিস্ময়কর, বরং পারিভাষিক অর্থে (যদিও আক্ষরিক অর্থে নয়) 'সীমাহীন' বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রকাশক্ষমতার সম্ভাবনার তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য ভাষার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রকাশক্ষমতার অধিকারী ভাষাকেও আরবীর সাথে তুলনা করলে এক বনাম একশ'র অনুপাতও খুবই কম বলে মনে হবে। হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই আরবরা আরবী ভাষার এ প্রকাশসম্ভাবনা ও তার মোকাবিলায় অন্যান্য ভাষার দন্য সম্পর্কে অবগত ছিলো। এ কারণে তারা অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদেরকে বলতো الاعجم (আল্- আ'জাম্)- বোবা বা অস্পষ্টভাষী।

ধু তা- ই নয়, মূলতঃ আরবী ভাষা (اللغة العربية) বলতে তারা "আরব উপদ্বীপের জনগণের ভাষা" বুঝাতো না, বরং "উচ্চাঙ্গের ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক গতিশীল প্রাঞ্জল ভাষা" বুঝাতো। আর এর বিপরীতে নিম্ন মানের ভাষার অধিকারী, অস্পষ্টভাষী বা দুর্বোধ্যভাষী বুঝাতে "আ'জাম্" বলতো।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আমরা যাকে 'আরবী বলি তা এ ভাষার গুণ বা (ভাষা) পরিচিতি বাচক নাম, প্রকৃত নাম (Proper Name) নয়। বরং অনারব লোকেরাই এ নামটিকে প্রকৃত নাম (Proper Name) - এ পরিণত করেছে। কারণ, আরবী ভাষায় "আল্ - 'আরাবী" (العربى) বিশেষ্য নয়, বিশেষণ। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে :

[আরবী ভাষায় বাক্যের বাইরে কেবল একটি শব্দ হিসেবে বিশেষ্য- বিশেষণের শেষ বর্ণে কোনো স্বরচিহ্ন থাকে না, যদি না তা উহ্য ক্রিয়াপদ বিশিষ্ট বাক্য বলে পরিগণিত হয়। কেবল

বাক্যমধ্যে শব্দটির ভূমিকার ভিত্তিতেই স্বরচিহ্ন নির্ধারিত হয়। এছাড়া আরবী ভাষায় বাক্যশেষের স্বরচিহ্ন উচ্চারিত হয় না। কিন্তু বাংলাভাষীদের অনেকেই বাক্যবহির্ভূত আরবী বিশেষ্য-বিশেষণের এবং বাক্যশেষের স্বরচিহ্ন উচ্চারণ করে থাকে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে শেষের স্বরচিহ্ন ছাড়া বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের মৌখিক উচ্চারণে শব্দটির প্রকৃত লিখিত রূপ বুঝতে সমস্যা হতে পারে। তাই নীচের উদাহরণগুলোতে কেবল এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত উচ্চারণ নির্দেশের ক্ষেত্রে আরবী নিয়ম অনুসরণে বাক্যবহির্ভূত বিশেষ্য- বিশেষণের এবং বাক্যশেষের স্বরচিহ্ন উচ্চারণ নির্দেশ করা হয় নি।]

العَرَب (আল্- 'আরাব্)- আরব, আরব উপদ্বীপের বাশিন্দা।

العَرَبِيّ (আল্- 'আরাবী)- খাঁটি আরব (পুং)।

العَرَبِيَّة (আল্- 'আরাবীয়্যাহ্)- খাঁটি আরব (স্ত্রী)।

اللُّغَةُ العَرَبِيَّة (আল্- লুগ্বাতুল্ 'আরাবীয়্যাহ্) - খাঁটি আরব (অর্থাৎ খাঁটি আরবদের) ভাষা।

তারা কেন নিজেদেরকে আরব বলে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "খাঁটি আরবদের ভাষা" কেন বলা হলো? এটা জানতে হলে আরবরা নিজেদেরকে কেন "আল্- 'আরাব্" বা "আল্- 'আরাবী" বলে তা জানতে হবে এবং তা জানতে হলে অভিন عرب শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলীর ব্যবহারিক তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এখানে অভিধান থেকে এ শব্দমূল (عرب) হতে নিষ্পন্ন শব্দাবলীর মধ্য থেকে কয়েকটির ব্যবহারিক উদাহরণ দেয়া যাক :

عَرَبَ ('আরাবা)- সে প্রাঞ্জল ভাষায় (অর্থাৎ আরবী ভাষায়) কথা বললো; সে খাঁটি ও প্রাঞ্জল ভাষী (অর্থাৎ আরবী ভাষী) ছিলো।

عَرِبَ الرَّجُلُ (‘আরিবার্ রাজুল্) - লোকটির যবান খুলে গেলো (সে কথা বলতে পারছিলো না; এখন কথা বলতে পারছে); লোকটির তোৎলামি দূর হয়ে গেলো; লোকটির বোবা অবস্থা দূর হয়ে গেলো।

عَرَّبَ المَنطِقَ (‘আররাবাল্ মানত্বিক্ব) - সে তার কথাকে প্রাঞ্জল করলো।

عَرَّبَ عَنهُ لِسانُهُ (‘আররাবা ‘আনহু লিসানুহ্) - ঐ ব্যাপারে তার ভাষা সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হলো (সে প্রাঞ্জলভাষী না হলেও ঐ বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হলো)।

عَرَّبَ عَن صَاحِبِهِ (‘আররাবা ‘আন্ ছ্বাহিবিহ্) - সে তার বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করে কথা বললো; সে তার বন্ধুর পরিবর্তে তার পক্ষ থেকে কথা বললো ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করলো।

عَرَّبَ بِحُجَّتِهِ (‘আররাবা বিহুজ্জাতিহ্) - সে তার যুক্তিপ্রমাণকে খুব ভালোভাবে বর্ণনা করলো।

عَرَّبَ الإِسمَ الأَعجَمِيَّ (‘আররাবাল্ ইসমাল্ আ‘জামিয়্যা) - সে অনারব নামটিকে মু‘আরাব্ করলো (অর্থাৎ উচ্চারণ সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি বর্ণে প্রয়োজনীয় যের- যবর- পেশ বসালো - যা আরবরা একান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া আরবী লেখায় বা আরবী শব্দের ক্ষেত্রে করে না)।

أَعرَبَ الشَّيءَ (আ‘রাবাশ্ শাইআ) - সে বিষয়টি বর্ণনা করলো; সে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলো।

أَعرَبَ كَلامَهُ (আ‘রাবা কালামাহ্) - সে তার বক্তব্যকে খুব ভালোভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করলো।

أَعرَبَ الرَّجُلُ (আ‘রাবার রাজুল্) - লোকটি প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বললো।

العَرَبُ مِنَ الماءِ (আল্- ‘আরাবু মিনাল্ মাই) অথবা العَرِبَ مِنَ الماءِ (আল্- ‘আরিবা মিনাল্ মাই) - অনেক বেশী পরিমাণে ও সুপেয় পানি।

رَجُلٌ عَرِبٌ (রাজুলুন্ 'আরিব্)- (যে কোনো) প্রাঞ্জলভাষী লোক।

بِئْرٌ عَرِبَةٌ (বি'রুন্ 'আরিবাহ্)- পানিতে পরিপূর্ণ প।

العَرَبَانُ (আল্- 'আরবান্)- বাক্যবাগীশ ও প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তি।

উপরোক্ত উদাহরণসমূহের কোনোটি থেকেই عرب শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন শব্দে আরব উপদ্বীপের অধিবাসী অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ নেই। এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, অনারবরা 'আরবী' ভাষা বলতে যা মনে করে খোদ আরবী ভাষায় এ শব্দটি সে তাৎপর্য বহন করে না। বরং তারা আরবী ভাষা বলতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সম্পন্ন উচ্চাঙ্গের প্রাঞ্জল ভাষা বুঝাতো - যা ছিলো তাদের নিজেদেরই ভাষা। দুর্বল ও নিম্ন মানের ভাষা সমূহের মোকাবিলায় তারা তাদের ভাষার জন্য এ বিশেষণ ব্যবহার করতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষা হচ্ছে সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীরই অন্যতম ভাষা। আরবী, কেন্'আনী, হিবরূ, ফিনীক্বী, আরামী ও ইথিওপীয় ভাষা এ সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীরই বিভিন্ন শাখা। প্রথমে এ সব ভাষার মধ্যে ব্যবধান ছিলো খুব কম। এ সব ভাষার অবস্থা ছিলো অনেকটা একই ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও উপভাষার সাথে তুলনীয়। কিন্তু এগুলোর মধ্য থেকে একটি আঞ্চলিক ভাষা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চরমোৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যায় যা ধু উন্নততম সাহিত্যই সৃষ্টি করে নি, বরং তার কথোপকথনের ভাষাও তার সাহিত্যের ভাষার সমমানসম্পন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এটি হচ্ছে তৎকালীন পূর্ব আরবের ভাষা। ফলে সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর পিছিয়েপড়া শাখাগুলোর মোকাবিলায় এ শাখাটির জন্য বিশেষণটি ব্যবহৃত হতে (প্রাঞ্জল ভাষা) اللغة العربية থাকে এবং কালে এ গুণবাচক নামটি, মূলতঃ অনারবদের দ্বারা, প্রকৃত নামে (Proper Noun) পরিণত হয়ে যায়।

এই একই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এর বিপরীত তাৎপর্য বাচক "আল্- আ'জাম" (الأعجم) শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্য থেকেও। "আ'জাম" মানে হচ্ছে 'বোবা' বা 'তোৎলা' বা

‘দুর্বোধ্যভাষী’ বা ‘অস্পষ্টভাষী’। তাই যখন কোনো আরবীভাষী লোকও অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য ভাষায় বই বা চিঠি লেখে - যাতে যা বুঝাতে চায় তা ঠিক মতো বুঝাতে ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না তখন বলা হয় :

أعجَمَ الكِتابَ (আ‘জামাল্ কিতাব্) অথবা عَجَّمَ الكِتابَ (‘আজ্জামাল্ কিতাব্) - সে তার বই বা পত্রকে দুর্বোধ্য করে ফেলেছে।

তেমনি الأعجم (আল্- আ‘জাম্) বলতে যেমন অ- আরবীভাষী বুঝায়, তেমনি মাতৃভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি উচ্চাঙ্গ প্রাঞ্জলভাষিতার অধিকারী নয় তাকেও বুঝানো হয়। একই অর্থে শব্দটির স্ত্রীবাচক العَجماء (আল্- ‘আজমা’) ব্যবহৃত হয়। তেমনি চতুষ্পদ ও প্রাণী অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়, বাংলা ভাষায় যেভাবে ‘বোবা প্রাণী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঠিক সে অর্থে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, এ সব প্রাণীর নিজস্ব ভাবপ্রকাশক ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা মানুষের মতো সুস্পষ্টভাবে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য সহকারে সুন্দর ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তেমনি তোৎলা বুঝাতেও উপরোক্ত শব্দ দু’টি (যথাক্রমে পুরুষ ও নারীর জন্য) ব্যবহৃত হয়, তা হোক না কেন তারা আরব পরিবারের সন্তান।

তেমনি লোকেরা তাদের কথায় স্বীয় উদ্দেশ্য চেপে গেলে বা গোপন করলে বলা হয় تَعاجَمَ القَومُ (তা‘আজামাল্ ক্বাওম্) - লোকগুলো বোবা হওয়ার ভান করলো অর্থাৎ আসল কথা গোপন করলো।

অনুরূপভাবে تَعاجَمَ الرَّجُلُ (তা‘আজামার্ রাজুল) - লোকটি তোৎলা হবার ভান করলো।

اِنعَجَمَ عَلَيهِ القَولُ (ইন্‘আজামা ‘আলাইহিল্ ক্বাওল্) - তার নিকট কথাটি দুর্বোধ্য প্রতিভাত হলো; কথাটি তার বোধগম্য হলো না।

اِستَعجَمَ (ইস্তা‘জামা) - সে কথা বলতে পারলো না; তার কথা আটকে গেলো।

এ ব্যাপারে আরো অনেক উদাহরণ দেয়া চলে।

ধু সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা নয়, বরং যেহেতু অনারব ভাষাসমূহের মধ্য থেকে কোনো ভাষাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ ও উচ্চাঙ্গ প্রাঞ্জলভাষিতার বিচারে আরবী ভাষার ধারেকাছেও পৌঁছতে সক্ষম নয়, সেহেতু আরবরা অনারবদেরকে ও তাদের ভাষা সমূহকে ঢালাওভাবে “আ‘জামী” বলে অভিহিত করতো।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ যে আরবী ভাষায় নাযিল্ হয়েছে কোরআনে বার বার সে কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই বুঝানো যে, এ কিতাব্ অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক উচ্চাঙ্গ প্রাঞ্জল ভাষায় নাযিল্ হয়েছে এর মতো একজন লেখাপড়া -(ছ্বাঃ) যা হযরত মুহাম্মাদ - নাজানা মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়, বরং এর রচনাশৈলী এতোই উচ্চাঙ্গের যে, সেদিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, তা কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, এ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশসম্ভাবনা এমনই প্রায় সীমাহীন যে (আরবী ভাষায়), একজন মানুষ যতো বড় প্রতিভার অধিকারীই হোক না কেন এবং যতো উঁচু মাত্রার প্রাঞ্জলভাষীই হোক না কেন, তার প্রতিটি বক্তব্যের প্রতিটি দিকেই প্রকাশসম্ভাবনার উচ্চতম বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং অন্য কারো পক্ষে তা সংশোধন (editing) করে অধিকতর উন্নত করা বিন্দুমাত্রও সম্ভব হবে না নিজের - লেখা বা কথা সম্বন্ধে এ নিশ্চয়তা দেয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এটা কেবল সকল ভাষার মূল উৎস স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষেই সম্ভব। এ কারণেই কোরআন মজীদ এ ব্যাপারেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এবং কোরআনবিরোধী সকলেই এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পরাস্ত - হয়েছে।

কোরআন আরবী হওয়ার মানে কী?

এবার আমরা দেখবো যে, কোরআন মজীদ যেখানে নিজেকে هدى للناس (হুদাল্ লিন্নাস্ - মানবমণ্ডলীর জন্য পথনির্দেশ) বলে পরিচিত করেছে এমতাবস্থায় বিভিন্ন আয়াতে কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল্ হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কী? কেন এ কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে?

আল্লাহ্ রাব্বুল্ ‘আলামীন এরশাদ করেন :

(الر. تلک آيات الكتاب المبين. انا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

“আলিফ- লাম- রা। এ হচ্ছে সুবর্ণনাকারী গ্রন্থের আয়াতনিচয়। নিঃসন্দেহে আমি একে আরবী (প্রাঞ্জলভাষী) কোরআন রূপে নাযিল্ করেছি; আশা করা যায় যে, তোমরা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে।” (সূরাহ্ ইউসূফ : ১- ২)

[এখানে আমরা عقل শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন تعقلون ক্রিয়াপদ বিশিষ্ট لعلكم تعقلون বাক্যাংশের অর্থ করেছি “আশা করা যায় যে, তোমরা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে”। এটি এর কাছাকাছি অনুবাদ। কোরআন মজীদে এ বাক্যাংশটি এবং অভিন্ন শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন আরো কয়েকটি শব্দ বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ এ কথাটির অনুবাদ করা হয় “হয়তোআশা করা যায় যে /, তোমরা অনুধাবন করবে করতে /পারবে”। কিন্তু তা এর সঠিক অনুবাদ নয়। কারণ, তা বুঝানো উদ্দেশ্য হলে لعلكم تفهمون বলা হতো। তাছাড়া কোরআন মজীদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় নাযিল হয়েছে; দুর্বোধ্য ভাষায় নয়। তাই শোনামাত্র তার বাহ্যিক তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আরবদের কোনোই সমস্যা ছিলো না। এমতাবস্থায় تعقلون বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আশা করা যায় যে, এহেন ব্যতিক্রমী বিস্ময়করভাবে অত্যুচ্চ মানের প্রাঞ্জল বক্তব্য দেখে তোমরা বিচারবুদ্ধি (عقل -

Reason) প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে যে, হযরত মুহাম্মাদ এর ন্যায় -(ছ্বাঃ) লেখাপড়া নাজানা ব্যক্তির পক্ষ থেকে কী করেএ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করা সম্ভব হলো।[

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যরূরী মনে করছি যে, অত্র আয়াতের অনুবাদে (এবং পরবর্তীতেও কোনো কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে) আমরা مبين শব্দের অর্থ করেছি 'সুবর্ণনাকারী'। কোরআন মজীদে এ শব্দটি ১০৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে স্বয়ং কোরআন মজীদের বিশেষণ রূপে বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শব্দটি 'শত্রু', 'জাদু' 'গোমরাহী' ইত্যাদির জন্যও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ এ শব্দটির অনুবাদ করা হয় 'সুস্পষ্ট'। 'সুস্পষ্ট' এর একটি অর্থ বটে, তবে একমাত্র অর্থ নয় এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নয়। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'সুবর্ণনাকারী'। কারণ, শব্দটির আদি ক্রিয়াবিশেষ্য (مصدر) হচ্ছে بين এবং তা থেকে নিষ্পন্ন بيان- এর মানে হচ্ছে 'সুন্দরভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ' এবং যখন বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এর মানে হচ্ছে 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য বিশিষ্ট সুন্দর কথা'। যেমন, এরশাদ হয়েছে : خلق الانسان و علّمه البيان - "তিনি (আল্লাহ্) মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (অতঃপর) তাকে সুন্দরভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরাহ্ আর্- রাহমান্ : ৩- ৪) এ কারণেই আরবী ভাষায় সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রকে 'ইলমে বায়ান্ বলা হয়। এমতাবস্থায় অভিন্ন মূল থেকে নিষ্পন্ন مبين শব্দটি যে সব আয়াতে কোরআন মজীদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে অবশ্যই তা 'বায়ানকারী' তথা 'সুন্দরভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশকারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে - যাকে আমরা সংক্ষেপে 'সুবর্ণনাকারী' বলেছি।

এমতাবস্থায় কোরআন মজীদে যে সব ক্ষেত্রে শয়তানকে মানুষের জন্য عدو مبين বলা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তার অধিকতর যুৎসই অর্থ হবে 'সুবর্ণনাকারী দুশমন', কারণ, শয়তান তার অনুসারীদের মাধ্যমে মনোমুগ্ধকর বাকজাল বিস্তার করে মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। তেমনি কাফেররা যে কোরআন মজীদকে سحر مبين বলতো তার উদ্দেশ্য ছিলো

‘সুবর্ণনাকারী জাদু’, কারণ, কোরআন মজীদের ভাষাগত সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে বহু লোকই বুঝতে পারতো যে, কোনো মানুষের পক্ষে এ সব আয়াত ও সূরাহ্ রচনা করা সম্ভব নয়, এ কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করতো।

(حم. والكتاب المبين. انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

“হা- মীম। (এই) সুবর্ণনাকারী গ্রন্থের শপথ। অবশ্যই আমি একে আরবী (প্রাঞ্জলভাষী) পঠনীয় (কোরআন) বানিয়েছি; আশা করা যায় যে, তোমরা বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে।” (সূরাহ্ আয্- যুখরূফ : ১- ৩)

(و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون)

“আর আমি মানুষের জন্য এ কোরআনে প্রতিটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি; আশা করা যায় যে, তারা (এ সব বিষয়ের প্রতি) মনোযোগী হবে (বা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে)। (এ হচ্ছে) আরবী (প্রাঞ্জলভাষী) পঠনীয় (কোরআন) যাতে কোনো বক্রতা নেই, অতএব, আশা করা যায় যে, তারা তাক্বওয়া (নিজেদেরকে বাঁচাবার নীতি) অবলম্বন করবে।” (সূরাহ্ আয্- যুমার : ২৭- ২৮)

(و كذالک اوحينا اليک قرآناً عربياً لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه)

“আর এভাবেই (হে রাসূল!) আমি আপনার প্রতি আরবী (প্রাঞ্জলভাষী) কোরআনকে ওয়াহী করেছি যাতে আপনি উম্মুল ক্বুরাকে (মক্কাহ্ নগরীকে/ এর অধিবাসীদেরকে) ও তার চারদিকে (সারা বিশ্বে) যারা রয়েছে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সেই সমাবেশ দিবস সম্পর্কে যে দিনের আগমনের ক্ষেত্রে কোনোই সন্দেহ নেই।” (সূরাহ্ আশ্- শূরা : ৭)

সূরাহ্ আল্- আহক্বাফ- এর রুর দিকে এরশাদ হয়েছে :

(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)

“এ হচ্ছে মহাপ্রতাপময় পরম জ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতরণ।” (আয়াত নং ২)

একই সূরায় এর পরবর্তী এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(و اذا تتلى آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين)

“আর তাদের নিকট যখন আমার দ্ব্যর্থহীন সুবর্ণনাকারী আয়াত সমূহ পড়ে নানো হবে তখন তাদের নিকট সত্য এসে যাওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের হয়ে যাওয়া) লোকেরা এ সত্য সম্পর্কে বলবে : এ তো এক সুবর্ণনাকারী জাদু।” (আয়াত নং ৭)

এর পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(ام يقولون افتراه. قل ان افتريته فلا تملكون لى من الله شيئاً)

“তারা কি বলে যে, তিনি (রাসূল) এটি রচনা করেছেন? (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দিন : আমি যদি এটি নিজ থেকে রচনা করতাম তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহ্ থেকে (তাঁর আক্রোশ থেকে) মোটেই বাঁচাতে পারবে না।” (আয়াত নং ৮)

এ ধারাবাহিকতায় এরপর এরশাদ হচ্ছে :

(و من قبله كتاب موسى اِماماً و رحمة. و هذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا و بُشرى للمحسنين)

“আর এর আগে এসেছিলো মূসার কিতাব্ - অনুসরণীয় ও রহমত স্বরূপ। আর এ হচ্ছে (তার) সত্যায়নকারী কিতাব্ যাকে আরবী (প্রাঞ্জল) ভাষার কিতাব্ রূপে অবতরণ করা হয়েছে যাতে তা যালেমদেরকে সতর্ক করে এবং তা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ।” (আয়াত নং ১২)

এ সব আয়াতের কোথাও বলা হয় নি যে, আরবদের বুঝতে পারার সুবিধার্থে এ কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল্ হয়েছে। বরং এ সব আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, এ গ্রন্থকে অনন্যসুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক সুবর্ণনাকারী গ্রন্থ রূপে নাযিল্ করে এটাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের গ্রন্থ কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়, অতএব, তা আল্লাহর কিতাব।

আরো অনেক আয়াত থেকে এ তাৎপর্যই পাওয়া যায়। যেমন :

(قل انما امرت ان اعبد الله و لا اشرک به. اليه ادعوا و اليه مأب. و كذالک انزلناه حكماً عربياً. و لئن اتبعت اهواهم بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولى و لا واق)

“(হে রাসূল!) আপনি বলুন : “অবশ্যই আমি আল্লাহর দাসত্ব করার ও তাঁর সাথে (কাউকে বা কোনো কিছুকে) শরীক না করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই দিকে আহ্বান করি এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই পানে।” আর এভাবেই আমি তাকে (এ গ্রন্থকে) পরম জ্ঞানপূর্ণরূপে ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশক প্রাঞ্জলভাষী (আরবী) রূপে নাযিল্ করেছি। এমতাবস্থায়, আপনার নিকট জ্ঞান এসে যাওয়ার পর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির (খেয়ালখুশীর) অনুসরণ করেন তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য আপনি না কোনো অভিভাবক পাবেন, না কোনো রক্ষাকারী পাবেন।” (সূরাহ্ আর্- রা‘দ্ : ৩৬- ৩৭)

উপরোক্ত আয়াতে লক্ষ্যণীয় যে, এখানে عربي শব্দকে حكم (পরম জ্ঞান/ অকাট্য জ্ঞান) শব্দের সাথে ‘কোরআন’- এর অবস্থা (حال) রূপে ব্যবহার করা হয়েছে যে ক্ষেত্রে ‘আরবী’ শব্দের অর্থ ‘আরব উপদ্বীপের লোক বা তাদের ভাষা’ করলে তা খুবই বিসদৃশ হবে। কারণ, পরম জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ জনগোষ্ঠী বিশেষ বা অঞ্চল বিশেষের লোকদের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে - এটা কোনো যুক্তি নয়, বরং এ বিষয় প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষাকে বেছে নিতে হবে। এ জন্য জনগোষ্ঠী বিশেষ বা অঞ্চল বিশেষের লোকদের ভাষাকে যদি বেছে নেয়া হয়ে থাকে তো তা কেবল এ কারণেই বেছে নেয়া হয়েছে যে, এ ভাষা ঐ বিষয় প্রকাশের উপযুক্ত।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

(حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

“হা- মীম। এ হচ্ছে পরম দয়াময় মেহেরবানের পক্ষ থেকে অবতরণ (অবতীর্ণ গ্রন্থ)। এ হচ্ছে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশক প্রাঞ্জলভাষী (আরবী) কোরআন - এমন কিতাব্ যার আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট ও অকাট্য অর্থজ্ঞাপক রূপে জ্ঞানবান লোকদের জন্য বর্ণিত হয়েছে।” (সূরাহ্ হা- মীম্ আস্- সাজদাহ্ : ১- ৩)

এ আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনকে “আরবী” করা হয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য। প্রশ্ন হচ্ছে, এর সাথে তৎকালীন আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের ও তাদের ভাষার কী

সম্পর্ক? তৎকালে আরবদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম এবং জ্ঞানী- দার্শনিক আদৌ ছিলো না। তাহলে জ্ঞানীদের স্বার্থে আরবদের ভাষায় কোরআন নাযিল্ হবে কেন? বরং তৎকালে বিশ্বের অপর কতক অঞ্চলে জ্ঞানী ও দার্শনিকদের অস্তিত্ব ছিলো; বড় বড় মনীষী সংখ্যায় খুব বেশী না থাকলেও অন্ততঃ মধ্যম স্তরের পণ্ডিত লোকের সংখ্যা কম ছিলো না - আরবে যা ছিলো বিরল ব্যতিক্রম। তাহলে কোরআন নাযিলের জন্য বরং ঐ সব পণ্ডিতদের ভাষা বেছে নেয়া উচিত ছিলো।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের ভাষা বেছে নিলেন। কারণ, তৎকালীন আরবরা মূর্খ হলেও তাদের ভাষা ছিলো সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশক প্রাঞ্জল ভাষা যা পরম জ্ঞান প্রকাশের ও সংক্ষেপে সমস্ত জ্ঞানের সমাহার ঘটানোর উপযুক্ত; অন্যান্য ভাষায় জ্ঞানী- দার্শনিক ও পণ্ডিত লোক থাকলেও তাঁদের ভাষা এ গ্রন্থের জন্য আদৌ উপযোগী ছিলো না। অতএব, এ গ্রন্থ্ আরবদের ভাষায়ই নাযিল্ হতে হবে; এ ভাষায় এ গ্রন্থ্ নাযিল্ হওয়ার পর কখনো না কখনো বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ও অন্যান্য ভাষাভাষী জ্ঞানবান লোকেরা এর সংস্পর্শে আসবেন এবং এ গ্রন্থ্ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে এর জ্ঞানসম্পদ উদঘাটন করে মানব প্রজাতিকে উপকৃত করবেন।

এ সব আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, কোরআন মজীদকে আরব উপদ্বীপের লোকদের বুঝার জন্য সহজ করা এ গ্রন্থ্কে আরবী ভাষায় নাযিলের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং স্থান- কাল ও পরিবেশ- পরিস্থিতি নির্বিশেষে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার মহাজ্ঞানপূর্ণ এ বাণীকে এমন এক ভাষায় নাযিল্ করা অপরিহার্য ছিলো যার ভাষাশৈলী ও সীমাহীন প্রকাশসম্ভাবনার আ য়ে এতে এর আয়তনের তুলনায় বিস্ময়করভাবে বেশী ও সুগভীর তাৎপর্য নিহিত রাখা সম্ভব হয়, যা অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে জ্ঞানীদের নিকট প্রকাশ পেতে থাকবে, আর এর ফলে এ বিস্ময়কর গ্রন্থের উৎস সম্পর্কেও তাঁরা নিশ্চিত হতে পারবেন। এ কারণেই অন্য সমস্ত ভাষার তুলনায় প্রাঞ্জলতম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক ভাষায় (আরবী) এ গ্রন্থ্ নাযিল্ করা হয়েছে।

অনারব ভাষায় কেন নয়?

কাফেররা বরং দাবী করেছিলো যে, এ কিতাব্ আরবী ভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষায় নাযিল্ হোক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অযৌক্তিক দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, অন্য কোনো ভাষায় এ কিতাবকে তার পরিপূর্ণ বশিষ্ট্য সহকারে নাযিল্ করা আদৌ সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(و انه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين. و انه لفى زبور الاولين. اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بنى اسرائيل. و لو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين)

"নিঃসন্দেহে এটি (এ কিতাব) জগতবাসীদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত - যা সহ বিশ্বস্ত রূহ্ (জিবরাঈল) (হে রাসূল!) আপনার অন্তঃকরণে নাযিল্ হয়েছে যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (আর তা নাযিল্ হয়েছে) সুবর্ণনাকারী প্রাঞ্জল (আরবী) ভাষায়। আর এর উল্লেখ রয়েছে পূর্ববর্তীদের কিতাব্ সমূহে। এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয় যে, বানী ইসরাঈলের আলেমগণ তাঁকে (এই নবীকে) জানে? আমি যদি তা (কোরআন) কোনো আ'জামীর ওপর নাযিল্ করতাম আর সে তা তাদের নিকট পাঠ করতো তাহলে তারা এর ওপর ঈমান আনতো না।" (সূরাহ্ আশ্- 'আরা' : ১৯২- ১৯৯)

অর্থাৎ অনারব ভাষায় কোরআন নাযিল্ করা হলে সে ভাষার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কারণে আরবদের কাছে তা আল্লাহর কিতাব্ বলে মনে হতো না। কারণ, তাদের মনে হতো, যে কিতাবের ভাষা এমন নিম্ন মানের (আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার তুলনায়) তা কী করে আল্লাহর কিতাব্ হয়? ফলে তারা সে কিতাবের ওপর ঈমান আনতো না। তখন তারা বলতো, আল্লাহ্ যদি কিতাব্ নাযিল্ করতেন তাহলে অবশ্যই ে ষ্ঠতম ভাষায় তা নাযিল্ করতেন - যা তাঁর কিতাবের মর্যাদার জন্য উপযুক্ত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন :

(و لو جعلناه قرآناً اعجمياً لقالوا لو لا فصلت آياته. أ اعجمى و عربى)

"আর আমি যদি এটিকে (এ কিতাবকে) আ'জামী পঠনীয় (কোরআন) বনাতাম তাহলে তারা বলতো, এর আয়াতগুলো কেন সুস্পষ্ট ও অকাট্য অর্থজ্ঞাপক হয় নি? (তারা কি চায় যে, তা) আ'জামীও হবে, আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক প্রাঞ্জল (আরবী)ও হবে?" (সূরাহ্ হা- মীম্ আস্- সাজদাহ্ : ৪৪)

আরবী ভাষার শব্দবিবর্তন সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত

কোরআন মজীদ যে আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় নাযিল্ হওয়া সম্ভব ছিলো না তা ভালোভাবে বুঝতে হলে আরবী ভাষা ও উন্নত প্রকাশসম্ভাবনা সম্পন্ন অন্যান্য ভাষার প্রকাশক্ষমতার প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করা অপরিহার্য।

বিষয়টি অত্যন্ত বিরাট ও ব্যাপক। এখানে আরবী ভাষার প্রকাশসম্ভাবনা সম্পর্কে সামান্য আভাস দেয়া যেতে পারে - যার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত প্রকাশক্ষমতা সম্পন্ন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার এবং বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত ইংরেজী ভাষার প্রকাশসম্ভাবনার সাথে তার তুলনা করলেই ভাষাবিদদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আরবী ভাষায় বেশীর ভাগ বিশেষ্য- বিশেষণই সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিশেষ মূল থেকে নিষ্পন্ন হয়, তেমনি ক্রিয়াপদের রূপান্তরের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা অনুসৃত হয়। যদিও এটা আরবী ভাষার কোনো একক বশিষ্ট্য নয়, তবে আরবী ভাষার বিশেষ বশিষ্ট্য এখানে যে, এ ভাষায় বিশেষ্য- বিশেষণের নিষ্পন্নতা ও ক্রিয়াপদের রূপান্তর মাত্রা এতো বেশী যে, অন্য কোনো ভাষার পক্ষে এদিক থেকে আরবী ভাষার ধারেকাছেও আসা সম্ভব নয়।

আরবী ভাষায় ক্রিয়ার কালের প্রধান বিভাগ ধু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেই সাথে রয়েছে আদেশ (امر), নিষেধ (نهى), অস্বীকৃতি (نفى), বিরত থাকা (جحد) ও জিজ্ঞাসা (استفهام)। অবশ্য ক্রিয়ার এ ভাগগুলো কোনো না কোনো ভাবে অন্য অনেক ভাষাতেই রয়েছে, কিন্তু আরবী ভাষার বিশেষ বশিষ্ট্য এখানে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কেবল ক্রিয়াপদের স্বরচিহ্নে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে, কতক ক্ষেত্রে দু'একটি বর্ণ যোগ বা বিয়োগ করে এবং কতক ক্ষেত্রে অব্যয় যোগ করে তাৎপর্যগত পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া جحد (বিরত থাকা) ক্রিয়াপদ আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানা নেই।

এখানে “জাহদ্” (جحد) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া যেতে পারে।

“সে এ কাজটি করে নি।” আরবী ভাষায় এ বাক্যটি অতীত কাল হিসেবে বললে একটি সাধারণ নেতিবাচক তথ্য বুঝাবে,   কিন্তু “জাহদ্” হিসেবে বললে বুঝা যাবে যে,   এখনো সে কাজটি করে নি বটে,   তবে করার সম্ভাবনা অস্বীকৃত নয়।

অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় অতীত কালের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যার মধ্য থেকে কতক বিভাগ একান্তই আরবী ভাষার নিজস্ব। আরবী ভাষার অতীত কালের বিভাগগুলো হচ্ছে : সাধারণ অতীত, নিকট অতীত, দূর অতীত, ঘটমান অতীত, সম্ভাব্য অতীত ও আকাঙ্ক্ষাবাচক অতীত। শব্দে সামান্য রদবদল করে বা অব্যয়যোগে এ সব পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। তেমনি ভবিষ্যত কালের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে নিকট ও দূর ভবিষ্যত রয়েছে। সেই সাথে আছে ‘জোর দেয়া’ বা ‘গুরুত্ব আরোপ’ (تأكيد) । এই “তা’কীদ” আবার “সাধারণ তা’কীদ্” ও “বেশী তা’কীদ” এবং “অনেক বেশী তা’কীদ” হতে পারে।

আরবী ভাষায় যে কোনো ক্রিয়াপদের কর্তার সংখ্যা (বচন) ও নারী- পুরুষ ভেদে ১৪টি করে রূপ আছে। কর্মের ক্ষেত্রেও তা- ই। একই কালে প্রতিটি ক্রিয়ারও একই সংখ্যক রূপ আছে। অন্যদিকে ক্রিয়ার তাৎপর্যভেদে একই ক্রিয়ার একই কালে নয়টি প্রধান ও আরো অনেকগুলো অপ্রধান রূপ আছে - যা কেবল মূলক্রিয়াপদের সাথে একটি বা দু’টি হরফ যোগ করে তরী করা যেতে পারে। এভাবে একটি ক্রিয়াপদ থেকে বিপুল সংখ্যক ক্রিয়ারূপ তরী করা সম্ভব।

উদাহরণ থেকে এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অন্য ভাষার তুলনায় আরবী ভাষায় শব্দ ও বাক্যের বিবর্তন ও রূপান্তরের আধিক্য এবং একই সাথে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে (কম শব্দ ব্যবহার করে) অধিকতর সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ভাব প্রকাশের বিষয়টি লক্ষণীয়।

প্রথমে আমরা শব্দবিবর্তনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো এবং এরপর বাক্যবিবর্তনের দৃষ্টান্ত দেবো।

[আরবী ভাষায় আ- কার (া)- এর জন্য যবর এবং তদসহ আলেফ (ا) যোগ হলে উক্ত ‘আ-কার’- কে দীর্ঘায়িত করতে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় তা নির্দেশ করার জন্য কোনো স্বতন্ত্র বর্ণ বা চিহ্ন নেই। তাই অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বিবেচনায় নীচের উদাহরণগুলোতে ও আরো কতক ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দের উচ্চারণে ও উচ্চারণ নির্দেশের বেলায় ডবল আ- কার (াা) ব্যবহার করেছি; অন্যথায় কতক ক্ষেত্রে দু’টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ অভিন্ন হয়ে যেতে পারে। তবে বাংলা লেখার মধ্যে ব্যবহৃত আরবী শব্দের বানান নিজস্ব নিয়মে করা হয়েছে, যেমন : عَالِم উচ্চারণনির্দেশে “‘আালিম্” এবং বাংলা লেখার মধ্যে “আলেম”।]

عَلَمَ (‘আলামা) - সে (কোনো কিছুর ওপর) চিহ্ন দিলো। عَلَمَ السنة - সে ঠোঁট ফাঁক করলো।

عَلِمَ (‘আলিমা) - সে জ্ঞানী ছিলো; সে জ্ঞানী হলো; সে জানলো; সে জানতো; সে (কোনো কিছু) লক্ষ্য করলো/ প্রত্যক্ষ করলো; সে তার ওপরের ওষ্ঠ বিকশিত করলো। عَلَمَ الامرُ - সে কাজটি খুব ভালোভাবে ও পাকাপোক্ত করে আঞ্জাম দিলো।

عَلَم (‘আলাম্) - নিদর্শন বা চিহ্ন (যা থেকে কোনো কিছু জানা যায় বা কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত হয়)।

عَالِم (‘আালিম্) - যিনি কোনো একটি বিষয় জেনেছেন বা বিভিন্ন বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে জেনেছেন (আলেম - জ্ঞানী)। اَعلَم (আ‘লাম্) - (কারো তুলনায় বা অন্য সকলের তুলনায়) অধিকতর জ্ঞানী। عَلاَّم (‘আল্লাাম্) - যিনি অনেক বেশী জানেন - অনেক বড় জ্ঞানী। عَلاَّمَة (‘আল্লাামাহ্) - মহাপণ্ডিত (‘আল্লামাহ্); দার্শনিক। عَلِيم (‘আলীম্) - সদাজ্ঞানময়।

عِلم (‘ইল্ম্) - জ্ঞান। مَعلُوم (মা‘লূম্) - যা জানা হয়েছে; যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে: যে বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা গেছে বা জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

اَعلَم (আ‘লাম্) - ওপরের ওষ্ঠ বিকশিতকারী; ওপরের ওষ্ঠ বিকশিতকারী প ।

اَعلَمَ (আ‘লামা) - সে জানালো; সে ঘোষণা করলো; সে অবগত করলো।

عَلَّمَ (‘আল্লামা) - সে শিক্ষা দিলো।

تَعَلَّمَ (তা‘আল্লামা) - সে (অন্যের দেয়া) শিক্ষা গ্রহণ করলো; সে পড়া পড়লো। تَعَلَّمَ الامرَ - সে কাজটি পাকাপোক্তভাবে/ খুব ভালোভাবে আঞ্জাম দিলো।

تَعَالَمَ (তা‘আলামা) - সে (কোনো কিছু) জানতে/ বুঝতে পারলো।

اِستَعلَمَ (ইস্তা‘লামা) - সে জানতে চাইলো।

العَلَم (আল্- ‘আলাম্)- পোশাকের নকশা; পতাকা; গোত্রপতি; চিহ্ন; মসজিদের মিনার।

العَلاَمَةُ (আল্- ‘আলাামাহ্) - আলামত; চিহ্ন; পথনির্দেশক ফলক।

العالَمَ (আল্- ‘আলাম্) - জগত, বিশ্ব।

العلاميُّ (আল্- ‘আলাামীয়্যু) - চালাক- চতুর; সতর্ক।

العَلَمَة (আল্- ‘আলামাহ্)- বর্ম; জ্ঞানী।

العَيلَم (আল্- ‘আইলাম্) - সমুদ্র; পানিতে পরিপূর্ণ প; পুরুষ চিতাবাঘ।

المعلَم (আল্- মা‘লাম্)- পথনির্দেশক ফলক।

এর বাইরে علم মূল থেকে আরো অনেক শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ নিষ্পন্ন হতে পারে। অনেকগুলো রূপের আদৌ ব্যবহার নেই, কিন্তু কখনো হয়তো কোনো সুলেখক বা সুবক্তা উপযুক্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করার চিন্তা করতে পারেন। অর্থাৎ ব্যবহার না থাকলেও এ ধরনের আরো অনেক রূপের সম্ভাবনা নিহিত আছে।

ওপরে যে সব উদাহরণ দেয়া হলো তার মধ্য থেকে যেগুলো ক্রিয়াপদের উদাহরণ সেগুলো সবই কর্তৃবাচ্যে। এর প্রতিটিরই কর্মবাচ্য আছে যার ফলে علم মূল থেকে নিষ্পন্ন রূপের সংখ্যা আরো

অনেক বেড়ে যায়। সেই সাথে বিভিন্ন কালের কথা চিন্তা করা যেতে পারে ইতিপূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, কালভেদে ও কর্তাভেদে ক্রিয়াপদের রূপের পরিবর্তন হয়ে থাকে স্বাভাবিকভাবেই। সে সব রূপের বিস্তারিত উদাহরণ হবে অনেক দীর্ঘ - এখানে যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে কর্তৃবাচ্য- কর্মবাচ্য নির্বিশেষে এখানে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ থেকে আরো কয়েকটি উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি যা রূপান্তরের সাথে সাথে অর্থে বিশেষ পরিবর্তন, বিশেষতঃ সূক্ষ্ম পরিবর্তন নির্দেশ করে থাকে। (সেই সাথে কয়েক ধরনের নিষ্পন্ন বিশেষ্যরও উল্লেখ করা হলো।)

نَشَرَ (নাশারা)- সে প্রকাশ করলো। نُشِرَ (নুশিরা) - তা (বই/ পত্রিকা/ ...) প্রকাশিত হলো। اِنتَشَرَ (ইন্তাশারা) - (কেউ প্রকাশ করলো বিধায়) তা প্রকাশিত হলো।

كَسَرَ (কাসারা) - সে (কোনো কিছু) ভেঙ্গে ফেললো; তা (নিজে নিজে) ভেঙ্গে গেলো। انكَسَرَ (ইনকাসারা) - তা (কেউ ভেঙ্গে ফেলেছে বিধায়) ভেঙ্গে গেলো (নিজে নিজে ভেঙ্গে যায় নি)।

ضَرَبَ (যারাবা) - সে (কাউকে প্রহার করলো/ আঘাত করলো)। ضَارَبَ (যা◌ারাবা) - সে (কারো সাথে) মারামারি করলো (তাকে মেরেছে বলে সে প্রতিপক্ষকে মারলো); (তাকে আঘাত করেছে বলে) সে (প্রতিপক্ষকে) আঘাত করলো। اَضرِبُ (আযরিবু) - আমি প্রহার করবো। سَاَضرِبُ (সাআযরিবু) - আমি অচিরেই প্রহার করবো। لاضرِبُ (লাআযরিবু) - আমি অবশ্যই প্রহার করবো। اَضرِبَنَّ (আযরিবান্না)- আমি অবশ্যই প্রহার করবো। لاَضرِبَنَّ (লাআযরিবান্না) - আমি অবশ্য অবশ্যই প্রহার করবো। ضَارِب (যা◌ারিব্) - প্রহারকারী। مَضروب (মাযরূব্) - প্রহৃত। ضَرَّاب (যাররা◌াব্) - বেশী বেশী আঘাতকারী: অনবরত আঘাতকারী। مِضراب (মিযরা◌াব্) - মারার উপকরণ, লাঠি, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ বাজানোর ক্ষুদ্র উপকরণবিশেষ।

مَرِضَ (মারিযা) - সে অসুস্থ হলো। تَمَارَضَ (তামা◌ারাযা) - সে অসুস্থতার ভান করলো।

غَرَبَ (গ্বরাবা) - সে চলে গেলো; সে/ তা দূর হয়ে গেলো; সে বহু দূরে (সফরে) গেলো; (চন্দ্র/ সূর্য/ নক্ষত্র) অস্তমিত হলো। مَغْرِب (মাগ্বরিব্) - অস্ত যাবার সময় (সন্ধ্যা); অস্ত যাবার স্থান ও দিক (পশ্চিম); পশ্চিমের দেশ (পাশ্চাত্য)।

حَسُنَ (হাসুনা) - সে সুন্দর ছিলো; সে সুন্দর হলো। حَسَن (হাসান্) - চির সুন্দর। اَحسَن (আহসান্) - অধিকতর সুন্দর। حُسَين (হুসাইন্) - (আকারে) ছোট সুন্দর জিনিস; (বয়সে) ছোট হাসান (ব্যক্তি); দুইজন সুন্দর ব্যক্তির মধ্যে যে বয়সে ছোট।

صَارَ (ছ্বা়রা)- সে / তা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হলো; যেমন : صار الماءُ سلجاً - পানি বরফে পরিণত হলো।

اَصبَحَ (আছ্ববাহা) - তার সকাল হলো; বিশেষ এক অবস্থায় তার সকাল হলো; সকালে তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে আরেক অবস্থা হলো; যেমন : اَصبَحَ مَرِيضاً - অসুস্থ অবস্থায় তার সকাল হলো; সে সকাল বেলা অসুস্থ হয়ে পড়লো।

এখানে এলোপাতাড়িভাবে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো। নচেৎ একই ক্রিয়ামূল থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্য- বিশেষণের রূপ অনেক। এরপর এগুলোর বচনভেদ, স্ত্রী- পুরুষভেদ, কালভেদ ইত্যাদি তো রয়েছেই। এছাড়া আছে কর্তাবাচক বিশেষ্য, কর্মবাচক বিশেষ্য, কর্মের উপকরণ বাচক বিশেষ্য, স্থান ও কাল বাচক বিশেষ্য, আধিক্যবাচক বিশেষ্য, ক্ষুদ্রতাবাচক বিশেষ্য ইত্যাদি।

আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার দৃষ্টান্ত

এবার আমরা আরবী ভাষার বাক্যগঠন বচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি দেবো যা কথক বা লেখককে তার বাঞ্ছিত ভাব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, আরবী ভাষায় বাক্যের ভিতরে ভূমিকা ভেদে ক্রিয়া ও বিশেষ্য- বিশেষণের শেষ বর্ণের স্বরচিহ্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বাক্যের তাৎপর্যে পরিবর্তন ঘটানো হয়। এ ক্ষেত্রে স্বরচিহ্নের ভূমিকাকে রাফ্‘ (رَفع), নাছ্‌ব্ (نَصب), জাযম্ (جَزم) ও জার্র্ (جَرّ) বলা হয়। এর মধ্যে প্রথম দু’টি ক্রিয়া ও বিশেষ্য- বিশেষণ উভয় ক্ষেত্রে, তৃতীয়টি ধু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং চতুর্থটি ধু বিশেষ্য- বিশেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কর্তা ও কর্মভেদে এগুলোর বিবিধ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা এখানে খুব বেশী যরূরী নয়। তবে জার্র্ (جَرّ) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ ছাড়া আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা হবে খুবই অসম্পূর্ণ ও অগভীর। কারণ জার্র্ (جَرّ) হচ্ছে এমন একটি ব্যাকরণিক নিয়ম আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় যার ব্যবহার নেই। জার্র্- এর দ্বারা আরবী ভাষায় এমনভাবে সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ করা হয় যে জন্য অন্যান্য ভাষায় বাক্যে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করতে হয়। স্মর্তব্য, অভিন্ন ভাব দুর্বোধ্যতা ছাড়াই অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারা যে কোনো ভাষা বা বক্তা বা লেখকের কৃতিত্ব বা গৌরব বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এখানে বাংলা ও ইংরেজী অর্থ সহ আরবী ভাষায় জার্র্- এর ব্যবহার সহ সংক্ষেপে ভাব প্রকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

رَأَيتُ زيداً (রাআইতু যাইদান্আমি যায়েদকে দেখলাম। - (I saw Zayd. এ বাক্যে আরবীতে ২ শব্দ, বাংলায় ৩ শব্দ ও ইংরেজীতে ৩ শব্দ।

مَرَرتُ بِزَيدٍ (মাবারতু বিযাইদিন্আমি যায়েদকে অতিক্রম করে গেলাম - (; আমি যায়েদের পাশ ঘেঁষে গেলাম। I passed accross Zayd. জারর নিয়মের এ আরবী বাক্যে শব্দসংখ্যা ২টি, বাংলা বাক্যে ৫টি এবং ইংরেজী বাক্যে ৪টি।

এবার جحد ক্রিয়াপদ যোগে গঠিত বাক্যের উদাহরণ :

لَمْ يَضرِب زَيدٌ علياً / لَمَّا يَضرِب زَيدٌ عَلياً (লাম্ ইয়াযরিব্ যাইদুন্ 'আলীয়্যান্ লাম্মা ইয়াযরিব্ যাইদুন্ / 'আলীয়্যান্ যায়েদ : চ্ছেএ উভয় বাক্যেরই মানে হ - ('এখনো' আলীকে মারে নি - Still Zayd has not beaten Ali. এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উভয় আরবী বাক্যেই শব্দসংখ্যা ৪টি, বাংলায় ৫টি এবং ইংরেজীতে ৬টি।

কিন্তু উপরোক্ত আরবী বাক্যে বতিক্রমধর্মী যে তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হচ্ছে, যায়েদ এখনো আলীকে মারে নি বটে, কিন্তু পরে মারতে পারে। তবে প্রথম বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে, যায়েদ পরে আলীকে মারতেও পারে, না- ও মারতে পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্যে এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, যায়েদ পরে আলীকে মারবে - এ সম্ভাবনাই বেশী।

উপরোক্ত উভয় বাক্য কর্তা- কর্ম অগ্র- পশ্চাত করে এভাবেও বলা যেতে পারে : / لَمْ يَضرِب عَلياً زَيدٌ لَمَّا يَضرِب عَلياً زَيدٌ (লাম্ ইয়াযরিব্ 'আলীআন্ যাইদুন্ / লাম্মা ইয়াযরিব্ 'আলীআন্ যাইদুন্) সে ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে, আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি, তবে অন্য কেউ মেরে থাকতে পারে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে, আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি, তবে পরে মারবে।

কিন্তু আরবী ভাষায় কর্তা- কর্ম অগ্র- পশ্চাত করেও ভাব প্রকাশে বিরাট পরিবর্তন করা হয়। যেমন : ضرب زَيدٌ عَلياً (যারাবা যাইদুন্ আলীয়্যান্) না বলে ضرب عَلياً زَيدٌ (যারাবা আলীয়্যান্ যাইদুন্) বলা যেতে পারে। এ উভয় বাক্যের অর্থই "যায়েদ আলীকে মেরেছে।" কিন্তু পার্থক্য এখানে যে, প্রথম বাক্যে বক্তা কর্তার ওপর এবং দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।

ব্যাকরণে আলাদাভাবে আলোচনা করা না হলেও বাংলা ভাষায় কোনো কোনো অঞ্চলের গ্রামের লোকদের মধ্যে তাৎপর্যের ভিন্নতা বুঝানোর জন্য এভাবে কর্তা- কর্ম অগ্র- পশ্চাত করার প্রচলন রয়েছে। যেমন : আমি ভাত খাই (সাধারণ তথ্য/ সংবাদ)। কিন্তু অনেক সময় বলা হয় : আমি খাই ভাত। এর মানে : আমি (প্রধান খাদ্য হিসেবে) অন্য কিছু বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট খাবার খাই না। যেমন বলা হয় : আমি খাই ভাত, সে খায় রুটি। ইংরেজী ভাষায়ও এ ধরনের প্রচলন কিছুটা থাকলেও তা ব্যাকরণে স্বতন্ত্র গুরুত্ব না পাওয়ায় এর ব্যবহার খুবই কম।

অন্যদিকে আরবী ভাষায় সাধারণ বাক্য ক্রিয়াপদ দ্বারা রু করার নিয়ম থাকলেও কর্তা বা কর্ম দ্বারাও রু করা যয়। সে ক্ষেত্রে তাৎপর্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। যেমন : কোনো বাক্য ক্রিয়াপদ দ্বারা রু না করে কর্তা বা কর্ম দ্বারা রু করলে এবং ক্রিয়াপদটিকে তার পরে স্থান দিলে (যেমন : زَيدٌ ضرب عَلياً বা عَلياً ضرب زَيدٌ) তাৎপর্যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে, তা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার তুলনায় কর্তা বা কর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়।

তেমনি সামান্য ওপরে جحد ক্রিয়াপদের উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত বাক্য দু'টি কর্তা- কর্ম অগ্র- পশ্চাত করে এভাবেও বলা যেতে পারে : لَم يَضرِب عَلياً زَيدٌ / لَمَّا يَضرِب عَلياً زَيدٌ (লাম্ ইয়াযরিব্ 'আলীয়্যান্ যাইদুন্/ লাম্মা ইয়াযরিব্ 'আলীয়্যান্ যাইদুন্) সে ক্ষেত্রে কর্তার তুলনায় কর্মের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও প্রথম বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে, আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি, তবে অন্য কেউ মেরে থাকতে পারে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে, আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি, তবে পরে মারবে।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের বাক্যরীতির সাধারণ প্রচলন না থাকলেও অন্ততঃ অংশতঃ হলেও এ ধরনের ভাব প্রকাশের জন্যে কর্তাপশ্চাত করে বাক্য গঠনের মতো প্রশস্ততা রয়েছে। -কর্ম অগ্র - রূপান্তরিত না কিন্তু ইংরেজী ভাষায় অতিরিক্ত শব্দ যোগ না করে বা কর্তৃবাচ্য বাক্যকে কর্মবাচ্যে করে তা প্রকাশের সুযোগ নেই। কারণ, যদি বলি যে, Still Ali has not beaten Zayd.. তাহলে এর অর্থই উল্টে যাবে। আর যদি বলি যে, Still Ali has not been beaten by Zayd. তাহলে

বাক্যটি ধু কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যেই রূপান্তরিত হবে না, বরং তার শব্দসংখ্যা বেড়ে ৮টিতে দাঁড়াবে। এই একটি বিষয়ের ওপরে আরো দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায় কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষার সাথে আরবী ভাষায় এর ব্যবহারের পার্থক্য এখানে যে, আরবী ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহারের পিছনে সাধারণতঃ বক্তার উদ্দেশ্য থাকে কর্তাকে গুরুত্ব না দেয়া; কেবল কর্মকে গুরুত্ব দেয়া। এ কারণে কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তাকে আদৌ উল্লেখ করা হয় না। যেমন : ضُرِبَ عليٌّ (যুরিবা 'আলীয়্যুন্)- আলী প্রহৃত হলো (কার দ্বারা প্রহৃত হলো তা বলার জন্যে বক্তার কোনো আগ্রহ নেই)।

আরবী ভাষায় বাক্য গঠনের ধরনের আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

نَشَرَ زَيدٌ كِتاباً (৩ শব্দ)। যায়েদ একটি বই প্রকাশ করলো (৫ শব্দ)। Zayd published a book (8 শব্দ)। نُشِرَ كِتابٌ (২ শব্দ)। একটি বই প্রকাশিত হলো (৪ শব্দ)। A book is published (8 শব্দ)।

الكِتابُ مَنشورٌ (২ শব্দ)। বইটি প্রকাশিত (২ শব্দ)। The book is published (8 শব্দ)।

আরবী বাক্য প্রকরণে حال (হাাল্- অবস্থা) একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অন্য ভাষায় অনুপস্থিত না থাকলেও পরিবর্তিত ভাবপ্রকাশের জন্য আরবী ভাষায় এর যে ব্যবহার তা অন্যান্য ভাষায় দেখা যায় না এবং এ কারণেই অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণে এটি আলাদা বিষয় হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায় না।

حال মানে হচ্ছে একটি ক্রিয়া কী অবস্থায় সংঘটিত হচ্ছে। এ অবস্থাটা কর্তা, কর্ম উভয়েরই হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক :

جاء رجول راكب - (যাআ রাজূলুন্ রাাকেব্ - একজন অশ্বারোহী লোক এলো।) এখানে راكب হচ্ছে صفت - বিশেষণ।

جاء رجول راكباً - (যাআ রাজূলুন্ রা‍াকেবান্ - অশ্বারূঢ় অবস্থার অধিকারী একজন লোক এলো।) এখানে راكباًহচ্ছে صفت - বিশেষণ।

جاء الرجول الراكب - (যাআর্ রাজূলুর্ রা‍াকেব্ - অশ্বারোহী লোকটি এলো।) এখানে الراكب হচ্ছে صفت - বিশেষণ।

جاء الرجول راكباً - (যাআর্ রাজূলু রা‍াকেবান্ - লোকটি অশ্বারূঢ় অবস্থায় এলো।) এখানে راكباً হচ্ছে حال - অবস্থা।

এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা করা যেতে পারে। আরবী ভাষার বিস্ময়করভাবে ব্যাপক ও সুগভীর ভাব প্রকাশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভের জন্য মোটামুটি এতোটুকুই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

কোরআন মজীদের প্রকাশক্ষমতার মু'জিযাহ্

আরবী ভাষায় একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে : خير الكلام ما قلَّ دلَّ - "(ভাষা- সাহিত্যের মানগত বিচারে) সর্বোত্তম কথা হলো যা সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যবহ।" এটা যে কোনো ভাষায়ই সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে যে কোনো ভাষায় রচনাপ্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। রচনা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সকল প্রতিযোগীই রচনা তরী করে। এ ক্ষেত্রে রচনা বিচারের বেলায় যে বিষয়গুলো দেখা হয় তা হচ্ছে : (১) বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী সর্বোত্তম শব্দাবলী নির্বাচন, (২) স্বল্পতম আয়তন, (৩) গভীরতম, ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ, (৪) গতিশীলতা তথা প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে উন্নততম রচনাশৈলী ব্যবহার ও (৫) বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল আলঙ্কারিকতা।

কোরআন মজীদ তার বিষয়বস্তুর বচিত্র্য ও ব্যাপকতার বিচারে খুবই সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থ, অথচ সীমাহীন তাৎপর্যের অধিকারী। কারণ, শব্দচয়ন, শব্দপ্রয়োগ ও বাকরীতির সর্বোত্তম

ব্যবহারের মাধ্যমে অবলম্বিত এক বিস্ময়কর রচনাকৌশলের আ য়ে এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে 'আক্বাএদ্, আহ্কাম, আইন-কানুন, নতিকতা, দর্শন, ভবিষ্যদ্বাণী, উপদেশ, প্রার্থনা, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, যুদ্ধ, সন্ধি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, বস্তুবিজ্ঞান ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মানদণ্ডের বিচারে কোরআন মজীদ হচ্ছে পূর্ণতম ভাব প্রকাশের চরমতম নিদর্শন।

বস্তুতঃ আরবী ভাষা ভাব প্রকাশের বিচারে প্রায় সীমাহীন সম্ভাবনার অধিকারী। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে মানুষের ভাষা 'সীমাহীন' সম্ভাবনার অধিকারী হতে পারে না, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে তা সীমাহীনই বটে। কারণ, কোনো মানুষের পক্ষেই আরবী ভাষার সকল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করে একই কথা বা রচনায় সূক্ষ্মতম তাৎপর্য প্রকাশ, স্বল্পতম শব্দের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও উন্নততম সাহিত্যিক সৌন্দর্য - এ তিনটি বশিষ্ট্যই বজায় রাখা সম্ভব নয়, বিশেষ করে বিষয়বস্তু যদি নিরেট সাহিত্য বা ইতিহাস না হয়, বরং জ্ঞানমূলক হয়।

সুদক্ষ বাগ্মী বক্তা বা সুসাহিত্যিক লেখক অনেক সময় অনেক পরি ম করে উপযুক্ততম শব্দাবলী ও উন্নততম বাক্যরীতি ব্যবহার করে কথা বা রচনা পেশ করার পর, এ ভাষার এই প্রায় সীমাহীন প্রকাশ সম্ভাবনার কারণে দেখা যায়, পরবর্তীতে অন্যদের পর্যালোচনায় ধরা পড়ে যে, তা আরো উন্নত হতে পারতো। এমতাবস্থায় কোনো মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাপ্রশাখা নিয়ে কথা বলতে চাইলে - কোরআন মজীদে যেরূপ বলা হয়েছে - তার পক্ষে সংক্ষিপ্ততা, প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা ও সাহিত্যিক আলঙ্কারিকতা বজায় রেখে কোনো গ্রন্থ রচনা করা পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, মানবিক প্রতিভার পক্ষে এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে একদিক বজায় রাখতে গেলে আরেক দিক বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু কোরআন মজীদে এর সব দিকই বজায় রাখা হয়েছে। তাই কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জের সামনে সকল যুগের সকল অমুসলিম পণ্ডিত, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক সম্মিলিতভাবে মোকাবিলার সুযোগ পেয়েও ব্যর্থতার কলঙ্ক বহন করতে বাধ্য হয়েছেন। সৃষ্টিলোকের ধ্বংস পর্যন্ত এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না।

বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ কী?

কোরআন মজীদের অলৌকিকতার বিভিন্ন দিক রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তার বিশ্বজনীন চিরন্তন পথনির্দেশযোগ্যতা, সীমাহীন জ্ঞানগর্ভতা, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি। কিন্তু এর অলৌকিকতার সর্বপ্রধান দিক হচ্ছে এ মহাগ্রন্থের সাহিত্যসৌন্দর্য তথা ভাষার প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য, সংক্ষিপ্ততা এবং ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশে সক্ষমতা। এ বিষয়টিকে আরবী ভাষায় ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাত্ বলা হয়। কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রায় অভিন্নার্থক এ পরিভাষা দু'টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

কোরআনের মু'জিযাহ্ বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতে

নিরক্ষর হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) কর্তৃক বিশ্ববাসীর সামনে পেশকৃত কোরআন মজীদের তত্ত্বজ্ঞান তথা জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্যের যুক্তিবিজ্ঞানভিত্তিক ও দর্শনসম্মত উপস্থাপনা, বিশ্বজনীন চিরন্তন পথনির্দেশনা, কালোত্তীর্ণ আইন-বিধান, সীমাহীন জ্ঞানগর্ভতা, বস্তুজাগতিক ও মহাজাগতিক রহস্যাবলী উন্মোচন, বস্তুবিজ্ঞানের এমন বহু সত্যের ওপর থেকে পর্দা উন্মোচন যা তৎকালের (ষ্ঠতম বিজ্ঞানীদেরও অজানা ছিলো এবং এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন এ মহাগ্রন্থের এমন সব অলৌকিক দিক কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে যার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে, হচ্ছে এবং ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত হতে থাকবে। এ পর্যন্ত কোরআন মজীদের এ সব দিক যতোখানি প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্বের (ষ্ঠতম জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, মনীষী ও বিজ্ঞানীদেরকে বিস্ময়ে হতবাক করেছে এবং করে চলেছে। কোরআন মজীদের এ সব বশিষ্ট্য অকাট্যভাবে এ মহাগ্রন্থের অলৌকিকতা ও ঐশিতা প্রমাণ করে।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সকল যুগেই কোরআনের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে আলোচনাকারী মনীষীগণ এ মহাগ্রন্থের এ সব গুরুত্বপূর্ণ বশিষ্ট্যকে এ মহাগ্রন্থের মু'জিযাহর অপ্রধান বা

আনুষঙ্গিক দিক হিসেবে গণ্য করেছেন, প্রধান দিক হিসেবে নয়। ভেবে দেখার বিষয়, এর কারণ কী?

এর কারণ এই যে, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই কোরআন মজীদ নাযিলের যুগে কোরআনের এ দিকগুলো তৎকালীন বিশ্বের ে ষ্ঠতম পণ্ডিতগণের নিকটও খুব অল্প পরিমাণে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিলো; বরং এ সব দিক ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবার জন্য ধর্য সহকারে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিলো। অন্য কথায়, কোরআন মজীদের এ সব বিষয় আজকের দিনে এর মু'জিযাহ্ তথা এর ঐশী কিতাব্ হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণ করলেও তৎকালে তা সম্ভব ছিলো না। এ কারণে কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ প্রমাণের জন্য তার এমন একটি বশিষ্ট্যকে তার প্রধান দিক বা একমাত্র দিক হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিলো যা সর্বকালে ও সর্বস্থানে সমানভাবে দেদীপ্যমান থাকবে। আর সে দিকটি হওয়া সম্ভব ছিলো এ মহাগ্রন্থের একমাত্র ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের দিক।

কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতকে কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হলে অন্ততঃ সে যুগে তা কেবল আরবদের পক্ষেই পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব ছিলো; অনারবদের পক্ষে নয়। কিন্তু কেউ এ ধারণা করলে অবশ্যই ভুল করবে। কারণ, সকল যুগেই প্রতিটি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেই অন্য ভাষায় বিশেষজ্ঞ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ছিলো। বিশেষ করে বিশ্বের জীবন্ত ও ক্লাসিক ভাষা সমূহের ে ষ্ঠ সাহিত্যকর্মগুলোর সাথে সব ভাষার মনীষী ও কবি- সাহিত্যিকগণ কমবেশী পরিচিত থাকতেন এবং এ সবের তুলনামূলক পর্যালোচনাও সব যুগেই প্রচলিত ছিলো।

একই কারণে কোরআন মজীদ যখন তার রচনাশৈলীর মানদণ্ডে নিজেকে ঐশী কিতাব্ তথা মু'জিযাহ্ বলে দাবী করে তখন খুব সহজেই সে তথ্য অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যে, বিশেষ করে আরবী ভাষার সমগোত্রীয় সেমিটিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সমমানসম্পন্ন কিতাব্ বা তার কোনো অধ্যায়ের (সূরাহর) সমমানসম্পন্ন রচনা আনয়নের চ্যালেঞ্জ ছিলো একটি অনন্য ও অভূতপূর্ব বিষয়। এ অভূতপূর্বতা ও অনন্যতাও সর্বত্র এ চ্যালেঞ্জের খবর ছড়িয়ে পড়ার

অন্যতম কারণ ছিলো। এছাড়া আরবের মোশরেক, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মাধ্যমে তাদের অনারব স্বধর্মীয়দের কাছে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাব, নবুওয়াত দাবী ও চ্যালেঞ্জের খবর সহজেই পৌঁছে যায়; ইতিহাস থেকেও এটা প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় আরবী- জানা অনারব মনীষী ও কবি- সাহিত্যিকগণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব মনে করলে অবশ্যই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতেন। তবে তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁদের নিজেদের ভাষার তুলনায় আরবী ভাষার প্রকাশ- ক্ষমতার ৎ ষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং এ অবস্থায় আরবী ভাষার ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের ৎ ষ্ঠতম নায়কগণ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা ধরে নেন যে, তাঁদের পক্ষে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ নাযিলের যুগে জাহেলীয়াতের তিমিরে নিমজ্জিত অজ্ঞমূর্খ অশিক্ষিত আরবদের নিকট এ মহাগ্রন্থের বজ্ঞানিক তথ্যাদি ও দার্শনিকতা তেমনভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিলো না; তাদের কাছে এ সব দিকের আদৌ গুরুত্ব ছিলো না। আর এ গ্রন্থের নতিক- চারিত্রিক শিক্ষা তো ছিলো তাদের সবচেয়ে অপসন্দের বিষয়। অন্যদিকে তাদের কাছে একটিমাত্র বিষয়ের গুরুত্ব ছিলো, তা হচ্ছে, তারা বিশ্বের সকল ভাষার ওপরে তাদের ভাষার প্রকাশক্ষমতার ৎ ষ্ঠত্ব নিয়ে গৌরব করতো এবং এ ভাষার প্রকাশক্ষমতাকে যারা (কবি ও সুবক্তা) যতো বেশী মাত্রায় ব্যবহার করতে সক্ষম হতেন তাঁদেরকে ততো বেশী গুরুত্ব দিতো এবং বলা যেতে পারে যে, তাঁদেরকে তারা আরবদের ৎ ষ্ঠ সন্তান হিসেবে মাথায় তুলে রাখতো। তার প্রমাণ এই যে, আরবী ভাষার ৎ ষ্ঠতম সাতটি কবিতাকে তারা স্বর্ণের কালিতে লিখে কা‘বাহ্ ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলো।

কোরআন মজীদ এ ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের মানদণ্ডে তার বা তার অংশবিশেষের (কোনো সূরাহর) বিকল্প উপস্থপনের জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করলে আরবের ৎ ষ্ঠ কবি ও বাগ্মীরা এ চ্যালেঞ্জে গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন এবং অক্ষম হয়ে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান এনেছিলেন এবং যারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয় নি তারা কোরআন মজীদকে জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো।

কোরআন মজীদের ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাত্ সম্বন্ধে তৎকালীন মক্কাহর মোশরেকদের মধ্যকার ৎ ষ্ঠতম সাহিত্যপ্রতিভা ওয়ালীদ ইবনে মুগ্বীরাহর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কোরআন মজীদ সম্পর্কে আবূ জেহেলের এক প্রশ্নের জবাবে ওয়ালীদ বলেছিলো : "আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আরবী ভাষার কবিতা ও ক্বাছীদাহর সাথে আমার মতো এতোখানি পরিচিত। আরবী ভাষার ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাত্ এবং কবিতা ও গৌরবগাথার সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ আমার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে নি। আমি যে কোনো ধরনের কবিতা, এমনকি জ্বিনদের কবিতা সম্পর্কেও অন্যদের তুলনায় বেশী ওয়াকেফহাল। কিন্তু আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ যে সব কথা বলে তা এ সবের কোনো একটির সাথেও মিলে না। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের বক্তব্যের একটি বিশেষ বশিষ্ট্য আছে যা ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ যে কোনো বক্তব্যকেই হার মানিয়ে দেয় এবং সমস্ত বক্তব্যের ওপরে তা ৎ ষ্ঠত্বের অধিকারী - যার ওপরে ৎ ষ্ঠত্বের অধিকারী বক্তব্য কল্পনাও করা যায় না।" (تفسير طبرى- ٩٨/٢٩.)

অন্যদিকে তৎকালীন আরবদের মধ্যকার আরেক জন সেরা বাগ্মী ওয়ালীদ বিন্ 'উক্ববাহ্ (কোনো কোনো সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী ওয়ালীদ ইবনে মুগ্বীরাহ্) কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলেছিলো :

(و ان له لحلاوة و ان عليه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه ليعلوا و لا يعلى عليه و ما يقول هذا البشر)

"নিঃসন্দেহে এর (কোরআনের) রয়েছে সুমিষ্টতা, নিঃসন্দেহে এর রয়েছে অসাধারণ সৌন্দর্য, অবশ্যই এর রয়েছে সমুন্নত তাৎপর্য, অবশ্যই এর গভীরতা সীমাহীন, নিঃসন্দেহে এ অত্যন্ত উঁচু মানের (কথা) এবং এর চেয়ে উন্নততর ও উচ্চতর মানের (কথা) সম্ভব নয়। আর (প্রকৃত সত্য হলো) এ কথা কোনো মানুষ বলে নি।" (٧٢/١٩ -تفسير طبرى.) [এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য,

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মনীষী আবদুল ক্বাহের জুরজানী তাঁর লিখিত الرسالة الشافية فى الاعجاز গ্রন্থে এই দ্বিতীয়োক্ত ওয়ালীদকে ওয়ালীদ বিন্ 'উক্ববাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

যেহেতু এহেন কোরআন মজীদের সাথে মোকাবিলা করা কোনো কবি ও বাগ্মীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো না সেহেতু ওয়ালীদ বিন্ মুগ্বীরাহ্ কোরআন থেকে লোকদেরকে ফেরাবার জন্য একে জাদু বলে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। (৭২/১৭ -تفسير طبرى.)

এক নযরে আরবী বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে ভাষা- সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রের সাথে যারা পরিচিত নন তাঁদের কাছে এর গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার লক্ষ্যে আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ এবং কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা ধারণা দেয়া এবং সেই সাথে ওয়ালীদ বিন্ মুগ্বীরাহ্ কর্তৃক কোরআন মজীদকে জাদু হিসেবে অভিহিত করার কারণ কী সে সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

আরবী অভিধানে بَلَغَ ও فَصَحَ উভয় কথারই মানে হলো : "সে প্রাঞ্জলভাষী হলো।" আর এ ক্রিয়াদ্বয়ের উৎস অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ্য (مصدر) হলো যথাক্রমে بَلاغَة (বালাগ্বাহ্) ও فَصاحَة (ফাছ্বাহাহ্); উভয়েরই অর্থ 'প্রাঞ্জলতা' ও 'প্রাঞ্জলভাষী হওয়া'। আর প্রাঞ্জলভাষী (লেখক ও বক্তা)কে বলা হয় بَلِيغ (বালীগ্ব) বা فَصِيح (ফাছ্বীহ্)। প্রচলিত অর্থে এতদসংক্রান্ত বিদ্যাকে عِلمُ البَلاغَة ('ইলমুল্ বালাগ্বাহ্) বলা হয়। (বাংলা ভাষায় একে 'ইলমে বালাগ্বাত্ বা ধু বালাগ্বাত্ বলা হয়।)

আমরা এখানে পরিভাষা দু'টির সহজ অনুবাদ করতে গিয়ে 'প্রাঞ্জল', 'প্রাঞ্জলতা' ইত্যাদি লিখেছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতে ভাষার গতিশীলতা, বলিষ্ঠতা, ওজস্বিতা, সুমিষ্টতা, সহজবোধ্যতা, ভাবের গভীরতা, তাৎপর্যের সূক্ষ্মতা, শ্রুতিমাধুর্য, ঝঙ্কার, উপমা-

উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার ইত্যাদি অনেক বশিষ্ট্য শামিল রয়েছে। নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মনীষী আবূল্ হাসান্ বিন্ ‘ঈসা আর- রুম্মানী (ওফাত ৩৮৬ হিজরী) বালাগ্বাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, বালাগ্বাতে দশটি বিষয় শামিল রয়েছে, তা হচ্ছে :

(١)ايجاز، (٢) تشبية، (٣) استعارة، (٤) تلاؤم، (٥) فَواصِل، (٦) تَجانُس، (٧) تَصريف، (٨) تَضمين، (٩) مُبالَغَة و (١٠) حُسن بَيان.

এখানে আমরা রুম্মানীর আলোচনা অবলম্বনে এ দশটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো। [নীচের যে সব নামে যবর্- এর পরে আলিফ্ আছে সে সব নামের কোনো কোনোটিতে ধু উচ্চারণ নির্দেশের ক্ষেত্রে এবং কোনো কোনোটিতে পরবর্তী উল্লেখের ক্ষেত্রেও ডবল আ- কার ব্যবহার করা হলো।]

(১) ايجاز (ঈজাায্)। ঈজায্ মানে তাৎপর্য ও সৌন্দর্য হ্রাসকরণ ব্যতিরেকেই বক্তব্য সংক্ষেপণ।

রুম্মানী বলেন, যে বক্তা দীর্ঘ ও বিস্তারিত বক্তব্যের মাধ্যমে স্বীয় উদ্দেশ্য ে াতাকে বুঝাতে সক্ষম তিনি বালীগ্ব্ নন, বরং বালীগ্ব্ হচ্ছেন তিনি যিনি একই বিষয় অপেক্ষাকৃত কম কথায় ও কম শব্দে বুঝাতে সক্ষম।

ايجاز দুই ধরনের : حذف (হাযফ্ - বিলোপ) ও قَصر (ক্বাছ্বর্ - সংক্ষেপণ)। দ্বিতীয়োক্ত ধরনের ঈজায্ অধিকতর দুরূহ। কারণ, حذف - এর ক্ষেত্রে বক্তব্যের পূর্বাপর থেকে বোঝা যায় যে, কোন্ শব্দটি বিলোপ করে বক্তব্য সংক্ষেপণ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (قَصر) শব্দ ব্যবহারে লেখক বা বক্তার দক্ষতাই হচ্ছে সংক্ষেপণের ভিত্তি।

কোরআন মজীদের ঈজায্ প্রসঙ্গে রুম্মানী অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন :

(و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب)

“হে জ্ঞানবান লোকেরা! ক্বিছ্বাছ্বে¡ (হত্যার বদলে হত্যাকারীকে হত্যায়) তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে।” (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৭৯)

এ আয়াতের القصاص حياة কথাটি জাহেলী যুগে প্রচলিত বিখ্যাত আরবী প্রবাদ القتل انفى للقتل (হত্যা হত্যা প্রতিরোধ করে)- এর বিকল্প। কিন্তু প্রবাদ বাক্যটিতে যেখানে ১৪টি বর্ণ রয়েছে (এবং একটি বর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে; সেটি হিসাবে ধরলে ১৫টি), সেখানে القصاص حياة - এ মাত্র দশটি বর্ণ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, আরবী ভাষায় প্রবাদ বাক্য সমূহ বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের উন্নততম নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন মজীদের উপরোক্ত কথাটিতে শব্দের পুনরাবৃত্তি নেই, কিন্তু প্রবাদ বাক্যে القتل শব্দটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, পুনরাবৃত্তি কথার সৌন্দর্য ও ঝঙ্কারের জন্য অপরিহার্য না হলে তা ত্রুটিরূপে পরিগণিত হয়।

তৃতীয়তঃ উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশে বিপরীতার্থক শব্দের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। কারণ, قصاص (হত্যার বদলে হত্যাকারীকে হত্যা) শব্দটি حياة (জীবন) শব্দের বিপরীত, তা সত্ত্বেও এ আয়াতে বিস্ময়করভাবে قصاص- কে حياة- এর পৃষ্ঠপোষকে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু প্রবাদ বাক্যটিতে এ ধরনের শিল্পকুশলতা নেই।

চতুর্থতঃ আয়াতটিতে ইতিবাচক লক্ষ্য (জীবনের হেফাযত) তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু প্রবাদ বাক্যটিতে নেতিবাচক লক্ষ্য (হত্যার প্রতিরোধ) তুলে ধরা হয়েছে; এখানে হত্যার প্রতিরোধের লক্ষ্য কী (জীবনের হেফাযত) তা উল্লেখ করা হয় নি - যা আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ।

পঞ্চমতঃ প্রবাদ বাক্যে এ কথা পরিস্ফূট নয় যে, হত্যা প্রতিরোধের জন্য হত্যাকারীকেই হত্যা করতে হবে। এ কারণে আরবদের মধ্যে হত্যাকারীর গোত্রের যে কোনো লোককে হত্যা করার যে রীতি প্রচলিত ছিলো তার পথে উক্ত প্রবাদ বাক্য প্রতিবন্ধক হতে পারে নি। কিন্তু قصاص- এ হত্যাকারীকে হত্যার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী বিধানে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার বা তার কাছ থেকে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য গ্রহণ করে তাকে রেহাই দেয়ার অধিকারও দেয়া হয়েছে। অবশ্য বিষয়টির সাথে যদি রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক স্বার্থ জড়িত থাকে এবং ইসলামী সরকার ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাকে অপরিহার্য গণ্য করে সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীরা ঘাতককে ক্ষমা করার অধিকার পাবে না, তবে তারা যদি রক্তমূল্য চায় তাহলে সরকার তাদেরকে রক্তমূল্য প্রদান করবে।]

(২) تشبية (তাশ্বীয়্যাহ্)। তাশ্বীয়্যাহ্ মানে উপমা বা তুলনা। এ ক্ষেত্রে যাকে ও যার সাথে তুলনা করা হয় - উভয়কেই উল্লেখ করা হয়। কোরআন মজীদে অনেক তাশ্বীয়্যাহ্ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(و الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء)

"আর যারা কাফের হয়েছে তাদের কর্মসমূহ মরুভূমির মরীচিকাতুল্য পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি বলে মনে করে।" (সূরাহ্ আন্- নূর : ৩৯)

এ আয়াতে কাফেরদের কাজকে মরীচিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(৩) استعارة (ইস্তি'আরাহ্)। ইস্তি'আরাহ্ মানেও উপমা। কিন্তু ইস্তি'আরাহ্ ও তাশবীয়্যাহর মধ্যে পার্থক্য এখানে যে, তাশবীয়্যায় যাকে ও যার সাথে তুলনা করা হয় - উভয়কেই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু ইস্তি'আরায় যাকে তুলনা করা হয় তাকে উল্লেখ করা হয় না; কেবল যার সাথে তুলনা করা হয় তাকেই উল্লেখ করা হয়। তবে এমনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ে াতা বা পাঠক-পাঠিকা সহজেই বুঝতে পারে যে, কা'কে তুলনা করা হয়েছে। কোরআন মজীদে এ ধরনের উপমাও অনেক রয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم)

"(হে রাসূল!) নিঃসন্দেহে আপনি না মৃতকে আপনার আহবান নাতে পারবেন, না বধিরকে নাতে পারবেন যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। আর আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনয়নকারী নন।" (সূরাহ্ আন্- নামল : ৮০ - ৮১)

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে কাফেরদেরকে মৃত ব্যক্তি, বধির ও অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যদিও এতে ‘কাফের’ শব্দের উল্লেখ নেই।

(৪) تلاؤم (তালা়াউম্)। তালাউম্- কে বাংলা ভাষায় ‘ভাষার বলিষ্ঠতা, ওজস্বিতা ও বীর্যবত্তা’ বলা যেতে পারে। এর তিনটি স্তর আছে; প্রথম স্তরকে تنافر (তানা়াফুর্) বা تفاخر (তাফা়াখুর্) বলা হয়। এ দু’টি পরিভাষার অর্থ যথাক্রমে ‘পরস্পরকে নিন্দা করা’ ও ‘পরস্পরের মোকাবিলায় আত্মগৌরব করা’। জাহেলীয়াত্ যুগের কবি ও বক্তাগণ প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিজেকে অন্যের তুলনায় ে ষ্ঠতর রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন যার মাধ্যমে তাঁরা প্রকারান্তরে অন্যদেরকে বা প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন। এ কারণেই এ পর্যায়ের বলিষ্ঠ ভাষাকুশলতার এরূপ নামকরণ করা হয়।

তালাউম্- এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে تلاؤم واسطى (তালাউমে ওয়া়াসেত্বী) অর্থাৎ মধ্যম স্তরের তালাউম্। আর সর্বোচ্চ স্তরের তালাউম্ হচ্ছে تلاؤم عليا (তালাউমে ‘উল্ইয়া) বা সমুন্নততম তালাউম্।

“তালাউম্”- এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসকে ঠিকঠাক করা’। আর বালাগ্বাতে تلاؤم মানে تعديل الحروف فى التأليف (রচনায় বর্ণসমূহের ভারসাম্য সৃষ্টি করা)।

তালাউমে ‘উল্ইয়ার বশিষ্ট্য “তানাফুর্” ও “তাফাখুর্”- এর বিপরীত। কারণ, এর বলিষ্ঠতা অপর পক্ষের প্রতি অন্ধ বিরোধিতার দোষ থেকে মুক্ত। আর কোরআন মজীদের কালাম্ হচ্ছে তালাউমে ‘উল্ইয়া পর্যায়ের - যা ে াতার বা পাঠক- পাঠিকার অন্তরে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের তালাউম্ কেবল কোরআন মজীদেই রয়েছে: মানুষের কথায় এ ধরনের তালাউম্ আদৌ সম্ভব নয়।

(৫) فَواصِل (ফাওয়া়াছ্বিল্)। فَواصِل শব্দটি হচ্ছে فاصلة (ফা়াছ্বিলাহ্) শব্দের বহু বচন - যার আভিধানিক অর্থ ‘ব্যবধান’। কিন্তু বালাগ্বাতে ‘ফাছ্বিলাহ্’কে ‘মিল, তাল, লয় ও ঝঙ্কার’ বলা

হয়। এর জন্য জাহেলীয়াতের যুগে سجع (সাজ্‘) পরিভাষা ব্যবহৃত হতো। سجع তিন প্রকারের :

متوازن (মুতাওয়াাযিন্), متوازى (মুতাওয়াাযী) ও مطرف (মুত্বাররাফ্)।

মুতাওয়াযিন্ সাজ্‘- এর ক্ষেত্রে দুই পঙ্ক্তির বা দুই বাক্যের শেষের শব্দ সমমাত্রা ও সমস্বর হয়ে থাকে অর্থাৎ ‘হরফের সংখ্যা ও স্বরধ্বনিসমূহ’ (وزن - ওয়াযন্) অভিন্ন হয়ে থাকে (শেষ হরফ অভিন্ন হওয়া যরূরী নয়)। যেমন : مواج (মাওয়াাজ্) ও نقاد (নাক্বক্বাাদ্)।

মুতাওয়াযী সাজ্‘- এর ক্ষেত্রে দুই পঙ্ক্তির বা দুই বাক্যের শেষ শব্দের শেষ হরফ সমধ্বনি বিশিষ্ট হয়ে থাকে, যেমন : رزم (রাযম্) ও بزم (বাযম্)।

আর সাজ্‘এ মুত্বাররাফ্- এর ক্ষেত্রে দুই পঙ্ক্তির বা দুই বাক্যের শেষ শব্দের শেষ হরফ পরস্পর সঙ্গতিশীল অর্থ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন : مال (মাাল্ - ধনসম্পদ) ও آمال (আমাাল্ - আশা- আকাঙ্ক্ষা)।

কোরআন মজীদের سجع - কে فَواصِل বলা হয় এ কারণে যে, সাজ্‘- এ অর্থ হচ্ছে শব্দের অধীন। অর্থাৎ শব্দগত মিল, তাল ও ঝঙ্কার ঠিক রাখতে গিয়ে অনেক সময় অর্থকে উৎসর্গ করতে হয়। অর্থাৎ যা যতোখানি বুঝাতে চাওয়া হয় তার চেয়ে কম প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়। কিন্তু ফাওয়াছ্বিল্ এ ধরনের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং কোরআন মজীদ যেহেতু জ্ঞান ও উপদেশে পরিপূর্ণ গ্রন্থ সেহেতু তা এ ধরনের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

(৬) تَجانُس (তাজাানুস্)। তাজানুস্ মানে অভিন্ন উৎস থেকে নিষ্পন্ন শব্দাবলী পাশাপাশি ব্যবহার করে কথার শক্তি, সৌন্দর্য ও ঝঙ্কার বৃদ্ধিকরণ। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. (যে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে তোমরাও তার বিরুদ্ধে চড়াও হও ঠিক যেভাবে সে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে)। (সূরাহ্ আল্-

বাক্বারাহ্ : ১৯৪।) তেমনি এরশাদ হয়েছে : ان المنافقين يخادعون الله و هو خادعهم. (নিঃসন্দেহে মুনাফিক্বরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে; আর এ কারণে তিনি তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন)। (সূরাহ্ আন্- নিসাা’ : ১৪২।)

(৭) تَصريف (তাছ্বরীফ্)। আভিধানিক অর্থে তাছ্বরীফ্ মানে কোনো কিছু গড়িয়ে নেয়া বা গড়িয়ে দেয়া। কিন্তু আরবী ব্যাকরণে তাছ্বরীফ্ মানে শব্দ প্রকরণ বা শব্দের রূপান্তর এ এতদ্বিষয়ক বিদ্যা। কোরআন মজীদে অত্যন্ত চমৎকারভাবে শব্দাবলীর রূপান্তর ঘটিয়ে তা যথাস্থানে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৮) تَضمين (তাযমীন্)। তাযমীন্- এর আভিধানিক অর্থ ‘নিশ্চয়তা বিধান’ বা ‘গ্যারান্টি প্রদান’। কিন্তু বালাগ্বাতে তাযমীন্ মানে নিজের বক্তব্যের মধ্যে অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করা এবং এমনভাবে উদ্ধৃত করা যে, তা যেন স্বীয় বক্তব্যের বাচনভঙ্গির সাথে খাপ খায় অথচ বোঝা যায় যে, অন্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যার বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তার নাম- পরিচয় উল্লেখ না করা সত্ত্বেও যদি ে াতার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে, কা’র বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তাহলে তার নাম- পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, অন্যথায় উল্লেখ করা অপরিহার্য। বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদে এ ধরনের বহু উদ্ধৃতি রয়েছে।

(৯) مُبالَغَة (মুবাালাগ্বাহ্)। মুবালাগ্বাহ্ মানে কোনো কিছুর চরম রূপ বা পুনরাবৃত্তিবাচক বা সীমাহীনতা বাচক রূপ। এ জন্য আরবী ভাষায় বিশেষ শব্দ- প্যাটার্ন (وزن - ওয়াযন্) রয়েছে যার ভিত্তিতে তরী বহু শব্দ কোরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : رحمان (রাহমাান্- পরম দয়াবান), غفار (গ্বাফফাার্ - পুনঃ পুনঃ ক্ষমাকারী), تواب (তাওয়াাব্ - বান্দাহদের প্রতি পুনঃ পুনঃ সুদৃষ্টিকারী), علام (‘আল্লাাম্ - মহাজ্ঞানী), غفور (গ্বাফূর্- সদাক্ষমাশীল), شكور (শা র্ - অনবরত বান্দাহর ভালো কাজের ভ প্রতিদান প্রদানকারী), ودود (ওয়াদূদ্

- বান্দাহর জন্য মহাপ্রেমময়), قدير (ক্বাদীর্ - চিরক্ষমতাশালী), رحيم (রাহীম্ - বিশেষ দয়াবান), عليم (‘আলীম্ - সদাজ্ঞানী) ইত্যাদি। এছাড়া মুবালাগ্বাহ্ বাচক শব্দ ব্যবহার ছাড়াও কেবল বাক্যের সাহায্যেও কোরআন মজীদে মুবালাগ্বাহ্ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন : لا اله الا هو خالق كل شيء. (তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই; তিনি সকল জিনিসের স্রষ্টা)। (সূরাহ্ আল্-আন্‘আম্ : ১০২।)

(১০) حُسن بَيان (হুসনে বায়ান্)। সূক্ষ্ম ও গভীরে নিহিত বিষয়কে প্রকাশ করাই হচ্ছে হুসনে বায়ান্ বা কথার সৌন্দর্য। রুম্মানীর মতে, এর চারটি ভাগ রয়েছে : كلام (কালাম্ - কথা/ বক্তব্য), حال (হাল্ - অবস্থা/ পরিস্থিতি/ পরিবেশ/ প্রেক্ষাপট), اشارة (ইশারাহ্ - ইঙ্গিত) ও علامة (‘আলামাহ্ - নিদর্শন)। বাকসৌন্দর্যের এ সবগুলো দিকই কোরআন মজীদে সর্বোত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

সব কিছু মিলিয়ে বালাগ্বাতের তিনটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে কোরআন মজীদের একান্ত নিজস্ব স্তর; কোনো মানুষের কথাই এ স্তরে উপনীত হতে সক্ষম নয়।

কোরআনকে জাদু বলার কারণ

এ প্রসঙ্গে মক্কাহর মোশরেকদের পক্ষ থেকে কোরআন মজীদকে জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বলা বাহুল্য যে, জাদুবিদ্যার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার আছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সম্মোহনী মানসিক শক্তির দ্বারা অন্যকে নিয়ন্ত্রিত ও নিজের ইচ্ছাধীন করে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা। এর আরেকটি কাজ হচ্ছে যা বাস্তবে নেই বা ঘটছে না তাকে আছে বা ঘটছে বলে দেখানো। অবশ্য জাদুর এ দ্বিতীয়োক্ত প্রভাব হয় খুবই স্বল্পস্থায়ী। খুব তাড়াতাড়ি জাদুর ঘোর কেটে যায় এবং সাথে সাথে প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে স্বয়ং জাদুকররাও স্বীকার করে থাকে যে, তারা যা দেখাচ্ছে তা হচ্ছে জাদু; প্রকৃত নয়।

কিন্তু জাদুবিদ্যার দ্বারা যে কোনো কাল্পনিক মায়াদৃশ্যই দেখানো সম্ভব হোক না কেন, এর সাহায্যে কোরআন মজীদের মতো গ্রন্থ রচনা সম্ভব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জাদুবিদ্যার সাহায্যে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মানদণ্ডে উচ্চতম স্তরের এবং সেই সাথে জ্ঞান- বিজ্ঞান ও তত্ত্ব- দর্শনে পরিপূর্ণ এমন একখানি অনন্যসুন্দর সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর গ্রন্থ রচনা তো দূরের কথা, মানব প্রজাতির পুরো ইতিহাসে কোনো দিন কোথাও একটি সাধারণ সুখপাঠ্য গ্রন্থও রচিত হবার কথা কারো জানা নেই। স্বয়ং জাদুকররাও এমন দাবী কোনোদিন পেশ করে নি। বস্তুতঃ এটা আদৌ জাদুবিদ্যার আওতাভুক্ত কোনো বিষয় নয়। কারণ, মানুষের দ্বারা যে কোনো বিষয়ে উঁচু মানের গ্রন্থ রচনার বিষয়টি প্রতিভা ও চর্চার ওপর নির্ভরশীল; জাদুবিদ্যাবলে কারো মধ্যে প্রতিভাসৃষ্টি বা চর্চার অভাব পূরণ আদৌ সম্ভব নয়।

এ কারণে স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন জাগে যে, আরবদের মোশরেকদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে ওয়ালীদ বিন্ মুগ্বীরাহর ন্যায় ে ষ্ঠ বালীগ্ব্ ও ফাছ্বীহ্ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরআন মজীদকে জাদু হিসেবে অভিহিত করার উদ্দেশ্য কী এবং এহেন ভিত্তিহীন দাবী অন্ততঃ কিছু লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে - তাদের পক্ষ থেকে এমনটা আশা করার পিছনে কী বাস্তবতা নিহিত ছিলো?

যেহেতু বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের বিচারে কোরআন মজীদ চরমতম উন্নত অবস্থানের অধিকারী সেহেতু তৎকালীন আরবের বালীগ্ব্ ও ফাছ্বীহ্ ব্যক্তিদের পক্ষে তার মোকাবিলা করা এবং তার সাথে তুলনীয় গ্রন্থ রচনা তো দূরের কথা, তার সূরাহর সাথে তুলনীয় একটি ছোট্ট সূরাহ্ও রচনা করা সম্ভব হয় নি। এমতাবস্থায় তারা যে কোরআন মজীদকে মানুষের রচিত অর্থাৎ হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর নিজের রচিত বলে দাবী করেছিলো তা লোকদেরকে বিশ্বাস করানো সম্ভব ছিলো না। যেহেতু রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) লিখতে- পড়তে জানতেন না সেহেতু তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন এ কথা বলে তারা আদৌ সুবিধা করতে পারে নি।

এমতাবস্থায় তারা একেক সময় এর একেক ধরনের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করতো। বিশেষ করে তারা অনেক সময় এ ব্যাপারে এমন ধরনের হাস্যষ্কর উক্তি করতো যা কোনো লোকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হবার কারণ ছিলো না। নিরক্ষর নবী করীম (ছ্বাঃ) কীভাবে এহেন কোরআন পেশ করতে সক্ষম হচ্ছেন? - এর একটি যৌক্তিক (!) ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে গিয়ে কোনো কোনো সময় তারা দাবী করতো যে, কেউ একজন রাতের বেলা মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে কোরআন শিক্ষা দিয়ে যায় আর তা- ই তিনি দিনের বেলা পড়ে শোনান। অথচ কোরআন মজীদের মতো গ্রন্থ কোনো ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা সম্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তা নবী করীম (ছ্বাঃ)কে শিক্ষা দেয়ার কোনো কারণ ছিলো না। কারণ, এহেন অত্যুন্নত গ্রন্থ পেশ করে সে নিজেই আরব জাহানের ইতিহাসের ে ষ্ঠতম জ্ঞানী, বালীগ্ব্ ও ফাছ্বীহর মর্যাদা দখল করতে পারতো।

কোরআন মজীদকে মোকাবিলা করতে তাদের ব্যর্থতার এবং এ ধরনের অযৌক্তিক ও হাস্যকর দাবীর অসারতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন মজীদকে খোদায়ী কালাম্ হিসেবে স্বীকার করার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া, নিজেদের পরাজয় ও ব্যর্থতা চাপা দেয়া এবং লোকদেরকে কোরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য কোরআন মজীদকে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ তথা ভাষা- সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার্য বিষয়াদির আওতাবহির্ভূত একটি বিষয় হিসেবে দেখানো অপরিহার্য ছিলো। এ কারণেই তারা কোরআন মজীদকে জাদু হিসেবে আখ্যায়িত করে।

অর্থাৎ তারা আরব জনগণকে বুঝাতে চাচ্ছিলো : ‘কোরআন হচ্ছে জাদু, আর আমরা জাদুকর নই বিধায় তার মোকাবিলা করতে পারছি না।’

অবশ্য যে কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের পক্ষেই এ অপযুক্তির অসারতা ও এ প্রতারণা বুঝতে পারা কঠিন ছিলো না। কিন্তু যেহেতু তৎকালীন আরবে জাদুবিদ্যার তেমন প্রচলন ছিলো না, সেহেতু জাদুবিদ্যার ক্ষমতা ও আওতা সম্বন্ধে তাদের তেমন ধারণা ছিলো না। এ কারণে অন্ততঃ কিছু লোক ধরে নিয়েছিলো যে, ওয়ালীদ বিন্ মুগ্বীরাহ্ প্রমুখের কথাই ঠিক; কোরআন একটি জাদু এবং হয়তোবা জাদুবিদ্যার মাধ্যমে সুন্দর ও উঁচু মানের গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর।

অবশ্য এ ব্যাপারে মক্কাহর মোশরেক্ নেতাদের পক্ষ থেকে আরো একটি কপট যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিলো। ‘আল্লামাহ্ ‘আব্দুল্ ক্বাহের্ জুরজানী তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ আশ্- শা◌াফীয়্যাতু ফীল্ ই‘জায্- এ উল্লেখ করেছেন যে, ওয়ালীদ্ বিন্ মুগ্বীরাহ্ কোরআন মজীদকে জাদু নামে অভিহিত করার পর বলেছিলো : “কারণ সে [মুহাম্মাদ সাঃ)] বেবিলনের জাদুকরদের ন্যায়ই স্বামী- স্ত্রী, ভাই- ভাই ও পিতা- পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম।”

‘আল্লামাহ্ জুরজানী আরো উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালীন মক্কাহর কাফেরদের মধ্যকার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ‘উতবাহ্ বিন্ রাবী‘আহ্ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে বলেছিলো : “তুমি আমাদের ক্বুরাইশদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছো।”

এখানে উল্লেখ্য যে, কেনো মানুষের কাছে যখন সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে যে, কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা‘আলার নাযিলকৃত গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল, তখন তার পক্ষে তাঁর ওপরে ঈমান আনা ও তাঁর দলভুক্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এমতাবস্থায় কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষেই নবী করীম (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদের কাছে আ য় গ্রহণ না করা সম্ভব যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির পূজারী এবং সত্যকে গ্রহণ করা ও না- করার বিষয়ে পার্থিব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

এভাবে অনেক সময় একই পরিবারের দুই ব্যক্তি আদর্শিক কারণে দুই বিপরীত মেরুতে চলে যাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং তারা দুই

শত্রুশিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এটা ছিলো খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। দুনিয়ায় আদর্শিক ইতিহাসে সব সময়ই কমবেশী এমনটি ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এর সাথে পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে জাদুবিদ্যার সাহায্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কোনো তুলনা চলে কি? বরং কোরআনকে জাদু আখ্যাদানকারী ব্যক্তিরা কেবল সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই কোরআনের বিরুদ্ধে এহেন মিথ্যা দোষারোপ করেছিলো যা তারা নিজেরাই বিশ্বাস করতো না। বস্তুতঃ এ ধরনের অভিযোগ তুলে কার্যতঃ তারা প্রকারান্তরে তাদের পরাজয় ও ব্যর্থতাকে এবং কোরআন মজীদের খোদায়ী কিতাব্ হওয়াকেই স্বীকার করে নিয়েছিলো।

কোরআনের অলৌকিকতা

(ই‘জাযুল্ কোরআন)

ই‘জায্- এর তাৎপর্য

আরবী অভিধানে اعجاز (ই‘জা্য্) পরিভাষাটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

(১) কোনো কিছু হাতছাড়া হওয়া। যেমন, বলা হয় : اعجزه الامرُ الفلانى - “অমুক বিষয়টি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।”

(২) অন্যের মাঝে অক্ষমতা লক্ষ্য করা। যেমন, বলা হয় : اعجزت زيداً - “আমি যায়েদকে অক্ষম দেখতে পেলাম।”

(৩) অপর পক্ষকে অক্ষম করে দেয়া। এ ক্ষেত্রে اعجاز কথাটি تعجيز (তা‘জীয্) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : اعجزت زيداً - “আমি যায়েদকে অক্ষম করে দিলাম।”

কিন্তু কালামশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় ই‘জায্- এর মানে হচ্ছে : যিনি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো পদে মনোনীত হয়েছেন বলে দাবী করেন, তিনি তাঁর এ দাবীর সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক আইনের ব্যতিক্রমে এমন কোনো কাজ সম্পাদন করেন যা সম্পাদনে অন্যরা অক্ষম (عاجز - ‘আজেয্) হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় এ অসাধারণ কাজকে معجزة (মু‘জিযাহ্ - অলৌকিক কাজ) এবং এ কাজ সম্পাদন করাকে “ই‘জায্” (اعجاز - অলৌকিক কাজ সম্পাদন) বলা হয়।

[উল্লেখ্য, ‘আক্বাএদের অর্থাৎ ঈমানের তিনটি মূল বিষয় তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াত এবং এর শাখাগত অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কিত বিস্তারিত শাস্ত্রকে علم كلام (‘ইলমে কালা্ম) এবং এ শাস্ত্রের পণ্ডিতকে متكلم (মুতাকাল্লিম্ - কালাম্শাস্ত্রবিদ) বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলার

কালাম্ তাঁর সত্তাগত গুণ, নাকি কর্মগত গুণ - এ প্রশ্নে দীর্ঘ বিতর্ক থেকে এ শাস্ত্রের উদ্ভব বিধায় পুরো শাস্ত্রটির নামই علم کلام হয়েছে - এটাই প্রধান মত।]

মু'জিযাহর শর্তাবলী

কোনো অসাধারণ কাজকে কেবল তখনই মু'জিযাহ্ বলা হয় যখন তাতে নিম্নোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে :

(১) তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো পদে মনোনীত হয়েছেন বলে দাবী করেন এবং তাঁর এ দাবীর সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে উক্ত অসাধারণ কাজ সম্পাদন করেন।

(২) এ ব্যক্তি নিজের জন্য যে পদ দাবী করছেন তা মানবিক বিচারবুদ্ধির বিচারে মানুষের জন্য সম্ভব বলে গণ্য হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি নিজের জন্য এমন কোনো পদ দাবী করে যে দাবী মিথ্যা হবার ব্যাপারে বিচারবুদ্ধি অভ্রান্ত, সুনিশ্চিত ও অকাট্য দৃঢ়তার সাথে রায় প্রদান করে, তাহলে এমতাবস্থায় সে তার দাবী প্রমাণ করার জন্য যে কাজই সম্পাদন করুক না কেন, না সে কাজ তার দাবীর সত্যতার প্রমাণ রূপে গণ্য হবে, না সে কাজকে মু'জিযাহ্ বলা যাবে, তা অন্যরা সে কাজ সম্পাদনে যতোই অক্ষম প্রমাণিত হোক না কেন। যেমন : কেউ যদি খোদায়ী দাবী করে, সে ক্ষেত্রে এ দাবীতে তার সত্যবাদী হওয়া পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, বিচারবুদ্ধির অভ্রান্ত ও অকাট্য রায়ই এ ব্যাপারে তার মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে পদ দাবী করা হচ্ছে তা শর'ঈ (ধর্মীয়) দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো পদের দাবী করে যে ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ও অকাট্য ধর্মীয় দলীলের ভিত্তিতে তার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়, সে ক্ষেত্রেও তার দ্বারা অসাধারণ কাজ সম্পাদন তার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করবে না এবং তার ঐ কাজকে মু'জিযাহ্ বলা যাবে না। যেমন : কেউ যদি রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর পরে নবুওয়াতের দাবী করে, তাহলে সে তার এ দাবীতে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। কারণ, কোরআন মজীদের ঘোষণা এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ও আহলে বাইতের নিষ্পাপ ইমামগণের ('আঃ) পক্ষ

থেকে আমাদের নিকট যে সব ছুহীহ্ হাদীছ ও রেওয়াইয়াত্ পৌঁছেছে তদনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার সাথে সাথেই নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে আর কেউ নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবেন না। [রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর শেষ নবী হওয়ার প্রমাণ অত্র গন্থের 'কোরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল হলো' অধ্যায়ের 'রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) ও কোরআনের বিশ্বজনীনতা' উপশিরানামে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, بعثت (বি'ছাত) মানে উত্থান ঘটানো, জাগ্রত করা, অনুপ্রাণিত করা এবং পারিভাষিক অর্থে অভিষেক। বলা বাহুল্য যে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর শেষ নবী হিসেবে আগমনের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিপরিকল্পনাতেই নির্ধারিত ছিলো; এ ব্যাপারে মসলমানদের বিভিন্ন হাদীছে ও বারনাবাসের ইনজীলে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত আছে। এ কারণেই নবী হিসেবেই তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু তাঁর এ নবুওয়াতের বিষয়টি তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে একটি নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয় এবং তাঁকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। একেই بعثت বলা হয়। এর দিন- তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। যদি তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রদানের কথা জানানো ও পুরো কোরআন মজীদ তাঁর হৃদয়ে নাযিল করার ঘটনা একই সময় হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তা ছিলো লাইলাতুল ক্বাদরে, আর যদি তা ভিন্ন ভিন্ন দিনে হয়ে থাকে তাহলে তাঁর بعثت হয় এর আগে; কোনো কোনো মতে ২৭শে রজব তারিখে (এবং এর দশ বছর পরে এ তারিখেই তিনি মি'রাজ গমন করেন)।

অতএব, বিচারবুদ্ধির রায় অথবা অকাট্যভাবে নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিযোগ্য দলীলের মাধ্যমে নতুন নবুওয়াতের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবার পর এ মিথ্যা পদের দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না। আর যেহেতু বিচারবুদ্ধির দলীল বা উদ্ধৃতিযোগ্য দলীলের মাধ্যমেই তার দাবী মিথ্যা হওয়ার দাবীটি সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু তার দাবী যে মিথ্যা - এটা আলাদাভাবে প্রমাণ করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যরূরী নয়।

[কোনো বিষয় প্রমাণের জন্য দুই ধরনের বা এ দুই ধরনের মধ্য থেকে যে কোনো এক ধরনের দলীল- প্রমাণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। তা হচ্ছে : (১) বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্)- এর রায় অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগ। ‘আক্বল্ থেকে নিস্পন্ন প্রমাণ হিসেবে একে ‘বিচারবুদ্ধির দলীল’ (دليل عقلى) বলা হয়। (২) বিতর্কে লিপ্ত উভয় পক্ষ বা আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট সমানভাবে বা প্রায় সমানভাবে গ্রহণযোগ্য লিখিত বা মৌখিকভাবে বর্ণিত বক্তব্য। উদ্ধৃত করা সম্ভব বিধায় এ ধরনের দলীলকে ‘উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল’ (دليل نقلى) বলা হয়। যেমন : মুসলমানদের সকল ফিরক্বাহ্ ও মাযহাবের নিকট কোরআন মজীদ ও মুতাওয়াতির্ হাদীছ (যে হাদীছ বর্ণনার প্রতিটি স্তরে এতো বেশী সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে তাদের পক্ষে মিথ্যা রচনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়)।]

(৪) সংঘটিত অসাধারণ কাজটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্যতা প্রমাণকারী হতে হবে, তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণকারী হবে না। অতএব, কেউ যদি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো পদে মনোনীত হয়েছে বলে দাবী করে এবং সে দাবী প্রমাণের জন্য কোনো অসাধারণ কাজ সংঘটিত করে - যা সম্পাদনে অন্যরা অক্ষম, কিন্তু তা তার সত্যবাদিতার পরিবর্তে মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করে, তাহলে তাকে মু‘জিযাহ্ বলা হবে না।

এ ব্যাপারে মুসায়লামাহর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ণিত আছে যে, নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামাহ্ তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পের পানি বৃদ্ধি করবে (পানির স্তর আরো উপরে তুলে আনবে) বলে তার মুখের থুথু একটি পে নিক্ষেপ করে। কিন্তু এর ফল হয় বিপরীত; পানি বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে পটি কিয়ে যায়। এছাড়া সে হুনাইফাহ্ গোত্রের কতক শি র মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং আরো কিছু কাজ করে - যার ফলে প্রথমোক্তদের মাথায় টাক পড়ে যায় এবং অপর একদল তোৎলা হয়ে যায়।

এ ধরনের অবস্থায় যেহেতু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজই তার মিথ্যাবাদিতা ও তার দাবীর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো পন্থায় তার দাবীর অসত্যতা প্রমাণ করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যরূরী নয়।

(৫) সংশ্লিষ্ট কাজ কোনো ধরনের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, কারিগরী বিদ্যা ও শিল্পদক্ষতার ওপর ভিত্তিশীল হবে না এবং তা শিক্ষাদান বা শিক্ষা করার উপযোগী হবে না। কেউ যদি কোনো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল বা শিল্পদক্ষতার ভিত্তিতে কোনো অসাধারণ কাজ সম্পাদন করে, সে ক্ষেত্রে ঐ কাজকে মু'জিযাহ্ বলা যাবে না, তা অন্যরা এ কাজ সম্পাদনে যতোই না অক্ষম হোক। এমনকি এ ক্ষেত্রে মু'জিযাহর অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলেও এই শর্তটি পূরণ না হওয়ায় তা মু'জিযাহ্ রূপে গণ্য হবে না।

অতএব, জাদুকর, ম্যাজিশিয়ান ও বিজ্ঞানের কোনো কোনো রহস্যের সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা যে সব অসাধারণ কাজ সম্পাদন করে তা মু'জিযাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ সব কাজকে ভণ্ডুল করে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার মিথ্যা দাবীর অপরাধে অপদস্ত করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যরূরী নয়। কারণ, বিভিন্ন নিদর্শন থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কতোগুলো প্রাকৃতিক বিধি অনুযায়ী বজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এ সব কাজ সম্পাদিত হয়েছে - যা অর্জনযোগ্য এবং অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষেও তা শিক্ষা করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণে অনুরূপ ফল লাভ করা সম্ভব।

তবে হ্যা, এ জাতীয় কায়দা- কৌশল আয়ত্ত করা ও তার ভিত্তিতে অসাধারণ কাজ প্রদর্শন যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সহজ নয়। কিন্তু এ কথা প্রায় সকল জ্ঞান- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য। যেমন : কতক বিস্ময়কর ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ বিশেষ বশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া এবং তার মি ণপদ্ধতি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল - যার রহস্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক চিকিৎসকও অবগত নন এবং ঐ জাতীয় চিকিৎসা সম্পাদনে সক্ষম নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এহেন বিস্ময়কর চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে মু'জিযাহ্ বলা যাবে না।

এমনকি আল্লাহ্ তা‘আলা যদি সমগ্র মানব প্রজাতির মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিকেও এহেন বজ্ঞানিক বিধি, বস্তুর বশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া এবং সৃষ্টিজগতের জটিল রহস্যাবলী সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান দান করেন - যে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ চিন্তাও করতে পারে না, তাহলে তা কোনো অযৌক্তিক বা অনুচিত কাজ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। কারণ, কোনো ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত এহেন কাজ মু‘জিযাহর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো পদে মনোনীত হবার দাবী প্রমাণ করে না।

তবে হ্যা, যদিও সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তথাপি যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যদি মিথ্যাবাদীর দ্বারা মু‘জিযাহ্ সংঘটিত হতে দেন - যাতে উপরোক্ত সবগুলো শর্তই বজায় থাকবে এবং এভাবে যদি তিনি তার মিথ্যা দাবীর সপক্ষে স্বীকৃতি দেন তাহলে অবশ্যই তা হবে অনুচিত ও অযৌক্তিক কাজ। কারণ, সে ক্ষেত্রে মিথ্যাকে সত্যরূপে স্বীকৃতিদানের পরিণতিতে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা হবে। আর تعالی الله عن ذالک علواً کبیرا - এহেন গুরুতর বিষয় থেকে মহান আল্লাহ্ তা‘আলা মুক্ত ও পবিত্র।

মু‘জিযাহ্ নবুওয়াতের পৃষ্ঠপোষক

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বিচারবুদ্ধিজাত ও উদ্ধৃতিযোগ্য অকাট্য দলীলপ্রমাণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানব প্রজাতির জন্য দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিভিন্ন কর্মসূচী নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং তাদেরকে পূর্ণতা ও চিরন্তন সৌভাগ্যের দিকে পথপ্রদর্শন করা উচিত। কারণ, এ ক্ষেত্রে মানুষ খোদায়ী দায়িত্ব- কর্তব্য ও বিধি- বিধান এবং পথনির্দেশের জন্য পুরোপুরিভাবে মুখাপেক্ষী। এছাড়া পূর্ণতা ও সৌভাগ্যের কোনো স্তরেই সে কৃতকার্য হতে সক্ষম নয়।

মানুষের পূর্ণতা ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি স্বরূপ এ দায়িত্ব- কর্তব্য, বিধিবিধান ও পথনির্দেশ যদি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রদান করা না হয়, তাহলে মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে আল্লাহ্

তা'আলার অজ্ঞতা (না'উযূ বিল্লাহ্) ছাড়া এর পিছনে অন্য কোনো কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অজ্ঞতা ও নাওয়াকেফ অবস্থা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র।

অথবা এর কারণ হতে পারে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা চান না, মানুষ এহেন পূর্ণতা ও সৌভাগ্যের অধিকারী হোক। আর এ হচ্ছে কৃপণের বশিষ্ট্য - যা মহান দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে চিন্তাও করা যায় না।

অথবা এর কারণ হতে পারে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য পূর্ণতা ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করতে চান, কিন্তু তা নিশ্চিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আর এ হচ্ছে অক্ষম ও অসমর্থ- র বশিষ্ট্য - যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তাও করা যায় না।

অতএব, এটা অনস্বীকার্য যে, মানুষের পূর্ণতা ও সৌভাগ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আইন- বিধান ও দায়িত্ব- কর্তব্য নির্ধারণ এবং তা মানুষকে জানানো অপরিহার্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ উপসংহারে উপনীত হতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য আইন- বিধান ও দায়িত্ব- কর্তব্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। আর এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয় যে, মানব প্রজাতির মধ্যকার কোনো সদস্যের মাধ্যমেই এ বিধিবিধান মানুষকে অবগত করা উচিত এবং এই ব্যক্তির - যাকে নবী, রাসূল বা খোদায়ী দূত বলা হবে, তাঁর উচিত অন্যান্য মানুষকে তাদের পূর্ণতা ও সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত দায়িত্ব- কর্তব্য ও বিধিবিধান তথা হেদায়াতের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়া যাতে মানুষের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ হয়ে যায়; অতঃপর এ অকাট্য দলীল- প্রমাণের ভিত্তিতে যার ইচ্ছা সে সৌভাগ্য বরণ করে নিক, আর যার ইচ্ছা সে ধ্বংস ও বিপর্যয়কে গ্রহণ করে নিক।

[হুজ্জাত্ (حجة) মানে দলীল বা প্রমাণ। আর 'হুজ্জাত্ পূর্ণ করা' (اتمام حجة) মানে যুক্তিতর্ক, নিদর্শন বা অকাট্য দলীল উপস্থাপনের মাধ্যমে কোনো সত্যকে এমন অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সন্দেহ বা অস্পষ্টতার অবকাশ থাকবে না।]

অর্থাৎ অকাট্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা সত্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া এবং সত্যকে সত্যরূপে জানতে পারার পরেও যে ব্যক্তি জেদ, প্রবৃত্তিপূজার মানসিকতা ও পার্থিব স্বার্থের কারণে ধৃষ্টতামূলকভাবে সত্যের বিরোধিতা করে, অনন্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রেহাই পাবার জন্যে তার হাতে কোনোই যুক্তি থাকবে না। অন্যদিকে এতো বড় মহান, দয়ালু, মেহেরবান ও সর্বশক্তিমান প্রভুর আদেশ-নিষেধ পালন করার পুরস্কার যে সীমাহীন সৌভাগ্য হবে তাতেও সন্দেহ নেই। লক্ষণীয়, 'হুজ্জাত্' হচ্ছে এমন একটি উপকরণের ন্যায় যা কারো জন্য সৌভাগ্য ও কারো জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ; এ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পরিণতি নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(ليهلک من هلک عن بينة و يحيى من حى عن بينة)

"যাতে তিনি তাকে ধ্বংস করে দেন যে অকাট্য প্রমাণের দ্বারা নিজেকে ধ্বংস করেছে এবং তাকে সঞ্জীবিত করেন যে অকাট্য প্রমাণের দ্বারা নিজেকে সঞ্জীবিত করেছে।" (সূরাহ্ আল্-আনফাল্ : ৪২)

[بينة (বাইয়্যেনাহ্) ও হুজ্জাত্ উভয়ই সন্দেহ নিরসনকারী অকাট্য দলীল। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হুজ্জাত্ সাধারণতঃ ব্যক্তিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাইয়্যেনাহ্ মূলতঃ এমন দলীল যার অকাট্যতা সকলের জন্য সন্দেহাতীত এবং খুব সহজেই তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আল্লাহর কালাম, বিশেষ করে কোরআন মজীদ হচ্ছে বাইয়্যেনাহ্; অন্যান্য গ্রন্থ ও ছুহীফাহ্ বিকৃত ও পরিবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাইয়্যেনাহ্ ছিলো। (স্মর্তব্য, بيان ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে উদ্ভূত বিধায় بينة বলতে মূলতঃ কোনো কিছুর প্রমাণ সম্বলিত অকাট্য লিখিত বা মৌখিক বক্তব্যকে তথা খোদায়ী কালামকে বুঝায়।)

অন্যদিকে বিচারবুদ্ধির রায় ও মুতাওয়াতির হাদীছ হচ্ছে হুজ্জাত্ পর্যায়ভুক্ত, কারণ, তা পেশ করার সাথে সাথে সকলের কাছে তার অকাট্যতা সমভাবে সুস্পষ্ট না-ও হতে পারে এবং তা সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সকলের জন্য প্রস্তুত না-ও থাকতে পারে। কিন্তু কারো

সামনে যখন তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তখন তার জন্য তা গ্রহণ করা বাইয়্যেনাহর মতোই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেবল নেফাক্বের মানসিকতার কারণেই কেউ বাইয়্যেনাহ্ এবং নিশ্চিত হওয়ার পরেও হুজ্জাত্ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আর সে ক্ষেত্রে তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই থাকবে না।]

বলা বাহুল্য যে, নবুওয়াত ও ঐশী বার্তবাহকের পদ অত্যন্ত বিরাট মর্যাদার পদ। এ মর্যাদার দিকে বহু লোকেরই লোভাতুর দৃষ্টি থাকে এবং মিথ্যার আ য় করে হলেও তারা মানুষের কাছে নবীর মর্যাদা লাভের লালসা পোষণ করে। এ কারণেই এ পদের দাবীদারের জন্য স্বীয় দাবীর সপক্ষে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা অপরিহার্য যাতে প্রতারক, মিথ্যা দাবীদার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির নায়করা এ পদমর্যাদার অপব্যবহার করতে না পারে এবং নিজেদেরকে এর যথার্থ দাবীদার ও সত্যিকারের ঐশী পথপ্রদর্শকরূপে তুলে ধরে মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে। তাই ঐশী পদের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তিরা অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব এমন অসাধারণ কাজ সম্পাদন করতে পারে বিধায় মানুষের আয়ত্তাধীন অসাধারণ কাজ এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

অতএব, ঐশী পদের দাবীদারকে স্বীয় দাবীর সপক্ষে এমন কাজ সম্পাদন করতে হবে যা প্রাকৃতিক বিধানকে ভঙ্গ করবে এবং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম পন্থায় সংঘটিত হবে, আর এভাবে অনুরূপ কাজ সম্পাদনে অন্যদের অক্ষমতা প্রমাণ করে দেবে।

কেবল নবুওয়াতের প্রমাণ ও পৃষ্ঠপোষকতা হিসেবে সংঘটিত এ ধরনের অসাধারণ ঘটনাই হচ্ছে মু'জিযাহ্। পারিভাষিকভাবে মু'জিযাহ্ বা অলৌকিকতা বলতে কেবল এ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত এ ধরনের কাজকেই বুঝানো হয়, যে কোনো উদ্দেশ্যে সম্পাদিত যে কোনো অসাধারণ কাজকে নয়।

নবুওয়াত প্রমাণে মু‘জিযাহ্র ভূমিকা

যেহেতু ই‘জায্ বা মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন মানে প্রাকৃতিক বিধানের লঙ্ঘন এবং এতে সৃষ্টিজগতে কার্যকর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় সেহেতু মহান আল্লাহ্ তা‘আলার অনুমতি ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারো পক্ষ থেকে তা সংঘটিত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গ্বায়েবী (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত বহির্ভূত) ও খোদায়ী শক্তির ভূমিকা না থাকলে কারো পক্ষেই এহেন অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

অতএব, কেউ যদি নবুওয়াত দাবী করেন এবং আল্লাহ্ তা‘আলাও তাঁকে সহায়তা প্রদান করেন ও তাঁকে মু‘জিযাহ্র অস্ত্রে সুসজ্জিত করেন, সে ক্ষেত্রে নবুওয়াতের দাবী মিথ্যা হওয়ার মানে হচ্ছে মানুষকে অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়া এবং মিথ্যার প্রবর্তন ও তাকে সত্য বলে প্রত্যয়ন। আর এ ধরনের কাজ মহাজ্ঞানময় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব; কখনোই কোনো অবস্থাতেই তাঁর পক্ষ থেকে এহেন কাজ সংঘটিত হবে না।

সুতরাং কারো পক্ষ থেকে যদি মু‘জিযাহ্ প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই তা তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণকারী এবং তা যে আল্লাহ্ তা‘আলার অনুমতিক্রমেই সংঘটিত হয়েছে তারও প্রমাণ বহনকারী। আর এ হচ্ছে এমন এক সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত সত্য যা জ্ঞানী ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী যে কোনো ব্যক্তির নিকটই নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য এবং এ বিষয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেন না।

উদাহরণস্বরূপ : কেউ যদি দেশের শাসকের পক্ষ থেকে এমন কোনো সম্মানজনক পদে নিয়োজিত হয়েছে বলে দাবী করে যে পদে কোনো সাধারণ নাগরিককে মনোনয়ন দেয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু মানুষ যদি তার দাবী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে সে ক্ষেত্রে নিজের দাবী প্রমাণের লক্ষ্যে এমন কোনো দলীল- প্রমাণ বা নিদর্শন উপস্থাপন করা তার জন্য অপরিহার্য যা জনগণের মন থেকে সন্দেহ- সংশয় দূর করতে এবং তাদের মাঝে তার অবস্থানকে সুসংহত করতে সক্ষম হবে। এমতাবস্থায় শাসকের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার ব্যক্তি যদি তার দাবীর সত্যতা প্রমাণের

লক্ষ্যে বলে : 'আগামী কালই আমার প্রতি শাসকের আন্তরিকতা ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং তিনি তাঁর অন্যান্য প্রতিনিধি ও দূতকে যে ধরনের উপহার প্রদান করে থাকেন তেমনি এক শাসকসুলভ বিশিষ্ট উপহার প্রদান করে আমাকে গৌরবান্বিত করবেন।' আর ঐ ব্যক্তি ও জনগণের মধ্যকার বিতর্ক সম্পর্কে দেশের শাসকও যদি অবহিত থাকেন এবং তা সত্ত্বেও উক্ত সুনির্দিষ্ট দিনেই তাকে উক্ত উপহার প্রদানে সম্মানিত করেন, তাহলে শাসকের পক্ষ থেকে সম্পাদিত এ কর্ম নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব দাবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী হবে।

এরূপ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞানবান কোনো লোকের পক্ষেই ঐ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব দাবীর ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করা এবং তার কাজকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলে ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ, স্বীয় জনগণের কল্যাণকামী যে কোনো জ্ঞানবান ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন শাসকের পক্ষেই কোনো মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ব্যক্তির মিথ্যা দাবীর সত্যতা প্রতিপাদন এবং এভাবে তাকে ফিতনাহ্- ফাসাদ, বিপর্যয় সৃষ্টি ও দুষ্কৃতির জন্য সুযোগ তরী করে দেয়া এবং ধোঁকা- প্রতারণার কাজে তাকে সাহায্য- সহযোগিতা করা অত্যন্ত অশোভন ও জঘন্য কাজ। তাই কোনো শাসকই এ ধরনের কাজ করেন না।

আর যে ধরনের কাজ একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায় না, পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সে ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া নিঃসন্দেহে অসম্ভব। কোরআন মজীদেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(و لو تقوّل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين)

"আর তিনি (রাসূল) যদি আমার নামে (নিজ থেকে বানিয়ে) কোনো কথা বলতেন তাহলে আমি (আমার কুদরাতী হাতের দ্বারা) তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম (তাঁকে পাকড়াও করতাম) এবং এরপর তাঁর ঘাড়ের শাহরগ ছিঁড়ে ফেলতাম (তাঁর মৃত্যু ঘটাতাম)।" (সূরাহ্ আল্- হাক্কাহ্ : ৪৪- ৪৬)

এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে : 'মুহাম্মাদ - যাকে আমি নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছি, অতঃপর তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিপাদন করেছি ও তাঁর মাধ্যমে বিভিন্ন মু'জিযাহর

বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি, তিনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে আমার নামে কোনো কথা বলতে পারেন না। আর তা অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিতে হয় যে, স্বাধীন এখতিয়ার বিলুপ্ত না হওয়ার কারণে তিনি এ ধরনের বানানো কথা বলতে পারেন, সে ক্ষেত্রে তিনি এ ধরনের কথা বললে আমি আমার শক্তিবলে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। কারণ, তিনি আমার নামে মিথ্যা বললে তার মোকাবিলায় আমার নীরবতার মানে হতো মিথ্যাকে স্বীকৃতিদান ও সত্যায়ন এবং দ্বীন ও হেদায়াতের আদর্শের মধ্যে ভিত্তিহীন বিষয়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ দান। সেহেতু আমার দায়িত্ব হচ্ছে স্বীয় দ্বীন, শরী'আত্ ও আইন- বিধানকে ভিত্তিহীন বিষয় ও মিথ্যা থেকে রক্ষা করা এবং এ দ্বীনের আবির্ভাব পর্যায়ে যেমন একে আমি হেফাযত করেছি, তেমনি একে অবিকৃতভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান করাও আমার কর্তব্য।'

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তা হচ্ছে, মু'জিযাহ্ কেবল এমন ব্যক্তির নিকটই নবুওয়াতের প্রমাণ রূপে গণ্য হতে পারে যে ব্যক্তি 'আক্বল্ বা বিচারবুদ্ধির ভালো- মন্দ নির্ণয়ক্ষমতায় আস্থাশীল এবং এ পর্যায়ে 'আক্বল্- এর ফয়ছালা মেনে নেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কালাম্ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে বিকাশের সময় থেকে কালাম্ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিতর্ক চলে আসছে যে, মানুষের বিচারবুদ্ধি খোদায়ী ওয়াহীর সাহায্য ছাড়াই ভালো- মন্দ নির্ণয়ে সক্ষম কিনা। এ ব্যাপারে একটি মত হচ্ছে : মানুষের বিচারবুদ্ধি ভালো- মন্দ নির্ণয়ে সক্ষম নয়; মানুষ কেবল আল্লাহর প্রেরিত ওয়াহীর মাধ্যমেই ভালো- মন্দ নির্ণয়ে সক্ষম। অপর মত হচ্ছে : সুস্থ বিচারবুদ্ধি খোদায়ী ওয়াহীর সাহায্য ছাড়াই বড় বড় ও মৌলিক বিষয়ে ভালো- মন্দ নির্ণয়ে সক্ষম।

উদার- উন্মুক্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ উভয় মতের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কারণ, স্থান- কাল- পাত্র, জাতি- ধর্ম ও আস্তিক- নাস্তিক নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে কতোগুলো বিষয় ভালো ও কতগুলো বিষয় মন্দ বলে গণ্য করতে দেখা যায়। যেমন : সত্য বলা, পরোপকার, দুর্বলকে সহায়তা দান, অসহায়কে দয়া দেখানো, ছোটকে স্নেহ করা, বড়কে সম্মান দেখানো, খোশ মেজাজ,

বিনয়, নম্রতা, সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা, জ্ঞান, অন্যের অধিকার প্রত্যর্পণ, আমানতের হেফাযত, দেশ- জাতি- মানবতার জন্য আত্মত্যাগ, ইত্যাদি সকলের নিকটই ভালো ও পসন্দনীয় বলে গণ্য। অন্যদিকে মিথ্যা, চুরি ও পরস্ব অপহরণ, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্বলের ওপর অত্যাচার, কাপুরুষতা, লোভ- লালসা, হিংসা- বিদ্বেষ, দেশদ্রোহিতা, আমানতের খেয়ানত, নীচু মন, উগ্র মেজাজ, ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার ইত্যাদি সকলের নিকটই অপসন্দনীয় ও মন্দ রূপে গণ্য। এমনকি যারা নিজেরা এ সব দোষে দুষ্ট, তারাও অন্যের কাছ থেকে উপরোক্ত মন্দ আচরণ পাওয়া পসন্দ করে না। এ ব্যাপারে মুসলমান- কাফের ও আস্তিক- নাস্তিকে কোনোই পার্থক্য নেই।

বস্তুতঃ মানুষের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে ‘আক্বল্- এর স্থান ওয়াহীর আগে। কারণ, কেউ যখন নবুওয়াত দাবী করেন তখন সুস্থ বিচারবুদ্ধির (عقل سليم) অধিকারী মানুষ তার ‘আক্বল্- এর দ্বারা তাঁর অবস্থা বিচার করে। সে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পূর্বোক্ত উত্তম গুণগুলো (ও সর্বজনস্বীকৃত অন্যান্য ভালো গুণ) দেখতে পায় এবং সর্বজনস্বীকৃত মন্দ গুণগুলো অনুপস্থিত পায় তখন তার বিচারিবুদ্ধি রায় দেয় যে, এহেন ভালো লোক আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পর্কে এবং আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারেন না। তেমনি মু‘জিযাহ্ দর্শনেও সুস্থ বিচারবুদ্ধি রায় দেয় যে, এ ব্যক্তি অবশ্যই নবী। এভাবে যখন সে নবীর ওপর ঈমান আনে কেবল তখনই তার জন্য ওয়াহীর ভিত্তিতে ভালো- মন্দ নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে। তবে বলা বাহুল্য যে, বিচারবুদ্ধির ভালো- মন্দ নির্ণয় ক্ষমতার কারণে মানুষ ওয়াহী থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন হতে পারে না। কারণ, বিচারবুদ্ধি কতক প্রধান ও সুস্পষ্ট বিষয়ে সঠিক রায় দিতে পারে, সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে নয়। তাছাড়া বিচারবুদ্ধি অসুস্থ বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন কারণে সুস্থ বিচারবুদ্ধিও ভুল করতে পারে বা অসাবধানতাজনিত কারণে কতক বিষয় তার মনোযোগ এড়িয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওয়াহী থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

অন্যদিকে ওয়াহী থেকে যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণেও বিচারবুদ্ধির আ য় গ্রহণ করতে হয়।

মোট কথা, বিচারবুদ্ধির ভালো- মন্দ নির্ণয় ক্ষমতা এক অনস্বীকার্য ব্যাপার। আর এ ক্ষমতা অস্বীকার করলে কারো পক্ষে নবীকে নবীরূপে চেনা সম্ভব নয়।

মু'জিযাহর যথোপযুক্ততা

ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এমন কাজকে মু'জিযাহ্ বলা হয় যার মাধ্যমে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিধান লঙ্ঘন করা হয় এবং অন্যান্য মানুষ অনুরূপ কাজ সম্পাদনে অক্ষম থাকে। কিন্তু মু'জিযাহকে মু'জিযাহরূপে চিনতে পারা সকলের জন্য সহজ হয় না। বরং কেবল সেই লোকদের পক্ষেই মু'জিযাহ্ ও একই বিষয়ের বজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকুশলতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর যারা নিজেরা অনুরূপ বিষয়ের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পকলায় সুদক্ষ ও বিশেষজ্ঞ। কারণ, যে কোনো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যার বশিষ্ট্যাবলী ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে অন্য লোকদের তুলনায় অধিকতর অবগত থাকেন। ফলে তাঁদের পক্ষেই নির্ণয় করা সম্ভব যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি অন্যদের পক্ষে অর্থাৎ মানবিক যোগ্যতা- প্রতিভার দ্বারা সম্ভব অথবা সম্ভব নয়।

এ কারণেই দেখা যায়, জ্ঞানী- গুণী ও পণ্ডিত- বিজ্ঞানী লোকেরা অন্যদের তুলনায় অগ্রবর্তী হয়ে মু'জিযাহর সত্যতা স্বীকার করেন। অন্যদিকে অজ্ঞমূর্খ লোকেরা এবং সংশ্লিষ্ট মু'জিযাহ্ যে বিষয়ের সে বিষয়ের জ্ঞান- বিজ্ঞানে দক্ষতাবিহীন লোকেরা এ সম্পর্কে যে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করতে পারে। এ ধরনের লোকেরা সন্দেহ করে যে, নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি হয়তো এক ধরনের বজ্ঞানিক, কারিগরি বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এ কাজ সম্পাদন করেছেন যার রহস্য তারা না জানলেও সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষজ্ঞদের পক্ষে তা উদঘাটন করা সম্ভবপর। তাই তারা মু'জিযাহকে স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে বা এর ওপরে দেরীতে আস্থা স্থাপন করে অথবা সন্দেহের দোদুল দোলায় দুলতে থাকে।

এ কারণে, আল্লাহ্ তা'আলার মহাজ্ঞানময়তার দাবী হচ্ছে, নবী যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আগমন করবেন সে জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৎকালে প্রচলিত শিল্প বা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল মু'জিযাহ্ই তাঁকে দেয়া হবে। ধু তা- ই নয়, সংশ্লিষ্ট স্থান ও কালে যে বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত লোকের সংখ্যা বেশী বা যে বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রভাব বেশী তাঁকে অন্ততঃ প্রধান মু'জিযাহটি সে

বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয় থেকেই দেয়া হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞরা মু‘জিযাহটি প্রত্যক্ষ করে এবং তার সত্যতা অনুধাবন করে বুঝতে পারে যে, কোনো মানুষের পক্ষে এ কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব; অতঃপর তারা এ মু‘জিযাহর সামনে মাথা নত করে। আর এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ লোকের সংখ্যা বেশী হওয়ায় মু‘জিযাহ্ হুজ্জাত্ হিসেবে দৃঢ়তর ও সুস্পষ্টতর হয়। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা কম হলে মু‘জিযাহর সামনে তাদের নতি স্বীকার সত্ত্বেও লোকেরা সন্দেহ করতে পারে যে, হয়তো নবুওয়াতের দাবীদার ও উক্ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো গোপন যোগসাজস থেকে থাকবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী হলে ও সকলেই মু‘জিযাহর মোকাবিলায় অক্ষম প্রমাণিত হলে এ ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ফলে তা সাধারণ জনগণের জন্য হুজ্জাতে পরিণত হয়। এরপর তা প্রত্যাখ্যানের সপক্ষে তাদের ছাফাই গাওয়ার জন্য আর কিছু থাকে না।

এ সাধারণ নিয়ম ও স্বীয় মহাজ্ঞানময়তার কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (‘আঃ)কে লাঠি ও আলোকোজ্জ্বল হাত মু‘জিযাহ্ হিসেবে দিয়েছিলেন। কারণ, ঐ সময়কার মিসরে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। ফলে এ বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ অন্য সমস্ত মানুষের আগে হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহকে মু‘জিযাহ্ রূপে স্বীকার করে ও তাঁর ওপর ঈমান আনে। কারণ, তারা যখন দেখতে পেলো যে, হযরত মূসা (‘আঃ)- এর লাঠি অজগরে পরিণত হলো এবং তারা যে সব জাদু তরী করেছিলো তার সবগুলোকেই খেয়ে ফেললো, অতঃপর পুনরায় লাঠিতে পরিণত হলো, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, এ কাজ জাদু ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত, বরং কোনো অদৃশ্য ও ঐশী মহাশক্তিবলে এ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এ কারণেই তারা এ ঘটনার মু‘জিযাহ্ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয়ে উপনীত হতে সক্ষম হয় এবং ফির্‘আউনের প্রলোভন ও ভীতির সামনে আত্মবিক্রয়ের পরিবর্তে তারা হযরত মূসা (‘আঃ)- এর ওপর ঈমান আনে ও তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা ঘোষণা করে।

অন্যদিকে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর যুগে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করেছিলো এবং তৎকালীন চিকিৎসকগণ বিস্ময়কর ধরনের চিকিৎসাকর্ম সম্পাদন করতেন।

বিশেষ করে তৎকালীন গ্রীসের উপনিবেশ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো এবং উন্নতির শীর্ষে উপনীত হয়েছিলো। সেহেতু পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানময়তার দাবী ছিলো এই যে, তাঁকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে এবং সেখানকার জ্ঞানী-পণ্ডিতদের কাজের সাথে মিল রয়েছে এমন ধরনের মু'জিযাহ্ প্রদান করতে হবে।

এ কারণেই চিরজ্ঞানময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা ('আঃ)কে মৃতদের জীবন দান, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত রোগীদেরকে নিরাময় দান ও জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান- কে মু'জিযাহ্ হিসেবে দান করেন যাতে সংশ্লিষ্ট যুগের জনগণ জানতে পারে যে. এ কাজগুলো মানবীয় ক্ষমতা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষমতাবহির্ভূত এবং প্রচলিত জ্ঞান- বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এ সব কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়, বরং এ সব কাজ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিধির বহির্ভূত এবং তিনি কোনো অদৃশ্য সূত্র থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেই এ কাজগুলো করতে সক্ষম হয়েছেন।

আর তৎকালীন বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন জ্ঞান- বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার মধ্যে জাহেলী যুগের আরবদের মাঝে প্রচলিত একমাত্র শিল্প ছিলো বাগ্মিতা ও সাহিত্যসমৃদ্ধ বাচন শিল্প। ভাষার বলিষ্ঠতা, প্রাঞ্জলতা, ঝঙ্কার, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা - আরবী ভাষায় যাকে এক কথায় "বালাগ্বাত্" ও "ফাছ্বাহাত্" বলা হয় - এ সব দিকের বিচারে সে যুগে আরব জাতি ও আরবী ভাষা বিকাশের সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়েছিলো এবং তৎকালীন বিশ্বের সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাগ্মিতা ও কথাশিল্পের বিচারে তারা ব্যতিক্রমধর্মী স্থানের অধিকারী ছিলো ও এ জন্য সর্বত্র বিশেষভাবে খ্যাত ছিলো।

অন্যদিকে এ শিল্পে অগ্রবর্তিতা তাদের মধ্যে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে পরিগণিত হতো। এ কারণে তারা কবিতা ও বাগ্মিতার প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ মজলিসের আয়োজন করতো। এমনকি এ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে তারা মেলারও আয়োজন করতো। এ সব প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক গোত্রের ে ষ্ঠতম কবি ও বাগ্মীগণ তাঁদের ে ষ্ঠতম কবিতা ও ভাষণ পেশ

করতেন। আর উপযুক্ত বিচারকমণ্ডলী ৫ ষ্ঠতম কবি ও কথাশিল্পীদের বাছাই করতেন এবং সকলে তাঁদের প্রশংসা করতো।

আরবদের মধ্যে ৫ ষ্ঠতম কবি ও বাক্যবাগীশদের মর্যাদা ও প্রশংসা এবং উৎসাহ দানের প্রথা এমনই তুঙ্গে পৌঁছেছিলো যে, তৎকালীন ৫ ষ্ঠ কবিতা সমূহের মধ্য থেকে ৫ ষ্ঠতম সাতটি কবিতা বাছাই করা হয় এবং সোনার কালি দ্বারা লিখে তা কা'বাহ্ ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ কারণে এ সাতটি কবিতা "ঝুলন্ত সাত" (معلقة سبع) নামে খ্যাত হয়ে ওঠে। আর তখন থেকেই আরবী ভাষায় যে কোনো সুন্দর ও ৫ ষ্ঠ কবিতাকে 'ঝুলিয়ে রাখা সাত কবিতার সাথে' তুলনাকরণ ও 'সোনালী কবিতা' নামে অভিহিতকরণের প্রথা প্রচলিত হয়। (العمدة ١ / ٧٨.)

তৎকালীন আরব জনগণ কবিতা ও বাগ্মিতাকে যোগ্যতার মানদণ্ডরূপে গণ্য করতো। তারা ছিলো কবিতা ও বাগ্মিতার প্রেমিক। তাই প্রতিযোগিতার সময় ৫ ষ্ঠতম কবিতা ও ভাষণ নির্ণয়ের ভার দেয়া হতো "নাাবিগ্বাহ্ যুবিয়াানী"র ওপর। [نابغة ذبيانى - যুবিয়াানী একটি গোত্রের নাম। অসাধারণ প্রতিভার কারণে তিনি نابغة ذبيانى (যুবিয়াানী গোত্রের অসাধারণ প্রতিভা) নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।]

নাবিগ্বাহ্ যুবিয়ানী হজ্বের মওসূমে "ওক্বায্" মেলায় উপস্থিত হতেন এবং তাঁর জন্য লাল রঙের বিশেষ তাঁবু স্থাপন করা হতো। আরব উপদ্বীপের সর্বত্র থেকে কবি ও বাক্যবাগীশগণ এসে সেখানে সমবেত হতেন এবং নিজেদের সাহিত্যকর্ম তাঁর সামনে পেশ করতেন। আর তিনি স্বীয় মতামত প্রকাশ করতেন এবং ৫ ষ্ঠতম কবিতা ও ভাষণ বাছাই করে সংশ্লিষ্ট কবি ও বক্তার বুকে গৌরব- পদক পরিয়ে দিতেন। (شعراء النصر الله ٢/٦٤٠، طبع بيروت.)

যেহেতু তৎকালীন আরবদের পরিবেশ- পরিস্থিতি এ ধরনের ছিলো, সেহেতু খোদায়ী পরম জ্ঞানের দাবী ছিলো এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে অসাধারণ প্রকাশভঙ্গি সমৃদ্ধ কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ দেয়া হবে যাতে সর্বোত্তম প্রকাশভঙ্গির অধিকারী যে কোনো আরবই

কোরআন মজীদের অনুপম বাচনভঙ্গি, প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য ও সাহিত্যনৈপুণ্যের কাছে অক্ষমতায় নতজানু হতে বাধ্য হয় এবং যে কোনো বাগ্মী ও বাক্যবাগীশ কবিও কোরআনের ভাষাগত উৎকর্ষ ও মাধুর্যের সামনে অক্ষমতায় নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হন, আর যে কোনো মুক্তবিবেক ও ন্যায়বান ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতসারেই কোরআনের সামনে মাথা নত করে দেন এবং এর খোদায়ী ওয়াহী বা খোদায়ী কালাম্ হবার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে নেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনেক ইসলামী মনীষীই আরবদের মধ্যে ৎ ষ্ঠতম কাব্য ও বাগ্মিতার অপরিসীম মর্যাদাকে কোরআন মজীদের আরবী ভাষার ৎ ষ্ঠতম সাহিত্যমানের গ্রন্থ হবার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, অত্র গ্রন্থের ‘কোরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল হলো’ প্রবন্ধের ‘আরবী ভাষার বিকাশে খোদায়ী হস্তক্ষেপ’ উপশিরোনামে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ তা‘আলা শেষ নবীর (ছ্বাঃ) যুগ থেকে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের পথনির্দেশ সম্বলিত যে মহাগ্রন্থ পাঠাবেন তার জন্য সংক্ষিপ্ততম আয়তনে বিশালতম ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা অপরিহার্য ছিলো এবং এ কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনার মধ্যেই এহেন একটি ভাষার উদ্ভব ঘটানো এবং হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাবের যুগে তাকে উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর ও এ ভাষার সর্বোত্তম কবিতা ও ভাষণের উদ্ভব নিশ্চিতকরণ নিহিত রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে আমরা যে উপসংহারে উপনীত হয়েছি তা হচ্ছে বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায়।

এখানে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে কোরআন মজীদ ছাড়াও আরো অনেক মু‘জিযাহ্ দেয়া হয়েছিলো। যেমন : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং তাঁর নির্দেশে গোসাপের কথা বলা ও নুড়ি পাথরের তাসবীহ্ পাঠ ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর আনীত সমস্ত মু‘জিযাহর মধ্যে কোরআন মজীদ হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক দৃঢ়তর ও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। কারণ -

(১) তৎকালীন আরব জাতির লোকেরা ছিলো নিরক্ষর এবং সৃষ্টিরহস্য ও বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা- বিধি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হযরত নবী করীম

(ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত- প্রাপ্তি কালে আরবের হেজায্ অঞ্চলে - মক্কাহ্ নগরী যার অন্তর্ভুক্ত - অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিলো হাতে গণার পর্যায়ে। তাই সার্বিকভাবে তৎকালীন আরব জনগণকে নিরক্ষর বলাটা অতিশয়োক্তি নয়। ফলে তাদের পক্ষে কোরআন মজীদ বাদে অন্যান্য মু'জিযাহ্ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব সহকারে এ সব মু'জিযাহ্ পর্যবেক্ষণ করার খুবই সম্ভাবনা ছিলো। ফলে তারা এ সবকে, তারা জানে না এমন কতোগুলো প্রাকৃতিক কার্যকারণের ওপর ভিত্তিশীল বা এমন কোনো শিল্পকৌশল যে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই - বলে মনে করতে পারতো। আর যেহেতু জাদুবিদ্যার মাধ্যমে এক ধরনের অস্বাভাবিক কাজ দেখানো সম্ভব সেহেতু তারা এ সব মু'জিযাহকে জাদু বলে মনে করতে পারতো। কিন্তু কোরআন মজীদের অসাধারণ প্রকাশভঙ্গি ও সাহিত্যনৈপুণ্যের কারণে এর মু'জিযাহ্ হওয়া সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় নি। কারণ, তারা নিজেরা আরবী ভাষার প্রকাশভঙ্গি, সাহিত্যিনৈপুণ্য ও বর্ণনামাধুর্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলো এবং এ ভাষার রহস্যাবলী তাদের কাছে উন্মোচিত ছিলো।

(২) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর অন্যান্য মু'জিযাহ্ ছিলো সাময়িক। তাই তা মু'জিযাহ্ হিসেবে সর্বকালীনভাবে উপস্থাপনযোগ্য ছিলো না। প্রদর্শনের পর কিছুদিনের মধ্যেই তা ইতিহাসের ঘটনায় পরিণত হয় যা পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের নিকট বর্ণনা করতেন। পূর্ববর্তী সকল নবী- রাসূলের ('আঃ) প্রদর্শিত সকল মু'জিযাহ্ই এ পর্যায়ের এবং সেগুলোর কোনোটিই বর্তমানে নেই; কোনোটিই জীবন্ত মু'জিযাহ্ নয়। কিন্তু কোরআন মজীদ ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত থাকবে এবং এর অলৌকিকত্বও অবিনশ্বর।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে চাই যে, আজকালকার অনেক লেখক হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর প্রদর্শিত অন্যান্য মু'জিযাহর প্রতি সন্দেহ ও অস্বীকৃতির দৃষ্টিতে তাকান। তাই তাঁকে কোরআন মজীদ ছাড়াও আরো যে বহু মু'জিযাহ্ দেয়া হয়েছিলো - এ সত্যটি পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা হয়েছে।

কোরআন অবিনশ্বর মু'জিযাহ্

যে কেউ ইসলামের ইতিহাস ও কোরআন মজীদের সাথে পরিচিত, সে-ই সন্দেহাতীতভাবে জানে এবং প্রত্যয় পোষণ করে যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) বিশ্বের সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে ইসলামের প্রতি দাও'আত দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোরআন মজীদকে উপস্থাপন করে তাদের ওপর হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ করেন, কোরআনের মু'জিযাহর মাধ্যমে সংগ্রামের ময়দানে পদার্পণ ও পদচারণা করেন এবং (আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে) সুউচ্চ ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করেন যে, সবাই যেন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কোরআন মজীদের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করে নিয়ে আসে; তাহলে তিনি তাঁর নবুওয়াতের দাবী থেকে বিরত থাকবেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এ চ্যালেঞ্জের মাত্রা বহু নীচে নামিয়ে আনেন এবং কোরআন মজীদের সূরাহ্ সমূহের অনুরূপ কয়েকটি সূরাহ্ উপস্থাপনের আহবান জানান। এরপর এ চ্যালেঞ্জকে আরো সহজতর করে ধু একটি সূরাহ্ উপস্থাপনের আহবান জানান। আর এভাবেই চ্যালেঞ্জ সহকারে তিনি তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন; এ চ্যালেঞ্জ ও এ সংগ্রাম অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে এবং ক্বিয়ামত্ দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

যেহেতু তৎকালীন আরবরা প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা, প্রাঞ্জলতা, বাগ্মিতা, সাহিত্যময়তা ও কাব্যের দিক থেকে বিশেষজ্ঞত্বের অধিকারী ছিলো, বরং এক ধরনের অসাধারণত্বের অধিকারী ছিলো, সেহেতু কোরআনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহজতম ও সর্বোত্তম পন্থা ছিলো কোরআন মজীদের ক্ষুদ্রতম সূরাহ্ সমূহের সাথে তুলনীয় একটি সূরাহ্ রচনা করা এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর চ্যালেঞ্জ তথা কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। এভাবে, তারা তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিল্প এবং যে বিষয়ে তারা সন্দেহাতীতরূপে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলো, তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জপ্রদানকারীকে পরাভূত করতে পারতো।

এ কাজের মাধ্যমে তারা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ওপর বিজয়ী হতে, ইতিহাসে নিজেদের নামকে চিরজীবী করে ও স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারতো। সর্বোপরি, এ সহজ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তারা রক্তক্ষয়ী ও ব্যয়বহুল যুদ্ধসমূহ এড়িয়ে যেতে এবং প্রাণহানি থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারতো। তেমনি কষ্ট ও কাঠিন্য স্বীকার এবং নিজেদের বাড়ীঘর ও দেশ ত্যাগের দুর্ভোগ থেকেও মুক্ত হতে পারতো।

কিন্তু তৎকালের আরবের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের প্রতিভাসমূহ যখন কোরআনের মুখোমুখী হলেন এবং কোরআন মজীদের আয়াতের ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাত্ লক্ষ্য করলেন ও এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলেন, তখন খুব সহজেই কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ হওয়া সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হলেন এবং এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে, কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে গেলে নিশ্চিত পরাজয় ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ কারণেই তাঁদের মধ্যে অনেকে কোরআন মজীদের ওয়াহী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নেন এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের সত্যতা ঘোষণা করে কোরআন মজীদের সামনে আত্মসমর্পণের শির অবনত করে দেন, আর ইসলাম গ্রহণ করে অবিনশ্বর কল্যাণ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হন। কিন্তু তাদের মধ্যকার অপর এক দল কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জের সামনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও একগুঁয়েমি ও অন্ধত্বের বশবর্তী হয়ে অসির চ্যালেঞ্জের পথ বেছে নয় এবং সাহিত্যযুদ্ধের পরিবর্তে বর্শা ও তলোয়ারের লড়াইকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

কোরআন মজীদের মোকাবিলায় তৎকালীন আরবদের এ অক্ষমতা ও পরাজয়ই কোরআনে করীমের ওয়াহী হওয়ার সপক্ষে সবচেয়ে বড় দলীল এবং সুস্পষ্টতম প্রমাণ। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কোরআন মজীদের বিকল্প আনয়ন মানুষের শক্তি- ক্ষমতা ও প্রতিভার আওতা বহির্ভূত।

একটি প্রতিবাদ ও তিনটি জবাব

কোনো কোনো অজ্ঞ লোক দাবী করেছে যে, তৎকালীন আরবরা কোরআনের অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলো এবং এভাবে কোরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছিলো, কিন্তু কালের প্রবাহে কোরআনের মোকাবিলাকারী সে বক্তব্য হারিয়ে গেছে এবং এ কারণে তা আমাদের কাছ থেকে গোপন রয়ে গেছে।

এ দাবী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিচারে ভিত্তিহীন ও হাস্যষ্কর দাবী ব নয়। কারণ,

(১) যদি সত্যি সত্যিই এরূপ ঘটনা ঘটতো অর্থাৎ কেউ কোরআন মজীদের বিকল্প উপস্থাপনে সক্ষম হতো এবং কোরআন প্রদত্ত চ্যালঞ্জে বিজয়ী হতো, তাহলে আরবরা অবশ্যই তাদের বিভিন্ন সভা- সমিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতো। ধু তা- ই নয়, বিষয়টি তারা সমস্ত অলিতে- গলিতে প্রচার করতো এবং মেলায়, বাজারে ও হজ্বের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করতো।

বস্তুতঃ এরূপ একটি ঘটনা ঘটলে ইসলামের দুশমনরা তা প্রচারের সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করতো না, বরং তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য একে পুরোপুরি ব্যবহার করতো। কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে এ বিজয়কে তারা মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো এবং সযত্নে এর হেফাযত করতো ও তাদের দুশমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। ধু তা- ই নয়, তারা এ বিষয়টিকে পুরুষানুক্রমে তাদের ইতিহাসগ্রন্থ সমূহে উদ্ধৃত করতো। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কোনো ইতিহাস বা সাহিত্য গ্রন্থেই এ ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও তাতে বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হয় নি।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

(ক) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর আবির্ভাব ও ইসলামের অভ্যুদয় মানবেতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঘটনা, যে কারণে এর বিস্তারিত ইতিহাস ধু মুসলিম ইতিহাসবিদগণই নন, অমুসলিম ইতিহাসবিদগণও লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রাচীন অমুসলিম ইতিহাসবিদগণ ইসলামী সূত্রের ওপর নির্ভর করেন নি, বরং নিজস্ব সূত্র ব্যবহার করেছেন। সূতরাং কেউ কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তার বিকল্প উপস্থাপনে সক্ষম হলে তা নিয়ে কাফেররা এতোই হৈচৈ করতো যে, তৎকালীন ও

পরবর্তীকালীন অমুসলিম ইতিহাসবিদগণের ইতিহাস থেকে তা কিছুতেই বাদ পড়তো না, বরং কথিত বিকল্প গ্রন্থ বা সূরাহ্ও তাতে উদ্ধৃত হতো।

(খ) মক্কাহর মুসলমানদের অংশবিশেষ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলে কাফেরদের প্রতিনিধিদল তাঁদেরকে ধাওয়া করে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে এবং তাঁদেরকে তাদের হাতে সমর্পণের জন্য সে দেশের বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট আবেদন জানায়। হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁর নিকট যা নাযিল হয়েছে বলে দাবী করছিলেন নাজ্জাশী তা থেকে কিছুটা তেলাওয়াত করে নাতে বললে নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর একজন ছ্বাহাবী সূরাহ্ মারইয়াম্ তেলাওয়াত করে শোনান। এ তেলাওয়াত নে নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গ অভিভূত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় কাফেরদের হাতে কোরআন মজীদের বা তার কোনো সূরাহর বিকল্প থাকলে অবশ্যই তারা বলতো যে, কোরআন কোনো ঐশী কালাম্ নয়, বরং এ হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর রচিত অতি উন্নত মানের সাহিত্যসমৃদ্ধ রচনা, আর অত্যন্ত সুন্দরভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশক্ষম প্রাঞ্জল ভাষায় (আরবীতে) এ ধরনের উন্নত মানের রচনা তরী করা সম্ভব এবং তারা এর বিকল্প রচনা করেছে। অতঃপর তারা তা পড়ে নাতো। কিন্তু তারা এরূপ দাবী করে নি; করলে অবশ্যই তা ইতিহাসে লেখা থাকতো। এছাড়া হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যখন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট পত্র পাঠান তখন রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হেরাক্লিয়াস কয়েক জন আরব বণিকের সাহায্য নেন যারা ছিলো কাফেরদের দলভুক্ত। কোরআন মজীদের বা তার কোনো সূরাহর বিকল্প রচিত হয়ে থাকলে তারাও হেরাক্লিয়াসের সামনে তা পেশ করার সুযোগ হাতছাড়া করতো না। কিন্তু তারা কোনো বিকল্প তরীর দাবী করে নি এবং এরূপ কিছু পেশ করে নি।

(গ) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগে আরব উপদ্বীপের জনগণের মধ্যে মদীনার ইয়াহূদী ও নাজরানের খৃস্টানরা ছিলো অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ও সুসভ্য। তারা ছিলো আসমানী গ্রন্থের অধিকারী। বিশষ করে ইয়াহূদীদের মধ্যে জ্ঞানচর্চা বেশী ছিলো এবং খৃস্টানদের আরব উপদ্বীপের বাইরের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিলো। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদের বিকল্প রচিত হলে তারা তার সংরক্ষণ ও প্রচার- প্রসার করে ইসলামের মোকাবিলা করতো। বিশেষ করে

রাজনৈতিক কারণে তাদের যখন দেশত্যাগ করে বাইরে চলে যেতে হয়, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ভালোভাবেই এ অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারতো এবং কিছুতেই তারা এ সুযোগ হাতছাড়া করতো না। কিন্তু এরূপ কোনো বিকল্পের প্রচার তো দূরের কথা, এরূপ বিকল্প রচিত হয়েছে বলেও তারা দাবী করে নি।

(ঘ) জাহেলী যুগের আরবদের বহু সাহিত্যকর্ম, বিশেষ করে তাদের ে ষ্ঠতম সাহিত্যকর্মসমূহ এখনো টিকে আছে। সে ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বিকল্প রচিত হলে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা ঐ সব সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো।

(২) কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ ধু মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক বা ধু আরবদের প্রতিই ছিলো না, বরং কোরআন মজীদ তার বিকল্প উপস্থাপনের জন্য সর্ব কালের, সর্ব যুগের সর্ব স্থানের সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله و لو كان لبعضهم لبعض ظاهراً)

“(হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দিন, এ কোরআনের বিকল্প আনয়নের জন্য যদি সমগ্র মানব প্রজাতি ও সমগ্র জ্বিন প্রজাতি একত্রিত হয় তথাপি এর বিকল্প আনয়নে সক্ষম হবে না, এমনকি তারা যদি এ কাজে এক দল অপর দলকে সাহায্য করে তবুও সক্ষম হবে না।” (সূরাহ্ বানী ইসরা◌াঈল্ : ৮৮)

আর ইসলামের পুরো ইতিহাসে খৃস্টান জগত ও ইসলামের দুশমন অন্যান্য জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ইসলাম ও মুসলমানদের ে ষ্ঠত্ব ও মর্যাদা হ্রাসকরণ এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ও কোরআন মজীদকে হেয় করার লক্ষ্যে প্রচুর সময়, ম ও অর্থ ব্যয় করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এ সংগ্রাম অত্যন্ত পরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও সুবিস্তৃতভাবে অব্যাহত ছিলো এবং এখনো রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে যদি কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্- এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাকারী কোনো বিকল্প - এমনকি মাত্র একটি সূরাহ্ আনয়ন করে হলেও - উপস্থাপন করা সম্ভব হতো, তাহলে অবশ্যই তারা সে সুযোগ গ্রহণ করতো। সে ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের ক্ষুদ্রতম সূরাহ্ সমূহের কোনোটির অনুরূপ একটি সূরাহ্ রচনা করে অত্যন্ত সহজ অথচ সর্বোত্তম

পন্থায় তারা স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হতো এবং প্রচুর সময়, ম ও অর্থ ব্যয়ের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতো। কিন্তু

(يريدون ليطفيوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون)

“তারা ফুঁ দিয়ে আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ (স্বয়ং) তাঁর জ্যোতির পরিপূর্ণতা দানকারী, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে।” (সূরাহ্ আছ্- ছ্বাফ্ : ৮)

(৩) উন্নত সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী কোনো ব্যক্তি যদি বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের বিচারে উন্নততম কালাম্ (কথা, বাণী, ভাষণ ও বক্তব্য) নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে চর্চা করে এবং তার সৌন্দর্য, প্রকাশসৌকর্য ও সাহিত্যক ঔৎকর্ষ ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, অতঃপর সে তদনুরূপ বা অন্ততঃ তার কাছাকাছি মানের কালাম্ রচনা করতে সক্ষম হয়। এ হচ্ছে সর্ব শাস্ত্রে বা সর্ব বিষয়ে প্রযোজ্য একটি সাধারণ ও সুনিশ্চিত বিধি।

কিন্তু কোরআন মজীদ এ সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম। কারণ, মানুষ কোরআন মজীদের সাথে যতো বেশীই পরিচিত হোক না কেন, যতো বেশী মনোযোগ সহকারে কোরআনে করীম অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করুক না কেন এবং কোরআন মজীদ নিয়ে যতোই চর্চা করুক না কেন, যতোই না এর আয়াত সমূহ মুখস্ত করে নিক ও মনমগযে গেঁথে নিক, তথাপি সে কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের সাথে মিল বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির অধিকারী কালাম্ রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ সত্য এটাই প্রমাণ করে যে, কোরআন মজীদ এমন এক বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির অধিকারী যা মানুষকে শিক্ষাদানের সম্ভাবনা ও মানুষের শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতার উর্ধে। অতএব, কারো পক্ষে তা শিক্ষা করা বা অন্যকে শিক্ষাদান এবং তার ভিত্তিতে অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি সম্বলিত বক্তব্য রচনা করা সম্ভব নয়।

এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিজের রচিত কালাম্ হলে, তাঁর যে সব বক্তৃতা- ভাষণ ও কথাবার্তা অকাট্য ও অবিকৃতভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাতে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের দিক থেকে কোরআন মজীদের সাথে এক

ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যেতো এবং কোরআন মজীদের প্রকাশভঙ্গি ও তাঁর কথাবার্তার প্রকাশভঙ্গিতে বিশেষ ধরনের অভিন্ন বশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতো। অন্ততঃ তাঁর বক্তব্যের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে, আঙ্গিকতা, প্রকাশভঙ্গি ও মানের দিক থেকে কোরআন মজীদের সমপর্যায়ের কথা পাওয়া যেতো। আর তাহলে অবশ্যই এ সব অত্যুন্নত মানের বাক্য বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত হতো। বিশেষ করে কোরআনের দুশমনরা - যারা ইসলামের ে ষ্ঠত্বকে ম্লান করার জন্য সদা সচেষ্ট - এ ধরনের বাক্যাবলী সংরক্ষণ করে রাখতো এবং তার ভিত্তিতে কোরআন মজীদকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিজের রচিত গ্রন্থ্ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতো।

এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে, মানবসমাজে বালাগ্বাত্ (ভাষাগত প্রকাশ সৌকর্য) যেভাবে বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায় তাতে অনেক সময় কোনো জনসমষ্টির মধ্যে বালাগ্বাত্- এর অধিকারী কোনো কোনো লোককে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ এ ধরনের একজন লোক সংশ্লিষ্ট ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের একটি কি দু'টি দিকে দক্ষতার অধিকারী হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ হয়তো গদ্যে বালাগ্বাত্- এর অধিকারী, কিন্তু কবিতা রচনায় অক্ষম। অপর একজন হয়তো বীরত্বগাথা কবিতায় বালাগ্বাতের অধিকারী, কিন্তু প্রশংসামূলক কবিতায় নন। অথবা একজন শোকগাথা রচনায় বালাগ্বাত্- এর অধিকারী এবং এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক কবিতা রচনায় সক্ষম, কিন্তু তিনি প্রেমবিষয়ক কবিতা রচনা করলে তা হয় খুবই নিম্ন মানের।

কিন্তু কোরআন মজীদ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছে এবং এ ক্ষেত্রে বাচনশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকতা ব্যবহার করেছে। আর এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোরআন মজীদ মু'জিযাহর স্তরে অবস্থিত এবং এর প্রকাশসৌন্দর্য ও বাণীনৈপুণ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই চরমতম পর্যায়ে উপনীত ও পূর্ণতার শেষ সীমায় অবস্থিত, যার ফলে অন্যরা অনুরূপ কালাম্ রচনায় অক্ষম হয়ে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, এহেন চরমতম ও পূর্ণতম বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো কেবল মানুষের ও তার ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষেই সম্ভব এবং এ কারণেই তাঁর কালামে

অর্থাৎ কোরআন মজীদে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই মানুষের পক্ষে কখনোই এর সাথে তুলনীয় বক্তব্য উপস্থাপন করা সম্ভব হতে পারে না।

চিরকালীন দ্বীনের অবিনশ্বর মু'জিযাহ্

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) চেনার একমাত্র পথ হচ্ছে মু'জিযাহ্। আর যেহেতু পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের ('আঃ) নবুওয়াত বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট যুগের জন্য নির্ধারিত ছিলো, সেহেতু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদেরকে প্রদত্ত মু'জিযাহ্ সমূহের মেয়াদও ছিলো সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত। আর এ সব মু'জিযাহ্ কেবল সংশ্লিষ্ট যুগের লোকদের জন্যই নির্ধারিত ছিলো। কারণ, সংশ্লিষ্ট যুগের কিছু লোক ঐ সব সীমাবদ্ধ ও সাময়িক মু'জিযাহ্ দর্শন করায় তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার হুজ্জাত্ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং অন্যরাও পরম্পরা ভিত্তিতে ও মুতাওয়াতির্ পর্যায়ে এ সব মু'জিযাহর খবর জানতে পারায় তাদের জন্যও তা দৃঢ় প্রত্যয়ের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো, যার ফলে তাদের ওপরও আল্লাহর হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ হয়েছিলো।

কিন্তু একটি অবিনশ্বর শরী'আত ও নবুওয়াতের জন্য একটি অবিনশ্বর ও পরবর্তী সর্বকালীনন মু'জিযাহ্ থাকা অপরিহার্য। কারণ, মু'জিযাহ্ কোনো একটি বিশেষ যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের লোকদের পক্ষে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

এমনকি এক সময়ের মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের বর্ণনাও কালের প্রবাহে হারিয়ে যেতে পারে; অন্ততঃ বিভিন্ন কার্যকারণের প্রভাবে তার ওপরে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগসমূহের লোকেরা - যারা মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করতে পারলো না - তাদের ওপর হুজ্জাত্ পূর্ণ হবে না এবং তাদের অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হবে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা যদি এহেন লোকদের জন্য আল্লাহর নবীর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার ও তাঁর শরী'আত্ অনুসরণ বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে কার্যতঃ তাদেরকে অসম্ভব দায়িত্ব প্রদান করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কারো ওপরে অসম্ভব দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এ কারণেই আমরা বলেছি, অবিনশ্বর নবুওয়াতের জন্য অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ প্রয়োজন যা সব সময়ই সংশ্লিষ্ট নবীর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের জন্য অবিনশ্বর ও কালোত্তীর্ণ মু'জিযাহ্ স্বরূপ কোরআন মজীদ প্রদান করেছেন যাতে তা অতীত কালের লোকদের জন্য যেভাবে হুজ্জাত্ ছিলো ঠিক সেভাবেই পরবর্তী কালের লোকদের জন্যও হুজ্জাত্ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত উপসংহারে উপনীত হতে পারি :

(১) কোরআন মজীদ অতীতের সমস্ত নবী- রাসূলকে ('আঃ) প্রদত্ত মু'জিযাহ্ সমূহ ও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে প্রদত্ত অন্যান্য মু'জিযাহর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কারণ, কোরআন মজীদ হচ্ছে অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ - যার মু'জিযাহ্ হওয়ার বশিষ্ট্য এখন থেকে অতীতে যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জাত্ ছিলো, তেমনি ভবিষ্যতে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জাত্ হয়ে থাকবে।

(২) অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) আনীত শরী'আত্ ও বিধিবিধানের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কারণ, সংশ্লিষ্ট শরী'আত্ সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী মু'জিযাহ্ সমূহ অতীত হয়ে গেছে এবং সে সবের আধিপত্যও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে জনৈক ইয়াহূদী পণ্ডিতের সাথে 'আল্লামাহ্ খূয়ীর যে কথোপকথন হয় তা এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উক্ত ইয়াহূদী পণ্ডিতের সাথে 'আল্লামাহ্ খূয়ীর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো : "ইয়াহূদী ধর্মের যুগ তার মু'জিযাহ্ সমূহ হারিয়ে যাওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়েছে।"

'আল্লামাহ্ খূয়ী তাঁকে বললেন : "হযরত মূসা ('আঃ)- এর শরী'আত্ কি ধু ইয়াহূদীদের জন্য ছিলো, নাকি সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ ও সর্বজনীন শরী'আত্ ছিলো? তা যদি ধু ইয়াহূদীদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য অন্য নবী- রাসূল প্রয়োজন। আর সে ক্ষেত্রে আপনাদের দৃষ্টিতে উক্ত পয়গাম্বর রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছাড়া আর কে হতে পারেন? আর হযরত মূসা ('আঃ)- এর শরী'আত্ যদি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন হয়ে থাকে এবং সমগ্র মানব প্রজাতির জন্য তা সাধারণ শরী'আত্ হয়ে

থাকে তাহলে তার সপক্ষে অকাট্য ও জীবন্ত দলীল থাকা অপরিহার্য। অথচ কার্যতঃ এখন এ জাতীয় দলীল- প্রমাণ মওজূদ নেই। কারণ, হযরত মূসার (‘আঃ) মু‘জিযাহ্ সমূহ ধু তাঁর নিজের যুগের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিলো। তাই তাঁর পরে আর সে সব মু‘জিযাহ্র কোনো চিহ্ন বর্তমান নেই যা সর্ব যুগে অকাট্য ও প্রত্যয় সৃষ্টিকারী রূপে গণ্য হতে পারে এবং ইয়াহূদী ধর্মের স্থায়িত্ব ও প্রবাহমানতা প্রমাণ করতে পারে।

“আপনি যদি বলেন যে, এ সব মু‘জিযাহ্ বর্তমানে বিদ্যমান না থাকলেও মুতাওয়াতির্ বর্ণনার কারণে এ সব মু‘জিযাহ্ সংঘটিত হবার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে জবাবে বলবো, প্রথমতঃ মু‘জিযাহ্ কেবল তখনই প্রত্যয় উৎপাদক হতে পারে যখন তা তাওয়াতোর্ পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক পুরুষে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এতো বেশী সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত হয় যে, তা প্রত্যয় উৎপাদনকারী হতে পারে। কিন্তু আপনারা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠীর প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে এ ধরনের তাওয়াতোর্ প্রমাণ করতে পারবেন না।

“দ্বিতীয়তঃ যদি মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে বর্ণনাপ্রাপ্তিই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হয়, তাহলে তা ধু হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং আপনারা যেভাবে হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহ্ বর্ণনা করেছেন তেমনি খৃস্টানরা হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহ্ বর্ণনা করছে এবং একইভাবে মুসলমানরাও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর মু‘জিযাহ্ বর্ণনা করছে। এমতাবস্থায় এ সব বর্ণনার মধ্যে এমন কী পার্থক্য রয়েছে যে, হযরত মূসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে আপনাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে, অথচ অন্যদের বর্ণনা তাদের পয়গাম্বরদের সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য হবে না? আর তাদের পয়গাম্বরের মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে তাদের বর্ণনা যদি সংশ্লিষ্ট মু‘জিযাহ্ সমূহ সংঘটিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট হয়, তাহলে তাদের নবীদের মু‘জিযাহ্ এভাবে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনারা তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করছেন না?”

জবাবে উক্ত ইয়াহূদী পণ্ডিত বলেন : "ইয়াহূদীরা হযরত মূসা ('আঃ)- এর যে সব মু'জিযাহ্ বর্ণনা করে থাকে খৃস্টান ও মুসলমানরাও তার সত্যতা স্বীকার করে, কিন্তু তাদের পয়গাম্বরদের মু'জিযাহ্ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (অর্থাৎ ইয়াহূদীরা বিশ্বাস করে না)। এ কারণে তা প্রমাণের জন্য অন্যবিধ দলীল- প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে।"

জবাবে 'আল্লামাহ্ খূয়ী বলেন : "হ্যা, সন্দেহ নেই, খৃস্টান ও মুসলমানরা হযরত মূসা ('আঃ)- এর মু'জিযাহ্ সমূহ বিশ্বাস করে। কিন্তু তা ইয়াহূদীদের মুতাওয়াতির্ ও প্রত্যয় উৎপাদক বর্ণনার ভিত্তিতে নয়, বরং এর কারণ এই যে, তাদের পয়গাম্বরগণ ('আঃ) তাদেরকে এ সব মু'জিযাহ্ সম্পর্কে অবগত করেছেন। খৃস্টান ও মুসলমানরা তাদের পয়গাম্বরদের ('আঃ) মাধ্যমেই হযরত মূসা ('আঃ)- এর মু'জিযাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রত্যয় হাছিল করেছে। এমতাবস্থায় তারা যদি তাঁদের নবুওয়াত স্বীকার না করে তাহলে তাদের পক্ষে হযরত মূসা ('আঃ)- এর মু'জিযাহ্ সমূহের সত্যতা স্বীকারের কোনো পথই থাকে না।

"এ দুর্বলতা ধু ইয়াহূদী ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং অতীতের প্রতিটি ধর্মেই এ দুর্বলতা রয়েছে। কেবল ইসলামের মু'জিযাহ্ই অবিনশ্বর - যা সকল যুগেই জীবন্ত এবং সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রবহমান রয়েছে। এ মু'জিযাহ্ ক্বিয়ামত্ দিবস পর্যন্ত বিশ্ববাসীর সামনে বাঙ্ময় হয়ে থাকবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহবান জানাতে থাকবে। আমরা এ প্রবহমান ও অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ অর্থাৎ কোরআন মজীদের মাধ্যমে ইসলামকে জানি এবং এ দ্বীনের সত্যতা স্বীকার করি। আর যেহেতু আমরা ইসলামকে জেনেছি ও এর সত্যতা স্বীকার স্বীকার করেছি, সেহেতু অতীতের সমস্ত নবী- রাসূলকে ('আঃ) স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ও তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

"মোট কথা, কোরআন মজীদ হচ্ছে অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ - যা অতীতের সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদন করেছে এবং অতীতের সমস্ত নবী- রাসূলের ('আঃ) নবুওয়াতের

সত্যতা ও তাঁদের নিষ্কলুষতা- পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছে, আর তাঁদেরকে তাঁদের যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।”

জাহেলী আরবদের পথনির্দেশনায় কোরআনের ভূমিকা

কোরআন মজীদ আরো একটি বিশিষ্ট মর্যাদা ও একক বশিষ্ট্যের অধিকারী। আর এ বশিষ্ট্যের কারণে কোরআন মজীদ সমস্ত নবী- রাসূলের (‘আঃ) সমস্ত মু‘জিযাহ্‌র ওপর ৎে ষ্ঠত্বের অধিকারী। তা হচ্ছে মানবতার পথনির্দেশ ও নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ এবং পূর্ণতা ও মানবতার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে তাদেরকে পরিচালিতকরণ। কারণ, কোরআন মজীদ হচ্ছে সেই মহাগ্রন্থ যা উদ্ধত, দুর্ধর্ষ ও দুর্বৃত্ত আরবদেরকে পথের দিশা দেখিয়েছিলো এবং তাদেরকে পুতুলপূজা ও নতিক- চারিত্রিক অধঃপতন ও অনাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিলো, যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় রূপ জাহেলী যুগে গৌরবজনক বিবেচিত বিষয়গুলো থেকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলো, আর এহেন রক্তপিপাসু মূর্খ লোকদের মধ্য থেকে এমন একটি জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলো যে জাতির লোকেরা সমুন্নত সংস্কৃতি, স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস এবং পরিপূর্ণ চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হতে পেরেছিলো।

যে কেউ ইসলামের ও হযরত রাসূলে আকরাম্‌ (ছ্বাঃ)- এর সঙ্গী- সাথীদের গৌরবময় ইতিহাস অধ্যয়ন করবেন এবং যেভাবে তাঁরা ইসলামের জন্য হাসিমুখে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন তা নিয়ে চিন্তা করবেন, তিনি- ই কোরআন মজীদের ৎে ষ্ঠত্ব এবং পথনির্দেশনা ও পরিচালনার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। তাহলে তাঁর কাছে কোরআন মজীদের হেদায়াতের গুরুত্ব এবং তৎকালীন আরব জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও পথনির্দেশনার ক্ষেত্রে এর বিস্ময়কর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। তিনি বুঝতে পারবেন যে, কেবল এই কোরআন মজীদের পক্ষেই তাঁদেরকে জাহেলী জীবনধারার পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে জ্ঞান, পূর্ণতা ও মানবতার সমুন্নততম স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁদেরকে দ্বীন, জীবনের সমুন্নত লক্ষ্য ও ইসলামের প্রাণসঞ্জীবনী আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য আত্মোৎসর্গের শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যার ফলে এ পথে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁরা পার্থিব ধনসম্পদ হাতছাড়া করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না এবং স্বীয় সন্তান ও জীবনসাথীর মৃত্যুতে সামান্যতমও দুঃখিত হতেন না।

এ প্রসঙ্গে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যখন বদর যুদ্ধে গমন প্রশ্নে মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করছিলেন তখন ছ্বাহাবী হযরত মিক্বদাদ্ তাঁকে উদ্দেশ করে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাকে আমরা আমাদের উক্ত বক্তব্যের সপক্ষে এক অকাট্য প্রমাণ রূপে তুলে ধরতে পারি।

হযরত মিক্বদাদ্ বলেছিলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তার ভিত্তিতেই অগ্রসর হোন; আমরা মুসলমানরা মৃত্যুর পেয়ালা পান করা পর্যন্ত এ পথে আপনার সাথে এগিয়ে যাবো। আল্লাহর শপথ, আমরা তেমন কথা কখনোই বলবো না যা বানী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা ('আঃ)কে উদ্দেশ করে বলেছিলো, যে : "তুমি যাও; তোমার রবের সহায়তা নিয়ে যুদ্ধ করো; আমরা এখানে তোমার অপেক্ষায় বসে থাকলাম।" বরং আমরা বলছি : "আপনি আপনার রবের ওপর ভরসা করে এগিয়ে যান ও যুদ্ধ রু করুন; আমরাও আপনার সাহায্যের জন্য আপনার সাথে এগিয়ে যাবো এবং জানপ্রাণ দিয়ে আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো। সেই রবের শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে তরঙ্গসঙ্কুল ও বিপদজনক সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাবশার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, তাহলে আমরা সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবো।" এতে খুশী হয়ে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) মিক্বদাদকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দো'আ করেন। (تاريخ طبرى، الطبعة الثانية، ٢/١٤١.)

ইনি হচ্ছেন মুসলমানদেরই একজন এবং সেই সব লোকদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ যারা নিজেদের দৃঢ় প্রত্যয় ও অনড় সিদ্ধান্তের কথা এভাবে প্রকাশ করেন এবং যারা সত্য ও স্বাধীনতার সঞ্জীবন ও শিরক্- পৌত্তলিকতার বিলুপ্তির লক্ষ্যে আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতির কথা এভাবেই ঘোষণা করেন। আর তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে, আপদমস্তক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ঈমান এবং পূত- পবিত্র ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী লোকের সংখ্যা ছিলো প্রচুর।

আর এ ছিলো কোরআন মজীদেরই অবদান; কোরআন মজীদই এই মূর্তিপূজক ও রক্তপিপাসু জাহেলী যুগের লোকদের অন্ধকার হৃদয়গুলোকে এভাবে জ্যোতির্ময় করে তুলেছিলো। আর জাহেলী যুগের এ নির্দয় ও বন্য লোকদেরকেই এমন জাগ্রতহৃদয় লোক রূপে গড়ে তুলেছিলো

যারা দুশমন ও মূর্তিপূজকদের মোকাবিলায় ছিলেন কঠোর, কিন্তু তাওহীদ্বাদী ও মুসলমানদের জন্যে ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র। আর এই কোরআন মজীদেরই বদৌলতে মাত্র অচিরেই তাঁরা এমন সব বিজয়ের অধিকারী হন অন্যরা শত শত বছরেও যার অধিকারী হতে পারে নি।

কেউ যদি হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সঙ্গীসাথীদের ইতিহাসকে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) সঙ্গীসাথীদের ইতিহাসের সাথে তুলনা করেন তাহলে তিনি জানতে পারবেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সঙ্গীসাথীদের এ দ্রুত অগ্রগতি ও নযীরবিহীন বিজয়ের পিছনে এক ঐশী রহস্য, মনোজাগতিক সত্য ও গূঢ় রহস্য নিহিত ছিলো যার উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব্ কোরআন মজীদ - যা হৃদয়সমূহকে আলোকিত করে এবং অন্তঃকরণ ও আত্মাসমূহকে সৃষ্টিকুলের উৎস মহাসত্তার ওপর দৃঢ় প্রত্যয় ও দ্বীনী মহান লক্ষ্যের পথে দৃঢ়তাকে সংমি ত করে।

অন্যদিকে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর সঙ্গীসাথীগণের এবং অন্যান্য নবী- রাসূলের (‘আঃ) সঙ্গীসাথীগণের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তাঁরা কীভাবে নিজেদের নবী- রাসূলগণকে (‘আঃ) লজ্জিত করেছেন এবং ভয়ভীতির পরিস্থিতিতে ও সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁদেরকে দুশমনদের সামনে একা ফেলে সরে পড়েছেন। এ কারণেই অতীতের নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) বেশীর ভাগই নিজ নিজ যুগের যালেম- অত্যাচারীদের মোকাবিলায় অগ্রসর হতে পারেন নি এবং সাধারণতঃ তাঁদের দুশমনদের ভাগ্যেই বিজয়মাল্য জুটেছে। বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা জনালয় থেকে পালিয়ে নির্জন প্রান্তর বা পাহাড়ের গুহায় আ য় গ্রহণে বাধ্য হন।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সঙ্গীসাথীগণের এ স্বতন্ত্র বশিষ্ট্য হচ্ছে কোরআন মজীদের বিস্ময়কর প্রভাবেরই ফল যা কোরআন মজীদের ে ষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণ করে।

জ্ঞানী- বিজ্ঞানী- মনীষী জন্মদানে কোরআনের অবদান

কোরআন মজীদের এ মানুষ গড়ার দৃষ্টান্ত কেবল নিষ্ঠাবান মানুষ গড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোরআনের ছায়াতলে অনেক অবিস্মরণীয় জ্ঞানী- গুণী, বিজ্ঞানী, মনীষী ও দার্শনিক গড়ে ওঠেন - মানবজাতির ইতিহাসে অন্য কোনো নবীর ও ধর্মগ্রন্থের বা অন্য কোনো আদর্শের প্রভাবে যে ধরনের নযীর নেই। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আলী (‘আঃ) - স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং তাঁর পুরো নবুওয়াতী যিন্দেগীর সাহচর্যে থেকে যিনি গড়ে ওঠেন।

জ্ঞান- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আলী (‘আঃ) ছিলেন এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব যার ে ষ্ঠত্বের কথা কেবল মুসলমানরাই নয়, অমুসলিমরাও স্বীকার করে থাকে। তৎকালীন আরবে যখন না জ্ঞান- বিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠানিক চর্চা ছিলো, না কোনো বড় মনীষী, দার্শনিক বা বস্তুবিজ্ঞানী ছিলেন যার কাছে তিনি জ্ঞানচর্চা করতে পারতেন, না তিনি আরবের বাইরে কোথাও গিয়ে জ্ঞানার্জন করেছিলেন।

এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর মতো এতো বড় জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা কীভাবে সম্ভব হলো তার কোনো জবাব অমুসলিম পণ্ডিত- গবেষক ও ইতিহাসবিদগণ দিতে পারেন নি। প্রকৃত ব্যাপার হলো কোরআন মজীদ ও রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যের কারণেই তাঁর মতো জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছিলো।

হযরত আলী (‘আঃ) নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর যে জ্ঞান তা তিনি কোরআন মজীদ ও রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নিকট থেকে লাভ করেছেন এবং তিনি খোদায়ী ওয়াহী হিসেবে কোরআন মজীদের সামনে মাথা অবনত করে দিয়েছেন।

এখানে হযরত আলী (‘আঃ)- এর জ্ঞান- মনীষা সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হযরত আলী (‘আঃ) আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ এবং জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে বিস্ময়কর ও মৌলিক অবদান রেখে গেছেন - বিশ্বের অসংখ্য বড় বড় জ্ঞানী- গুণী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও কবি- সাহিত্যিক যাতে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ এবং ব্যাপক তাৎপর্যবহ বক্তব্য নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করতে গিয়ে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের বিশেষজ্ঞগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন।

হযরত আলী (‘আঃ) তাঁর বক্তৃতা- ভাষণে যখনই যে বিষয়ে কথা বলেছেন, সে বিষয়ে শেষ কথাটি বলেছেন। তাঁর কথা নিয়ে চিন্তা- গবেষণার পরে তাঁর বক্তব্যের অন্যথা কেউ নির্দেশ করতে পারেন নি। প্রশ্ন হচ্ছে, এ জ্ঞানের উৎস কী? সন্দেহ নেই যে, কোরআনী আদর্শ ও কোরআনী উৎস এবং কোরআনের উৎসস্থলই তাঁর এ জ্ঞান ও বশিষ্ট্যের উৎস। তাই তিনি তাঁর এতো সব বশিষ্ট্য সত্ত্বেও কোরআন মজীদের সামনে খোদায়ী ওয়াহীর স্বীকৃতি সহকারে মাথা নত করে দিয়েছেন।

হযরত আলী (‘আঃ)কে ধু জ্ঞানী- গুণীরূপে নয়, বরং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। তা হচ্ছে, যে কেউ তাঁর জীবনেতিহাসের দিকে তাকাবে এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন বশিষ্ট্যের মধ্য থেকে মাত্র একটি বশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ দেবে সে- ই মনে করতে বাধ্য যে, তিনি বুঝিবা তাঁর সারাটি জীবন ধু এ বিষয়ে চিন্তা- গবেষণা ও চর্চা করে কাটিয়ে দিয়েছেন এবং বিষয়টিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন, আর এমতাবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি ধু ঐ একটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর জীবনের অপর একটি বশিষ্ট্য বা তাঁর জ্ঞানের অপর একটি দিক সম্পর্কে চিন্তা করবে সে তাঁর জ্ঞানের এ দিকটির ভিত্তিতে তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করবে - এতে সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এর রহস্য কী? এর রহস্য হচ্ছে, তিনি কোরআনী তথা আসমানী উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। কারণ, যে কেউ তৎকালীন আরবের ইতিহাসের সাথে পরিচিত, বিশেষ করে ইসলাম- পূর্ব হেজায্ ভূখণ্ড সম্পর্কে অবগত, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, হযরত আলী (‘আঃ)- এর চিঠিপত্র, বাণী ও বক্তৃতা- ভাষণ (যা নাহজুল্ বালাগ্বাহ্ নামে

সংকলিত হয়েছে) এবং এতে প্রতিফলিত জ্ঞান- বিজ্ঞান ঐশী ওয়াহীর সাথে সম্পর্ক ব্যতিরেকে অন্য কোনো উৎস থেকে সংগৃহীত হওয়া সম্ভব নয় (এবং সে যুগের আরব উপদ্বীপে এ ধরনের জ্ঞান আহরণের কোনো উৎসও ছিলো না)।

কতোই না চমৎকার অথচ যথার্থ কথা বলেছেন তিনি যিনি নাহ্‌জুল্ বালা্গ্বাহর ভাষা সম্পর্কে বলেছেন : "এটা স্রষ্টার কালামের তুলনায় নিম্নতর ও সৃষ্টির কালামের তুলনায় উর্ধে"! বস্তুতঃ কেবল অবিনশ্বর খোদায়ী মু'জিযাহ্ কোরআন মজীদের সাথে সর্বাধিক সম্পৃক্ততার কারণেই তাঁর বক্তব্য মানের দিক থেকে এমন এক সমুন্নত পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিলো। আর তিনি নিজেই তা অকপটে স্বীকার করেছেন।

তাছাড়া হযরত আলী ('আঃ)- এর জীবনেতিহাসের সাথে যারা পরিচিত, ইসলামের বন্ধু- দুশমন নির্বিশেষে তাঁদের সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ - তাক্ওয়া- পরহেযগারীর চরম- পরম দৃষ্টান্ত। ধু তা- ই নয়, তিনি স্বীয় অনুভূতি, চিন্তা- চেতনা ও মতামতের ব্যাপারে ছিলেন আপোসহীন। এছাড়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার ক্ষমতা, শক্তি ও সম্পদের ব্যাপারে তিনি একেবারেই নিস্পৃহ ছিলেন। এহেন ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কোরআন মজীদ ও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) থেকে তা আহরণের কথা বলা বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব।

হযরত আলী ('আঃ)- এর জ্ঞান- মনীষার আওতা সম্পর্কে যাদের খুব বেশী ধারণা নেই তাঁদের জানার সুবিধার্থে এখানে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া যেতে পারে।

নিঃসন্দেহে হযরত আলী ('আঃ) ছিলেন কোরআন মজীদের ে ষ্টতম ফসল। এ কারণেই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) এরশাদ করেন : انا مدينة العلم و علي بابها - "আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরযাহ্।"

হযরত আলী ('আঃ) জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা- প্রশাখায় সর্বোচ্চ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি জ্ঞান- বিজ্ঞানের যে সব শাখা- প্রশাখায় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন তার সবগুলোর নামও

কোনো একজন মনীষীর আয়ত্ত নেই। জ্ঞানের নগরীর দরযাহ্ হযরত আলী ('আঃ) তাঁর নিজের জ্ঞানের আওতা সম্পর্কে বলেছেন : "রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) আমাকে জ্ঞানের এক হাজার শাখা (বা অধ্যায়) শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমি তার প্রতিটি থেকে এক হাজার করে উপশাখা (বা উপ-অধ্যায়) উদ্ভাবন করেছি।" এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

বর্তমান যুগে দ্বীনী ও মানবিক জ্ঞান- বিজ্ঞানের যে সব শাখা- প্রশাখা রয়েছে ও তদসংশ্লিষ্ট যে সব আনুষঙ্গিক শাস্ত্র রয়েছে সে সবের নাম মোটামুটি অনেকেরই জানা আছে। এর মধ্যে রয়েছে আরবী ব্যাকরণ, জাহেলী যুগের আরবী সাহিত্য, বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত, ভাষাতত্ত্ব, তাৎপর্য বিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, 'ইলমে 'আক্বাএদ, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বাহ্, চরিত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, আইন ও দণ্ডবিধি ইত্যাদি অনেক কিছু। বর্তমান যুগে এবং পূর্ববর্তী যুগেও এ সব শাস্ত্রের যে কোনো একটিতে অত্যন্ত উঁচু স্তরের দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তি বিশ্ববিখ্যাত মনীষী হিসেবে পরিগণিত; কদাচিৎ দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি এ সব বিষয়ের মধ্য থেকে একাধিক বিষয়ে উঁচু স্তরের দক্ষতার অধিকারী। কিন্তু হযরত আলী ('আঃ) এ সব জ্ঞানের প্রতিটি শাখা- প্রশাখায়ই সুউচ্চ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি এ সব বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন পরবর্তী কালে কোনো মনীষীই তার মধ্য থেকে কোনো কথাই ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ করতে পারেন নি।

কিন্তু হযরত আলী ('আঃ)- এর জ্ঞান কেবল দ্বীনী ও মানবিক জ্ঞান- বিজ্ঞানের শাখা- প্রশাখা ও তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং তিনি প্রাকৃতিক ও বস্তুবিজ্ঞান সমূহেও সমান দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। নক্ষত্রবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র তথা কোনো কিছুই তাঁর আওতার বাইরে ছিলো না।

বস্তুবিজ্ঞান সমূহের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি রাসায়নিক পদ্ধতিতে স্বর্ণ তরী করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ

দক্ষতা ছিলো তাঁর যুগের চাইতে অনেক বেশী অগ্রগামী। ফলে তাঁর রসায়নশাস্ত্রের শিষ্যগণ এ ফর্মুলা সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে ও কাজে লাগাতে পারেন নি।

অতএব, যে মহাগ্রন্থ এহেন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম - ঐশী গ্রন্থ হবার দাবীদার অন্য কোনো গ্রন্থই যা পারে নি, সে গ্রন্থের ঐশী গ্রন্থ হবার ব্যাপারে কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও অবিশ্বাস পোষণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

তবে হযরত আলী ('আঃ) কোরআন মজীদের ৎ ষ্ঠতম ফসল হলেও জ্ঞানী- মনীষী সৃষ্টির ব্যাপারে কোরআন মজীদ কেবল একজন "আলী" তরী করে নি, বরং বিগত চৌদ্দশ' বছরে জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা- প্রশাখায় অসংখ্য উঁচু স্তরের মনীষী তরী করে মানব প্রজাতিকে উপহার দিয়ে ধন্য করেছে। আর তাঁরা কেবল বু আলী সীনা, আল্- বিরুনী, ফারাবী, রাযী, খাওয়ারিযমী, জাবের ইবনে হাইয়ান, জাবের ইবনে হাইছাম, প্রমুখ কয়েক জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, বরং বিভিন্ন শাখার এ সব জ্ঞানী- মনীষীদের তালিকা এতোই দীর্ঘ যে, ধু কোন্ বিষয়ের মনীষী তার উল্লেখ সহ তাঁদের নামের তালিকা তরী করতে হলেও বহু খণ্ড বিশিষ্ট বিশালায়তন গ্রন্থ তরী করতে হবে।

এটা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখাই মুসলমানরা উদঘাটন করেছেন। আর মুসলমানরা কোরআন চর্চা করতে গিয়েই জ্ঞান- বিজ্ঞানের এ সব শাখা আবিষ্কার করেছেন এবং এক বিরাট বিশ্বসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় নি এবং ইউরোপ ছিলো অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মুসলমানরা ধু ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদিতেই উন্নতি করে নি, বরং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান সহ সকল প্রকার বস্তুবিজ্ঞানেও উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো। অতঃপর ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান- বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে তাদেরই কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং স্বীয় ধর্মীয় (খৃস্টবাদের) নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জ্ঞান- বিজ্ঞানের গবেষণায় হাত দেয় - যার ফসল হচ্ছে বিশ্বের বর্তমান বজ্ঞানিক অগ্রগতি।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মুসলমান ও খৃস্টান সম্প্রদায় যখন নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থকে আঁকড়ে ধরেছিলো তখন মুসলমানরা সারা বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানে ধন্য করেছে এবং ইতিহাসবিশ্রুত শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদেরকে উপহার দিয়েছে, আর তখন খৃস্টানরা অজ্ঞতার তিমিরে নিমজ্জিত ছিলো। অন্যদিকে খৃস্টানরা যখন তাদের ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং বাইবেল ও তার ধারক-বাহকদের আধিপত্যকে গীর্জার চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে ফেললো এবং মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের কোরআনকে গ্রহণ না করলেও কোরআনের ফসল জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহকে গ্রহণ করলো ও তার ভিত্তিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন তারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর জন্য পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়ালো। আর রাজ্যহারা লুণ্ঠিতসর্বস্ব মুসলমানদের কাছ থেকে উপনিবেশবাদী দখলদাররা তাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, তাদের কোরআন-কেন্দ্রিক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও বন্ধ করে দিয়ে সচ্ছল শিক্ষিত মুসলিম জাতিকে দরিদ্র অশিক্ষিতে পরিণত করলো এবং তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পুঁজির অভাবে কোরআন-চর্চার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে প্রায় সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্রের ফলে কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়লো এবং এক সময় তারা দখলদার শত্রুদেরকে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী গণ্য করে তাদের মানসিক গোলামে পরিণত হয়ে গেলো।

কিন্তু খৃস্টান পাশ্চাত্য জগত কোরআনের ফসল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে তার চর্চা করে অনেক দূর এগিয়ে নিলেও তারা কোরআনের আদর্শিক ও নৈতিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে নি। ফলে পাশ্চাত্য জনগণের মধ্যে পার্থিব ও নৈতিক-আধ্যাত্মিক দিকের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে তা তাদেরকে চরম ভোগবাদে নিমজ্জিত করেছে। এর ফলে তারা নিজেদের ধ্বংস ও বিলুপ্তির জন্য প্রহর গুণছে যা সেখানকার রাষ্ট্রনেতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদেরকে শঙ্কিত করে তুলেছে এবং তাঁরা তাঁদের জনগণকে এ থেকে ফেরাবার জন্য যতোই চেষ্টা করছেন ও পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা কোনোই সুফল দিচ্ছে না।

এ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে মানব প্রজাতির জন্য সার্বিক উন্নতি- অগ্রগতির উৎস; কোরআন- চর্চা ও তার ফসলকে গ্রহণের মধ্যেই উন্নতি এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরণের মধ্যেই পশ্চাদপদতা ও ধ্বংস নিহিত। এ হচ্ছে কোরআন মজীদের অবিনশ্বর মু'জিযাহরই অন্যতম দিক।

বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে কোরআনের অলৌকিকতা

কোরআন মজীদ কেবল বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের দৃষ্টিকোণ থেকেই মু'জিযাহ্ নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান- বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও মু'জিযাহ্ - মানবিক জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রতিভা সমূহ যার ধারে কাছেও পৌঁছতে সক্ষম নয়। বিশষ করে বিচারবুদ্ধি ও দার্শনিক জ্ঞানের আলোকে পর্যালোচনা করলে কোরআন মজীদের খোদায়ী কিতাব্ হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

কোরআনের বাহক নিরক্ষর নবী

কোরআন মজীদের বেশ কিছু আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছিলেন নিরক্ষর (উম্মী); তিনি কখনো কারো কাছে লেখাপড়া শেখেন নি। হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) নিজেও তাঁর জাতি ও আত্মীয়- স্বজনের সামনে - যাদের মাঝে তিনি লালিত- পালিত ও বড় হন, তাঁর এ নিরক্ষরতার কথা উল্লেখ করেন। তেমনি যে সব আয়াতে তাঁকে নিরক্ষর বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সে সব আয়াতও তাদের সামনে তেলাওয়াত্ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন লোকও এ সত্য অস্বীকার করে নি এবং তাঁর এ দাবীকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে নি। এ থেকেই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিরক্ষরতার দাবী অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও এমন এক মহাগ্রন্থ নিয়ে এলেন যা দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞানে এবং বিভিন্ন ধরনের বিচারবুদ্ধিগত জ্ঞানে ও বজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ, আর তা- ও এমন পর্যায়ের যে, তা বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নির্বিশেষে বিশ্বের ে ষ্ঠ চিন্তাবিদগণকে বিস্মিত করেছে। আর এ বিস্ময়ও সর্বকালীন; সব সময়ই তা অব্যাহত থেকে আসছে এবং কোনো দিনও এ বিস্ময়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

অতএব, বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদের এ জ্ঞান ও বজ্ঞানিক তথ্যাদিতে সমৃদ্ধতা এর মু'জিযাহরই বশিষ্ট্য।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিরক্ষরতা একটি অকাট্য প্রমাণিত সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যদি তর্কের খাতিরে এ সত্য সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে রেখে কোরআন বিরোধীদের সাথে সাথে অগ্রসর হই এবং ধরে নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) নিরক্ষর ছিলেন না, বরং লেখাপড়া জানতেন এবং যে কোনো ধরনের জ্ঞান- বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি অন্যদের কাছ থেকে শিখেছিলেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিরোধীরা একটি বড় ধরনের, বরং বিস্ময়কর ধরনের দুর্বলতার শিকার হবেন, যে দুর্বলতা তাঁরা না এড়িয়ে যেতে পারবেন, না তার কোনো জবাব তাঁদের কাছে আছে।

কারণ, বিরোধীদের উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) তাঁর সমকালীন জ্ঞানী- গুণী, পণ্ডিত- মনীষী ও বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের চিন্তা- গবেষণা ও তথ্যাদি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে, তিনি মানব প্রজাতিকে যে জ্ঞানসম্পদ উপহার দিয়ে গেছেন তা তৎকালীন সমাজের মানুষের চিন্তাধারা ও 'আক্বীদাহ্- বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল তো নয়ই, বরং তার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে এটা অকাট্য সত্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সমসাময়িক যে লোকদের মাঝে তিনি লালিত- পালিত ও বড় হয়েছিলেন তাদের একাংশ ছিলো মূর্তিপূজক; তারা কল্পনা ও কুসংস্কারের অন্ধ অনুসারী ছিলো। তাদের মধ্যে একদল ছিলো আহলে কিতাব: তাদের জ্ঞান- বিজ্ঞান, আহকাম ও 'আক্বাএদের উৎস ছিলো বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' খণ্ডদ্বয়ভুক্ত পুস্তক সমূহ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে মনে করা হয়, বাইবেল হচ্ছে তাওরাত্ ও ইনজীলের (দু'টি ঐশী গ্রন্থের) সংকলন। প্রকৃত পক্ষে তা নয়। এ গ্রন্থের দু'টি অংশ যথাক্রমে ওল্ড্ টেস্টামেন্ট্ (পুরাতন নিয়ম) ও নিউ টেস্টামেন্ট (নতুন নিয়ম)- এ অনেকগুলো পুস্তক সংকলিত হয়েছে।

বাইবেলভুক্ত পুস্তকগুলোর ঐশিতা, যাদের নামে নামকরণ করা হয়েছে তাঁদের নবুওয়াতের যথার্থতা ও তাঁদের সাথে সম্পৃক্ততার সত্যতা, ঐতিহাসিকতা, বিকৃতি ইত্যাদি প্রশ্ন এবং বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের প্রশ্ন বাদ রেখে ধু বিদ্যমান বাইবেল- এর পুস্তকসমূহ সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয় যে, এর ওল্ড্ টেস্টামেন্ট অংশে তাওরাত্ ও যাবূর সহ মোট ৩৯টি পুস্তক স্থানলাভ করেছে। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি পুস্তককে (আদি পুস্তক বা সৃষ্টি পুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেভীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ বা দ্বিতীয় বিধান) তাওরাতের পাঁচটি ভাগ বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে নিউ টেস্টামেন্ট অংশে স্থানলাভ করেছে ২৭টি পুস্তক। এ পুস্তকগুলোর মধ্যে প্রথম চারটি পুস্তককে মথি), মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচারবলে দাবী করা হয়। ইনজীল্ (তবে তা তাওরাতের পাঁচটি পুস্তকের একই গ্রন্থের পাঁচ ভাগ হওয়ার মতো নয়, বরং একই ইনজীলের চারজন লেখক কর্তৃক লিখিত চারটি সংস্করণ। মূলতঃ এসব পুস্তক ঐশী ইনজীলের চারটি সংস্করণও নয়, বরং এগুলো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট লেখকগণ কর্তৃক লেখা হযরত ‘ঈসা)‘আঃ -(যাতে তাঁর ওপর নযিলকৃত ইনজীলের কতক উদ্ধৃতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ - নকাহিনীএর জীব পুস্তকগুলোর লেখকগণের কেউই হযরত ‘ঈসা)‘আঃছিলেন না। তাঁর (হাওয়ারী) এর ছ্বাহাবী -(একমাত্র যে ছ্বাহাবী একই নিয়মে ইনজীল্ লিখেছেন এবং যা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল তিনি হলেন বারনাবা (Barnabas), কিন্তু বারনাবার ইনজীলে সুস্পষ্টভাবে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ এর নাম এবং -(ছ্বাঃ) আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক সৃষ্টিকর্মের সূচনার লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তাঁর কথা উল্লিখিত থাকায় এ পুস্তকটিকে বাইবেলে স্থান দেয়া হয় নি।

আমরা যদি ধরে নেই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) স্বীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান ও শিক্ষা তাঁর সমসাময়িক ঐ সব কথিত জ্ঞানী- গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাছ্বিল্ করেছিলেন এবং কোরআনের বিষয়বস্তুসমূহ তাওরাত্ ও ইনজীল্ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তাহলে কি তার অনিবার্য দাবী এ নয় যে, কোরআন মজীদের জ্ঞান- বিজ্ঞানে ও বক্তব্যে সমকালীন ‘আক্বীদাহ্- বিশ্বাস ও চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করবে? তেমনি, এর দাবী কি এ- ও নয় যে, কোরআন

মজীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উক্ত গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে এক ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে?

কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাই যে, কোরআন মজীদ এবং বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' ভুক্ত পস্তকসমূহের মধ্যে সকল দিক থেকে বপরীত্য বিদ্যমান। 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' ভুক্ত পুস্তকসমূহ এবং তৎকালীন অন্যান্য জ্ঞানসূত্রসমূহ যে সব কল্পকাহিনী ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ কোরআন মজীদ ধু সে সব থেকে মুক্তই নয়, বরং সে সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।

কোরআন মজীদ বজ্ঞানিক ও চারিত্রিক সত্যসমূহ এবং বিচারবুদ্ধিগত ও ঐশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়সমূহকে এ সব মিথ্যা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও পবিত্র করেছে, আর তাওহীদ্ ও খোদা-পরিচিতির জ্ঞান থেকে সমকালীন সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার সমূহকে বিতাড়িত করেছে।

কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও পরিচয়ের বিষয়টিকে উপস্থাপনের পর তাঁর পরিচয় ও গুণাবলীকে এমনভাবে এবং এতোখানি উপস্থাপন করেছে যা তাঁর জন্য যথার্থভাবেই প্রযোজ্য। অন্যদিকে যা কিছু আল্লাহর ওপর আরোপ করা হলে কার্যতঃ তাঁর প্রতি দুর্বলতা ও সৃষ্টিসত্তার বশিষ্ট্য আরোপ করা হয় তাঁর পরিচিতি থেকে কোরআন মজীদ তা বিদূরিত করেছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে এ সব বশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে এবং তাঁর পবিত্র সত্তাকে এ সব মিথ্যা কল্পনার উর্ধে তুলে ধরেছে। তেমনি নবুওয়াত্ প্রশ্নেও কোরআন মজীদ প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরেছে।

এবার আমরা এ দু'টি প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত এখানে তুলে ধরবো।

তাওহীদের ধারণাকে কুসংস্কারমুক্ত করণ

প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা যাক। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করতে গিয়ে কোরআন মজীদে এরশাদ করেন :

(و قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما فى السماوات والارض كل له قانتون) .

"আর তারা (খৃস্টানরা) বলে : "আল্লাহ্ সন্তান পরিগ্রহণ করেছেন।" আল্লাহ্ পরম প্রমুক্ত (এহেন দুর্বলতা হতে), বরং আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, আর সব কিছুই তাঁর সামনে অনুগত হয়ে আছে।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১১৬)

(بديع السماوات و الارض. و اذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون.)

"তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। আর তিনি যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন সে জন্য ধু বলেন : "হও।" অতএব, তা হয়ে যায়।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১১৭)

(و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم.)

"আর তোমাদের খোদা হচ্ছেন একমবাদ্বিতীয়ম খোদা; সেই পরম দয়াময় মেহেরবান ছাড়া আর কোনো খোদা (বা দেব- দেবী)র অস্তিত্ব নেই।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৬৩)

(الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم. له ما فى السماوات و ما فى الارض.)

"আল্লাহ্ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নেই। তিনি চিরজীবী চিরন্তন শাশ্বত সত্তা; তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২৫৫)

(ان الله لا يخفى عليه شيء فى الارض و لا فى السماء.)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যমীন ও আসমানের কোনো কিছুই তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকে না।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরান : ৫)

(هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم.)

"তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে যেরূপ ইচ্ছা আকৃতি দান করেন। সেই মহাপরাক্রান্ত পরম জ্ঞানী ছাড়া আর কোনো খোদা নেই।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরান : ৬)

(ذالكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه و هو على كل شيء وكيل)

"এই হচ্ছেন আল্লাহ্ - তোমাদের প্রভু; তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসেরই স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপরই কর্তৃত্বশালী।" (সূরাহ্ আল্- আন্'আম্ : ১০২)

(لا تدركه الابصار و هو يدرک الابصار و هوا اللطيف الخبير)
"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, বরং তিনিই দৃষ্টিসমূহকে প্রত্যক্ষ করেন। আর তিনি (সকল বিষয়ে) সূক্ষ্মদর্শী সদা- অবগত।" (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ১০৩)

(قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده. فانى تؤفكون)
"(হে রাসূল!) বলে দিন : আল্লাহ্ই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনিই তাকে প্রত্যাবর্তন করাবেন (মৃত্যু ও ধ্বংসের পরে পুনরায় সৃষ্টি করবেন)। অতএব, তোমরা কোন্ দিকে ফিরে যাচ্ছো?" (সূরাহ্ ইউনুস : ৩৪)

(الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر كل يجرى لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقينون)
"আল্লাহ্ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি স্তম্ভ ছাড়াই আসমান সমূহকে সমুন্নত করেছেন - যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। এরপর তিনি ‘আরশকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সুশৃঙ্খলিত করেছেন; এদের প্রতিটিই একটি শেষ সময় পর্যন্ত গতিশীল রয়েছে। তিনিই সকল বিষয়ের সুপরিচালনা করেন। (এভাবে) তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর সন্নিধানে উপনীত হবার ব্যাপারে প্রত্যয়ে উপনীত হতে পারো।" (সূরাহ্ আর্- রা‘দ্ : ২)

(و هو الله لا اله الا هو. له الحمد فى الاولى و الآخرة و له الحكم و اليه ترجعون)
"আর তিনিই আল্লাহ্; তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁর প্রশংসা সমস্ত কিছুর সূচনাপর্ব থেকে রু করে সব কিছুর শেষ পর্যন্ত। আর অকাট্য সিদ্ধান্তের এখতিয়ার কেবল তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করছো।" (সূরাহ্ আল্- ক্বাছ্বাছ্ব : ৭০)

(هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم)
"তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত; তিনি পরম দয়াময় মেহেরবান।" (সূরাহ্ আল্- হাশর : ২২)

(هو الله الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون)

“তিনিই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি নিরঙ্কুশ অধিকর্তা, সমস্ত রকমের দোষ- ত্রুটি- দুর্বলতা থেকে প্রমুক্ত- পবিত্র, শান্তির উৎস, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রান্ত, পরম শক্তিমান ও গৌরবের প্রকৃত অধিকারী। লোকেরা তাঁর সাথে যা কিছুকে শরীক করছে তা থেকে তিনি পরম প্রমুক্ত।” (সূরাহ্ আল্- হাশর : ২৩)

(هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما فى السماوات والارض. و هو العزيز الحكيم)

“সেই আল্লাহ্ই সৃষ্টিকর্তা, উদগতকারী, আকৃতিদাতা; তাঁর রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। আসমান সমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। বস্তুতঃ তিনি মহাপরাক্রান্ত পরম জ্ঞানী।” (সূরাহ্ আল্- হাশর : ২৪)

কোরআন মজীদ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা‘আলাকে এভাবে পরিচিত করেছে - এভাবেই তাঁর গুণাবলী তুলে ধরেছে। কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সে পন্থাই অবলম্বন করেছে বিচারবুদ্ধি যাকে স্বীকৃতি প্রদান করে ও যার সত্যতা প্রতিপাদন করে। বস্তুতঃ সুস্থ বিচারবুদ্ধি সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ পথ ধরেই অগ্রসর হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জাহেলীয়াতের পরিবেশে জীবনযাপনকারী একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কি এটা আদৌ সম্ভব যে, তিনি বিচারবুদ্ধিগত, জ্ঞানগত ও দার্শনিক সত্য সমূহ এতো উন্নত পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করবেন ও বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন? অতএব, এতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, এ কোরআন মজীদ তাঁর নিজের রচিত গ্রন্থ নয়, বরং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ।

নবুওয়াতের ধারণাকে কুসংস্কারমুক্ত করণ

কোরআন মজীদ অতীতের নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) সম্পর্কে কথা বলেছে। এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদ তাঁদেরকে সর্বোত্তম গুণাবলী সহকারে উল্লেখ করেছে, আর তা এমনভাবে উল্লেখ করেছে যে, এর চেয়ে উন্নততর গুণ কল্পনা করা যায় না। নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) ৫ ষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার জন্য যে সব গুণ তাঁদের মধ্যে থাকা অপরিহার্য কোরআন মজীদ তা- ই তাঁদের প্রতি আরোপ

করেছে। অন্যদিকে যে সব খারাপ বশিষ্ট্য নবুওয়াত্ ও খোদায়ী রিসালাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা থেকে তাঁদেরকে মুক্ত ও পবিত্র রূপে তুলে ধরেছে।

এখানে এ পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছি :

(الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التورة والانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث)

"যারা (এ কোরআনে ঈমান পোষণ করে তারা) এমন এক রাসূলের অনুসরণ করে যিনি উম্মী নবী - যার কথা তারা তাদের কাছে মওজূদ তাওরাত্ ও ইনজীলে লিখিতরূপে পাচ্ছে; তিনি তাদেরকে ভালো ও কল্যাণমূলক কাজের নির্দেশ দেন ও মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করেন ও তাদের জন্য নোংরা-অপবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম করে দেন।" (সূরাহ্ আল্- আ'রাাফ্ : ১৫৭)

এখানে উল্লেখ্য যে, "উম্মী" শব্দের আভিধানিক অর্থ মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য দুনিয়ায় আগমনকারী এবং এর পারিভাষিক অর্থ নিরক্ষর। যেহেতু সদ্যজাত শি লেখাপড়া জানে না সেহেতু নিরক্ষর লোককে তার সাথে তুলনা করা হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকদের গুরুত্ব তুলে ধরা। নবী করীম (ছ্বাঃ)কে নিরক্ষর রাখার পিছনে নিহিত আল্লাহ্ তা'আলার মহাপ্রজ্ঞাময় লক্ষ্য হচ্ছে কোরআন মজীদের নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর দ্বারা রচিত না হওয়ার তথা মু'জিযাহ্ হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর যৌক্তিক প্রতিপন্ন করা। সূরাহ্ আল্- জুমু'আয় (আয়াত নং ২) এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। এখানে সুস্পষ্ট যে "উম্মী" শব্দটি কেবল পারিভাষিক "নিরক্ষর" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে (সূরাহ্ আল্- আ'রাাফ্ : ১৫৭) "উম্মী" শব্দটিকে "নবী" শব্দের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে "জন্মমুহূর্ত থেকে নবী" তথা "নবী হিসেবে জন্মগ্রহণকারী" তাৎপর্য গ্রহণ করাই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয় (যদিও চল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে তা অবহিত করা ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়)। তবে যেহেতু কোরআন মজীদের

একই আয়াতের একাধিক বাহ্যিক তাৎপর্য আছে সেহেতু “জন্মমুহূর্ত থেকে নবী” ও “নিরক্ষর নবী” উভয় অর্থই এতে নিহিত রয়েছে বলে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

(هو الذى بعث فى الاميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته و يزكهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة. و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين)

“তিনিই সেই সত্তা যিনি তাদের মধ্যকার নিরক্ষরদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল উত্থিত করেছেন যিনি তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত পড়ে শোনান ও তাদেরকে পরি দ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব্ ও অকাট্য জ্ঞান শিক্ষা দেন। নচেৎ এর আগে তো তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।” (সূরাহ্ আল্- জুমু‘আহ্ : ২)

(و ان لک لاجرا غير ممنون. و انک لعلى خلق عظيم)

“আর (হে রাসূল!) অবশ্যই আপনার জন্য রয়েছে অফুরন্ত উত্তম প্রতিদান। আর অবশ্যই আপনি সুমহান ও উন্নততম চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অধিকারী।” (সূরাহ্ আল্- ক্বালাম্ : ৩- ৪)

(ان الله اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين)

“অবশ্যই আল্লাহ্ আদম, নূহ্, আালে ইবরাহীম্ ও আালে ‘ইমরান্‌কে বিশ্ববাসীদের ওপর নির্বাচিত করেছেন।” (সূরাহ্ আালে ‘ইমরান্ : ৩৩)

(و اذ قال ابراهيم لابيه و قومه اننى برآء مما تعبدون الا الذى فطرنى فانه سيهدين)

“ইবরাহীম্ যখন তার পিতা ও তার ক্বওমকে বললো : তোমরা যা কিছুর পূজা করছো নিঃসন্দেহে আমি সে সবের প্রতি বিরূপ; কেবল তাঁর প্রতি বিরূপ নই যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং অবশ্যই তিনি অচিরেই আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।” (সূরাহ্ আয্- যুখরূফ : ২৬- ২৭)

(و كذالک نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض و ليكون من الموقنين)

“আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান সমূহ ও যমীনের মালাকূত্ (অদৃশ্য জগত) প্রদর্শন করেছি, আর তা করেছি এ উদ্দেশ্যে যাতে সে ইয়াক্বীন্ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।” (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ৭৫)

(و وهبنا له اسحاق و يعقوب كلا هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذالک نجزى المحسنين. و زكريا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصالحين. و اسماعيل واليسع و يونس و لوطا و كلا فضلنا على العالمين. و من آبائهم و ذرياتهم و اخوانهم و اجتبيناهم و هديناهم الى صراط مستقيم)

"আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক্ব্ ও ইয়াক্বূবকে দান করেছি; এদের উভয়কেই পথপ্রদর্শন করেছি। আর নূহ্; ইতিপূর্বে তাকেও আমি পথপ্রদর্শন করেছি। আর তার (ইবরাহীমের) বংশধরদের মধ্য থেকে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূন্ (এদেরকেও পথপ্রদর্শন করেছি)। আর এভাবেই আমি যথোপযুক্ত লোকদেরকে ভ প্রতিদান প্রদান করে থাকি। (তেমনি) যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, 'ঈসা ও ইল্ইয়াস - এদের প্রত্যেকেই যথোপযুক্ত ছিলো, আর ছিলো ইসমা'ঈল, ইল্ইয়াসা', ইউনুস ও লূত্ব্। এদের প্রত্যেককেই আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর মর্যাদাবান করেছি। তেমনি তাদের পিতাদের, সন্তানদের ও ভ্রাতাদেরকে (বিশ্ববাসীর ওপর মর্যাদাবান করেছি) এবং তাদেরকে নির্বাচিত করেছি ও সহজ- সরল সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করেছি।" (সূরাহ্ আল্- আন্'আম্ : ৮৪- ৮৭)

(و لقد اتينا داود و سليمان علماً و قالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين)

"আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি। আর তারা বললো : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দাহর ওপর মর্যাদাবান করেছেন।" (সূরাহ্ আন্- নামল : ১৫)

(و اذكر اسماعيل واليسع و ذالكفل و كل من الاخيار)

"আর (হে রাসূল!) ইসমা'ঈল, ইল্ইয়াসা' ও যালকিফল্- এর কথা স্মরণ করুন; তাদের প্রত্যেকেই অধিকতর উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।" (সূরাহ্ ছ্বাদ্ : ৪৮)

(اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذرية ابراهيم و اسرائيل و ممن هدينا و اجتبينا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكيا)

"এরা হচ্ছে সেই লোক যাদের ওপর আল্লাহ্ নে'আমত বর্ষণ করেছেন; এরা হচ্ছে আদমের বংশধরদের মধ্যকার নবীগণ, আর তাদের মধ্যে রয়েছে সেই লোকেরা যাদেরকে আমি নূহের

সাথে (নৌকায়) বহন করে নিয়েছিলাম, আর এদের (নে‘আমতপ্রাপ্তদের) মধ্যে রয়েছে ইবরাহীম্ ও ইসরা‘ঈলের বংশধরদের মধ্যকার লোক; এরা হলো সেই লোক যাদেরকে আমি পথপ্রদর্শন করেছি ও নির্বাচিত করেছি। এদের সামনে যখনই পরম দয়াময়ের আয়াত তেলাওয়াত্ করা হতো তখনই এরা সিজদায় অবনত হতো ও ক্রন্দন করতো।” (সূরাহ্ মারইয়াম : ৫৮)
[স্মর্তব্য, অত্র আয়াতটি সিজদাহর আয়াত সমূহের অন্যতম।]

এই হলো কোরআন মজীদে নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) গুণাবলী বর্ণনা, পবিত্রতা ঘোষণা এবং তাঁদের মর্যাদা ও ৫ ষ্ঠত্ব বর্ণনাকারী আয়াত সমূহের অংশবিশেষ।

বাইবেলে আল্লাহ্ ও নবীদের পরিচয় (আঃ)

আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও গুণাবলী এবং নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোরআন মজীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার পর এখন আমরা দেখবো এ দু'টি বিষয়ে বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' ভুক্ত পুস্তক সমূহ কী বলছে। তাহলে আমাদের কাছে দু'টি বিষয় পরিস্কার হয়ে যাবে। প্রথমতঃ বাইবেলের পুস্তকগুলো বিকৃত হয়ে গেছে; এখন আর নির্ভেজাল ঐশী কিতাব্ আকারে বর্তমান নেই, দ্বিতীয়তঃ এ সব পুস্তক অধ্যয়ন করে তার সাহায্যে কোরআন মজীদের ন্যায় গ্রন্থ্ রচনা করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে উভয় 'নিয়ম'- এর বিভিন্ন পুস্তকে প্রচুর বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদ যতোখানি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে ও তাঁকে দোষ- ত্রুটি- দুর্বলতা থেকে মুক্তরূপে তুলে ধরেছে এবং নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) যেভাবে মানবিক মর্যাদার সুউচ্চতম চূড়ায় উন্নীত করে তুলে ধরেছে, উক্ত পুস্তকসমূহ (এগুলোর বিদ্যমান বিকৃত রূপ) ঠিক ততোখানিই আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদাকে নীচে নামিয়ে এনেছে এবং যে কোনো ধরনের গর্হিত কাজকেই নবী- রাসূলগণের ('আঃ) প্রতি আরোপ করেছে।

এ সত্যটি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরার লক্ষ্যে এখানে বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করবো। তবে এখানে পুনরায় স্মর্তব্য যে, 'পুরাতন নিয়ম'- এর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকসমূহ হচ্ছে ঐশী পুস্তকের বিকৃত সংস্করণ; মূল ঐশী পুস্তকসমূহ এ সব ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলো। অন্যদিকে 'নতুন নিয়ম'ভুক্ত পুস্তকগুলো আদৌ ঐশী পুস্তক নয়, বরং পুরোপুরি মানব রচিত পুস্তক, তবে প্রথম চারটি পুস্তক হচ্ছে হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর জীবনকাহিনী যাতে ইনজীলের অনেক আয়াতও উদ্ধৃত হয়েছে।

(১) হযরত আদম ('আঃ) ও বিবি হাওয়া ('আঃ)- এর সৃষ্টি এবং বেহেশত থেকে তাঁদের বহির্গত হবার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে আদেশ দিলেন, তুমি এ বাগানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে খাও, কিন্তু সদসদ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খেয়ো না, কারণ, যেদিন তার ফল খাবে সেদিন মরবেই মরবে। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, মানুষের একাকী থাকা ভালো নয়, আমি তার জন্য তার অনুরূপ সহকারিনী বানাই। .... পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করলে সে নিদ্রিত হলো; আর তিনি তার একখানা পাঁজর (- এর অস্থি) নিয়ে মাংস দিয়ে সে জায়গা পূরণ করলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হতে গৃহীত সে পাঁজর দ্বারা এক স্ত্রী তরী করলেন ও তাকে আদমের পাশে আনলেন। .... ঐ সময় আদম ও তার স্ত্রী উভয়ই উলঙ্গ থাকতো, আর তাদের লজ্জাবোধ ছিলো না।” (আদি পুস্তক, ২ : ১৬- ১৮, ২১- ২৩ ও ২৫)

“সদাপ্রভু ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ সর্বাপেক্ষা খল ছিলো। সে ঐ নারীকে বললো : ঈশ্বর কি বাস্তবিকই বলেছেন যে, তোমরা বাগানের কোনো বৃক্ষের ফল খেয়ো না? নারী সাপকে বললো : আমরা এ বাগানের সকল বৃক্ষের ফল খেতে পারি, কেবল বাগানের মাঝখানে যে বৃক্ষটি আছে তার ফল সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছেন, তোমরা তা খেয়ো না - স্পর্শও করো না; করলে মরবে। তখন সাপ নারীকে বললো : কোনোক্রমেই মরবে না। কারণ, ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, তাতে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হয়ে সদসদ জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। নারী যখন দেখলো, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর জন্য লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলে বাঞ্ছনীয়, তখন সে তার ফল আহরণ করে খেলো। পরে সে নিজের ন্যায় তার স্বামীকেও দিলো, আর সে- ও খেলো। এতে তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, তারা উলঙ্গ, আর তারা ডুমুর পাতা সেলাই করে ঘাগড়া তরী করে নিলো। পরে তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর নতে পেলো; দিনের অবসানে তিনি বাগানে পায়চারি করছিলেন। এতে আদম ও তার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে থেকে বাগানের বৃক্ষসমূহের মাঝে লুকালো। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন : তুমি কোথায়? সে বললো : আমি বাগানে তোমার কণ্ঠস্বর নে ভীত হয়েছি। কারণ, আমি উলঙ্গ, তাই নিজেকে লুকিয়েছি। তিনি বললেন : তুমি যে উলঙ্গ তা তোমাকে কে বললো? যে বৃক্ষের ফল খেতে

তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি কি তার ফল খেয়েছো? . . . . আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন : দেখো, মানুষ সদসদ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমাদের মতো হলো; এখন পাছে সে হাত বাড়িয়ে জীবনবৃক্ষের ফলও আহরণ করে খেয়ে অনন্তজীবী হয় - এ কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে আদন্-এর (অবিনশ্বর) বাগান থেকে বের করে দিলেন যাতে সে যে মাটি থেকে সৃষ্ট তাতেই কাজ করে। এভাবে ঈশ্বর মানুষকে তাড়িয়ে দিলেন এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করার জন্য আদন্- এর (অবিনশ্বর) বাগানের পূর্ব দিকে দেয়াল তুলে দিলেন ও তার ওপরে ঘূর্ণায়মান খড়্গ স্থাপন করলেন।" (আদি পুস্তক, ৩ : ১- ১১ ও ২২- ২৪)

এখানে লক্ষণীয়, এই তথাকথিত আসমানী গ্রন্থ কীভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তায় মিথ্যাবাদিতা আরোপ করছে এবং তাঁর প্রতি ট কৌশল, ছুতা, মিথ্যা ও ভীতি আরোপ করছে - বলছে, সদাপ্রভু ঈশ্বর মিথ্যার আ য় নিয়ে আদমকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছেন ও বলেছেন যে, ওটি হচ্ছে মৃত্যুর বৃক্ষ, অতঃপর যেহেতু সদাপ্রভু ঈশ্বর ভয় পেয়ে যান যে, আদম ('আঃ) হয়তো জীবনবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলবেন ও অবিনশ্বর জীবনের অধিকারী হবেন এবং তাঁর খোদায়ী ও আধিপত্য ব্যাহত করবেন, সেহেতু তিনি আদম ('আঃ)কে বেহেশত থেকে বের করে দেন।

অন্যদিকে এই তথাকথিত আসমানী গ্রন্থে এমন কথা বলা হয়েছে যার মানে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার শরীর আছে এবং তিনি বেহেশতের মধ্যে পদচারণা করছিলেন। তেমনি এ গ্রন্থ সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অজ্ঞতার অপবাদ আরোপ করছে - বলছে, আদম ('আঃ) কোথায় লুকিয়ে ছিলেন সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন, তাই আদম ('আঃ)কে এই বলে ডেকেছিলেন : "তুমি কোথায়?"

সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে এ গ্রন্থে সাপরূপী শয়তানকে মানুষের জন্য কল্যাণকামী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ, এ গ্রন্থ বলছে যে, শয়তান আদম ('আঃ)কে উপদেশ দিয়ে (জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে) মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে এবং ভালো- মন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখিয়ে দেয়।

(২) বর্তমানে বিদ্যমান তাওরাতে হযরত ইবরাহীম্ (‘আঃ) ও ফির্‘আউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। [স্মর্তব্য, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত মিসরের সম্রাটদের উপাধি ছিলো “ফির্‘আউন্”। অতএব, বলা বাহুল্য যে, এখানে উল্লিখিত ফির্‘আউন হযরত মূসা (‘আঃ)- এর সময়কার ফির্‘আউন নয় এবং এ ফির্‘আউনের খারাপ বা খোদাদ্রোহী হওয়া সম্পর্কেও নিশ্চিত ধারণা পোষণ করা সঙ্গত হবে না।]

তাওরাতে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ :

“আর দেশে দুর্ভিক্ষ হলো। তখন ইবরাহীম্ মিসরে প্রবাস করতে যাত্রা করলো। কারণ, কেন‘আন্ দেশে ভারী দুর্ভিক্ষ হলো। আর ইবরাহীম্ যখন মিসরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো তখন সে তার স্ত্রী সারাহকে বললো : দেখো, আমি জানি, তুমি দেখতে সুন্দরী; এ কারণে মিসরীয়রা যখন তোমাকে দেখবে তখন তুমি আমার স্ত্রী বিধায় আমাকে হত্যা করবে আর তোমাকে জীবিত রাখবে। অনুরোধ করি, বলো যে, তুমি আমার বোন - যাতে তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয় ও তোমার কারণে আমার প্রাণ বেঁচে যায়। পরে ইবরাহীম্ মিসরে প্রবেশ করলে মিসরীয়রা ঐ স্ত্রীকে পরমা সুন্দরী দেখলো। আর ফির্‘আউনের অধ্যক্ষগণ তাকে দেখে ফির্‘আউনের সামনে তার প্রশংসা করলো। এতে সে স্ত্রী ফির্‘আউনের বাড়ীতে নীত হলো। আর তার অনুরোধে সে (ফির্‘আউন্) ইবরাহীমকে আদর- যত্ন করলো। এতে ইবরাহীম্ মেষ, গরু, গাধা, দাস- দাসী ও উট পেলো। কিন্তু ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহর কারণে সদাপ্রভু ফির্‘আউন্ ও তার পরিবারের ওপর কঠিন কঠিন উৎপাতের সৃষ্টি করলেন। এতে ফির্‘আউন ইবরাহীমকে ডেকে বললো : “আপনি আমার সাথে এ কি আচরণ করলেন! তিনি যে আপনার স্ত্রী এ কথা আমাকে কেন বলেন নি? তাঁকে আপনার বোন বললেন কেন? আমি তো তাকে বিবাহ করার জন্য নিয়েছিলাম। এখন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান।” তখন ফির্‘আউন লোকদেরকে তার সম্পর্কে আদেশ দিলো, আর তারা সর্বস্বের সাথে তাকে ও তার স্ত্রীকে বিদায় করলো।” (আদি পুস্তক, ১২ : ১০- ২০)

বাইবেলের এ বক্তব্যের নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) নিজেই নতিক দুর্বলতা ও চারিত্রিক দুর্নীতির নায়ক ছিলেন, যে কারণে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন - যার ফলে ফির্'আউন তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণে উদ্যত হয়েছিলো। কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম এবং সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত নবী-রাসূলগণের ('আঃ) অন্যতম হযরত ইবরাহীম্ ('আঃ) এহেন জঘন্য কাজ করবেন যা কোনো সাধারণ মানুষও করে না।

(৩) হযরত লূত্ব্ ('আঃ) ও তাঁর কন্যাদের সম্পর্কে বাইবেল যা বলে তা অধিকতর জঘন্য। বাইবেল বলেছে :

"পরে লূত্ব্ ও তার দুই কন্যা সোয়র হতে পর্বতে উঠে সেখানে গিয়ে থাকলো। কারণ, সে সোয়রে বাস করতে ভয় করলো। আর সে ও তার দুই কন্যা গুহার মধ্যে বসতি করলো। পরে তার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে বললো : আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগতসংসারের রীতি অনুসারে আমাদের সাথে উপগত হবে এ দেশে এমন কোনো পুরুষ নেই। অতএব, এসো, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে তার সাথে শয়ন করি; এরূপে পিতার বংশ রক্ষা করবো। তাতে তারা সে রাতে নিজ পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করালো এবং তার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সাথে শয়ন করতে গেলো। কিন্তু তার শয়ন ও উঠে যাওয়া লূত্ব্ টের পেলো না। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে বললো : দেখো, গত রাতে আমি পিতার সাথে শয়ন করেছি। এসো, আমরা আজ রাতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই। তারপর তুমি গিয়ে তাঁর সাথে শয়ন করো; এভাবে পিতার বংশ রক্ষা করবে। এভাবে তারা সে রাতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করালো; পরে কনিষ্ঠা উঠে গিয়ে তার সাথে শয়ন করলো। কিন্তু তার শয়ন করা ও উঠে যাওয়া লূত্ব্ টের পেলো না। এভাবে লূত্বের দুই কন্যাই আপন পিতা থেকে গর্ভবতী হলো।" (আদি পুস্তক, ১৯ : ৩০-৩৬)

এই হলো বর্তমানে তাওরাত্ নামধারী গ্রন্থের অবস্থা যা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত মহান ও পবিত্র পয়গাম্বর হযরত লূত্ব্ ('আঃ) ও তাঁর কন্যাদের সম্পর্কে এ ধরনের কল্পকাহিনী ফেঁদেছে। বিচারবুদ্ধির অধিকারী যে কোনো লোকের কাছেই এর মিথ্যা ও জঘন্যতা সুস্পষ্ট।

(৪) হযরত ইসহাক্ (‘আঃ) এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র সম্পর্কে বাইবেলে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে তা এই রূপ :

হযরত ইসহাক্ (‘আঃ) স্বীয় পুত্র ‘ঈসূ- কে নবুওয়াত্ দিতে চাইলেন। কিন্তু ঐ সময় তাঁর অপর এক পুত্র ইয়া‘ক্বূব্ (‘আঃ) ইসহাক্ (‘আঃ)কে ধোঁকা দিলেন এবং তাঁর সামনে ভান করলেন যে, তিনিই ‘ঈসূ, আর তাঁকে (ইসহাক্) অভ্যর্থনা করার জন্য খাদ্য ও মদ্য প্রস্তুত করলেন। ইসহাক্ (‘আঃ) উক্ত খাদ্য ও মদ্য গ্রহণ করলেন। এরপর, ইয়া‘ক্বূব্ (‘আঃ) নবুওয়াত্ লাভের জন্য যে প্রতারণা ও ট কৌশলের আ য় নিলেন তার প্রভাবে ইসহাক্ (‘আঃ) তাঁর জন্য দো‘আ করলেন এবং বললেন : “তুমি তোমার ভাইদের ওপর কর্তৃত্বশালী হও এবং তোমার মায়ের সন্তানরা তোমার কাছে অবনত ও ছোট হয়ে থাকুক। অভিশাপ তাদের ওপর যারা তোমাকে অভিশাপ দেয় এবং আনন্দ ও অভিনন্দন তাদের জন্য যারা তোমাকে অভিনন্দন জানায়।”

এরপর বলা হয়েছে :

“ঈসূ যখন এলো তখন বুঝতে পারলো যে, তার ভাই ইয়া‘ক্বূব্ নবুওয়াত্ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তখন সে তার পিতাকে বললো : “পিতা আমাকেও নবুওয়াতের মর্যাদা প্রদানে ধন্য করুন।” ইসহাক্ বললো : “তোমার ভাই চাতুরী ও ট কৌশলে অত্যন্ত পাকা; সে বরকত্ ও নবুওয়াত্ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।” তখন ‘ঈসূ বললো : কেন আপনি আমার জন্য বরকত্ রাখলেন না? ইসহাক্ বললো : “আমি তাকে তোমার ওপরে কর্তৃত্বশালী করে দিয়েছি এবং তোমার অন্যান্য ভাইকে তার গোলামে পরিণত করে দিয়েছি। আর তাকে গম ও পানীয় প্রদান করে সম্পদশালী ও শক্তিশালী করে দিয়েছি। পুত্র! এরপর আর তোমার জন্য কী করতে পারি!” তখন ‘ঈসূ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে ফেললো।” (আদি পুস্তক, ২৭ : ১- ৩৮)

ভেবে দেখুন, নবুওয়াতের পদ ছিনিয়ে নেয়ার কথা কি কল্পনা করা যায়, নাকি বিচারবুদ্ধি তা সম্ভব বলে মনে করে? আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদীকে নবুওয়াত্ প্রদান করা আদৌ সম্ভব কি? সত্যিই কি হযরত ইয়া‘কূব্ (‘আঃ) ধোঁকা- প্রতারণার আ য় নিয়েছিলেন এবং তার সাহায্যে হযরত ইসহাক্বকে (‘আঃ) প্রতারিত করেছিলেন? আর এর ফলে

আল্লাহ্ তা'আলাও কি পারেন নি নবুওয়াতকে তার যথাযথ হক্বদারের কাছে প্রত্যর্পণ করতে? تعالی اللہ عن ذالک علواً کبیراً - নিশ্চয়ই সমুন্নত মহান আল্লাহ্ এরূপ অবস্থার অনেক উর্ধে।

হয়তোবা মদ্যপানজনিত মাতলামীর ঘোরেই লোকেরা এ ধরনের বাজে কল্পকাহিনী তরী করে থাকবে যে কল্পকাহিনীতে হযরত ইসহাক্ব ('আঃ)- এর ন্যায় একজন মহান পয়গাম্বরের প্রতি মদ্যপানের দুর্নাম আরোপ করা হয়েছে।

(৫) বাইবেলে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত ইয়া'কূব্ ('আঃ)- এর পুত্র ইয়াহূদা স্বীয় পুত্র 'ইর্- এর স্ত্রী ছামার্- এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন; এর ফলে ছামার্ গর্ভবতী হন এবং ফারেছ্ ও জারে' নামে দু'টি সন্তান জন্ম দেন। (আদি পুস্তক, ৩৮ : ৬- ৩০)

অন্যদিকে ইনজীলের মথি পুস্তকে হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত 'ঈসা ('আঃ) এবং হযরত সোলায়মান ('আঃ) ও তাঁর পিতা হযরত দাউদ ('আঃ) হচ্ছেন ফারেছ্- এর বংশধর - আদি পুস্তকের দাবী অনুযায়ী যার জন্ম পুত্রবধুর সাথে ইয়াহূদার ব্যভিচারের ফলে।

কিন্তু বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এটা একবোরেই অসম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারের বংশধারায় নবী পাঠাবেন, তা- ও আবার পুত্রবধুর ন্যায় মাহরামের সাথে ব্যভিচারজাত বংশধারায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত তাওরাতের রচয়িতাদের কাছে নিজেদের কথা ও লেখারই কোনো মূল্য নেই, তাই নবী- রাসূলদের ('আঃ) সম্পর্কে ঘৃণ্য অপবাদমূলক কল্পকাহিনী রচনা করতে তাদের দ্বিধা নেই। অবশ্য অসম্ভব নয় যে, হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী ইয়াহূদী যাজক ও পণ্ডিতরা তাঁকে হেয় করার হীন উদ্দেশ্যে তাওরাত্ বিকৃত করে এহেন জঘন্য মিথ্যা সংযোজন করে থাকবে।

(৬) বাইবেলের 'শামূয়িলের দ্বিতীয় পুস্তক'- এ হযরত দাউদ ('আঃ) সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই :

দাউদ (‘আঃ) দ্বীনদার মুজাহিদ উরিয়ার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেন। ফলে উরিয়ার স্ত্রী গর্ভবতী হলো। এমতাবস্থায় বেইজ্জত হবার ভয়ে দাউদ (‘আঃ) ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের অপরাধ চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে উরিয়াকে ঘরে ফিরে গিয়ে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার নির্দেশ দিলেন যাতে তার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের বিষয়টিকে স্বয়ং উরিয়ার বলে চালিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু উরিয়া ঘরে ফিরে যেতে অস্বীকার করে বললো : “প্রভু আমার! ইউআব্ আর তার দাসেরা যখন এ মরুভূমির মাঝে অবস্থান করছে তখন আমি ঘরে ফিরে যাবো এবং পানাহারে অন্তরকে পরিতৃপ্ত করবো, আর স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো? আপনার প্রাণের শপথ! আমি কখনোই এরূপ করবো না।”

দাউদ (‘আঃ) স্বীয় কৃতকার্য চাপা দেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সেদিনকার মতো উরিয়াকে নিজের কাছে রাখলেন এবং তাঁর সাথে খানা খাওয়ার ও মদপানের জন্য দাও‘আত করলেন। এভাবে তিনি উরিয়াকে মাতাল করে দিলেন এবং পরদিন তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ইউআব্- কে লিখলেন যে, উরিয়াকে যেন কোনো কঠিন যুদ্ধে সন্যদের অগ্রভাগে দেয়া হয় ও পরে তাকে একাকী ছেড়ে আসা হয় যাতে সে নিহত হয়। দাউদের নির্দেশ অনুযায়ী ইউআব্ তা- ই করলে উরিয়া নিহত হলো। উরিয়ার নিহত হবার খবর পাওয়ার পর দাউদ (‘আঃ) উরিয়ার স্ত্রীকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তার স্বামীর মৃত্যুজনিত শোক- কাল শেষ হবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিবাহ করলেন। (শামূয়িলের দ্বিতীয় পুস্তক, ১১ : ১- ২৭)

অন্যদিকে বাইবেলের মথি পুস্তকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত সোলায়মান (‘আঃ) হলেন নবী হযরত দাউদ (‘আঃ)- এর পুত্র; তিনি দাউদ (‘আঃ)- এর উপরোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

এ ক্ষেত্রেও প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা এই যে, হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর নবুওয়াত অস্বীকারকারী ইয়াহূদী যাজক ও পণ্ডিতরা তাঁকে হেয় করার একই হীন উদ্দেশ্যে তাওরাত্ বিকৃত করে এ মিথ্যা কাহিনী সংযোজন করে থাকবে।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এই মিথ্যা রচনাকারীরা কীভাবে খোদায়ী মর্যাদার বরাবরে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে! আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলদের ('আঃ) পক্ষে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি সামান্যতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোনো লোকের পক্ষেও কি এহেন জঘন্য অপকর্মে জড়িত হওয়া সম্ভব? তাছাড়া ইনজীলে হযরত 'ঈসা ('আঃ) সম্পর্কে যে বলা হয়েছে : "মসীহ্ (ঈসা) তাঁর পিতা (পূর্বপুরুষ) দাউদের সিংহাসনে বসলেন; - তা এ অপবাদের সাথে কী করে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে?

(৭) বাইবেলে হযরত সোলায়মান ('আঃ) সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে :

সোলায়মান ('আঃ)-এর সাতশ' স্ত্রী ছিলো স্বাধীনা নারী, আর তিনশ' জন ছিলো উপপত্নী। এই নারীরা তাঁর অন্তরকে মূর্তি ও কল্পিত দেবদেবীদের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। ফলে সোলায়মান ('আঃ) ছাদূনীদের দেবমূর্তি আশতুরাত্ ও আমূনীদের দেবমূর্তি মাল মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও তাদের কাছে গেলেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে সদাপ্রভু সোলায়মান ('আঃ)কে বললেন : "আমি তোমার কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ও বাদশাহী ছিনিয়ে নেবো এবং তোমার কৃতদাসদের মধ্য থেকে কাউকে তা দান করবো।" (রাজকবৃন্দ প্রথম পুস্তক, ১১ : ১-১১)

হযরত সোলায়মান ('আঃ) সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে :

সোলায়মান ('আঃ) আশতুরাত্ (ছাদূনীদের দেবতা), কামূশ্ (মুআবীদের দেবতা) ও মাল ম্ (আমূনীদের দেবতা)-এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন জমকালো ও সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন। পরে সম্রাট ইউশিয়া উক্ত দেবমন্দিরগুলোকে অপবিত্র করেন; তিনি সেখানকার মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেন, সেখানকার গাছগুলোকে কেটে ফেলেন এবং উক্ত মন্দিরগুলো ও অন্যান্য দেবমন্দিরের চিহ্ন পর্যন্তও মুছে ফেলেন। (রাজকবৃন্দ দ্বিতীয় পুস্তক, ২৩ : ১-১৪)

যদিও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে নবী-রাসূলদের ('আঃ) নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তথাপি যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, নবী-রাসূলগণের ('আঃ) জন্য নিষ্পাপ হওয়া অপরিহার্য নয়, তথাপি সুস্থ বিচারবুদ্ধি এটা কল্পনা করতে পারে কি যে, কোনো নবী মূর্তির পূজা করবেন এবং সুউচ্চ ও জমকালো দেবমন্দির নির্মাণ করবেন, অথচ একই সাথে

তিনি মানুষকে একেশ্বরবাদ ও এক খোদার উপাসনার দিকে অনবরত আহবান জানাতে থাকবেন? এ দু'টি বিষয় কি বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে সম্ভব, নাকি এ দু'টি বশিষ্ট্যের মধ্যে কোনোরূপ সামঞ্জস্য আছে?

(৮) হাওশা' পুস্তকে বলা হয়েছে :

"হাওশা'র প্রতি সদাপ্রভুর প্রথম বাণী ছিলো এই : "যাও, তোমার নিজের জন্য ব্যভিচারিনী স্ত্রী ও ব্যভিচারজাত সন্তান খুঁজে নাও। কারণ, এ ধরণীপৃষ্ঠ কার্যতঃ সদাপ্রভুর কাছ থেকে ব্যভিচারকারীদের হাতে চলে গেছে।" আর হাওশা'ও বালায়েম্‌-এর কন্যা গওহারকে গ্রহণ করলো এবং তার থেকে দু'টি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো।" (হাওশা', ১ : ১-৯)

একই পুস্তকে আরো বলা হয়েছে : "সদাপভু হাওশা'কে বললেন : তুমি ব্যভিচারিনী ও উপপতির অধিকারী নারীকে ভালোবাসো ঠিক যেভাবে সদাপ্রভু বানী ইসরাঈলকে ভালোবাসেন।" (হাওশা', ৩ : ১)

মানবিক বিচারবুদ্ধি কি কল্পনা করতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবীকে ব্যভিচারের জন্য এবং ব্যভিচারিনী নারীকে ভালোবাসার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন? تعالى الله عن ذالك علواً كبيراً - নিশ্চয়ই সমুন্নত মহান আল্লাহ্‌ এরূপ অবস্থার অনেক উর্ধে।

এ সব বক্তব্য যে কত জঘন্য ও নোংরা তা এ সবের রচয়িতারা যদি লক্ষ্য না করে থাকে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় এ কারণে যে, বর্তমান নভঃপরিভ্রমণের যুগে সুসভ্য লোকেরা, এমনকি জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' ও 'নতুন নিয়ম' ভুক্ত পুস্তকসমূহে উল্লিখিত এ সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন নোংরা বক্তব্য পড়েন কী করে এবং এরপরও এ জাতীয় বক্তব্য ও এ সব পুস্তককে ঐশী বাণী বলে বিশ্বাস করেন কী করে!

হ্যা অন্ধ অনুসরণ ও অভ্যাস হচ্ছে এমন বিষয় যা নিজে নিজেই পরিবর্তিত হয়ে যায় না। এহেন অভ্যাস ও অনুসরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং সত্যের সন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন কাজ; এ কাজের জন্য যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন।

(৯) বাইবেলের 'নতুন নিয়ম' ভুক্ত বিভিন্ন পুস্তকে বলা হয়েছে :

একদিন মাসীহ্ [হযরত 'ঈসা ('আঃ)] জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন। তখন তাঁর মা ও ভাইয়েরা বাইরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ একজন বললো : "আপনার সাথে কথা বলার জন্য আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে অপেক্ষা করছেন।" জবাবে মাসীহ্ বললেন : "কে আমার মা? কা'রা আমার ভাই?" এরপর হাতের ইশারায় স্বীয় শিষ্যদেরকে দেখিয়ে তিনি বললেন : "এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাই। কারণ, আসমানে অবস্থানরত পিতার কথা যারা শোনে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।" (মথি : দ্বাদশ অধ্যায়, মার্ক্স্ : তৃতীয় অধ্যায় ও লুক্স্ অষ্টম অধ্যায়)

এটা কতোই না হাল্কা ও বাজে কথা! সামান্য চিন্তা করলেই এর অসারতা বুঝতে পারা যায়। হযরত 'ঈসা মাসীহ্ ('আঃ)- এর পক্ষে কী করে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি তাঁর পবিত্রা মাতাকে দূরে ঠেলে দেবেন এবং সাক্ষাৎদানে বঞ্চিত করবেন?! এটা কী করে সম্ভব যে, তিনি তাঁর মাতার সুউচ্চ নতিকতা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে উপেক্ষা করে তাঁর ওপরে স্বীয় শিষ্যদেরকে প্রাধান্য ও অধিকতর মর্যাদা দেবেন? অথচ হযরত 'ঈসা ('আঃ) তাঁর এই শিষ্যদের সম্পর্কেই বলেছেন : "এদের ঈমান নেই।" (মার্ক্স্, ৪ : ৩৫- ৪১)

তিনি তাঁর এই শিষ্যদের সম্পর্কে অন্য এক জায়গায় বলেন যে, 'এদের অন্তরে একটি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানও নেই।' (মথি, ১৭ : ১৪- ২১)

আর হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর এই শিষ্যরা তো তাঁরাই, তাঁর ওপরে যে রাতে ইয়াহূদীরা হামলা চালায় সে রাতে না ঘুমাবার ও তাঁকে পাহারা দেয়ার জন্য তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও এই শিষ্যরা তাঁর কথা অমান্য করেছিলেন এবং দৃশ্যতঃ ইয়াহূদীরা যখন তাঁকে গ্রেফতার করে

তখন তাঁরা তাঁকে একা ফেলে যান ও সেখানে অবস্থানের পরিবর্তে পলায়নকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন। (মথি : ২৬তম অধ্যায়)

বস্তুতঃ এ হচ্ছে বর্তমানে বিদ্যমান ইনজীলে হযরত ‘ঈসা মাসীহ্ (‘আঃ)- এর শিষ্যদের লজ্জাজনক কার্যাবলীর যে বর্ণনা রয়েছে তারই দৃষ্টান্ত। তবে আমরা মনে করি, এ সব কাহিনী পুরোপুরি মিথ্যা - যা ইনজীলের বিকৃতিরই প্রমাণ বহন করছে।

(১০) ইনজীলের যোহন পুস্তকে বলা হয়েছে :

“মাসীহ্ একদিন এক বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। ঘটনাক্রমে তাদের মদ্য শেষ হয়ে গেলো। তখন মাসীহ্ অলৌকিকভাবে তাদের জন্য ছয় কুঁজো মদ্য তরী করলেন।” (যোহন : ২য় অধ্যায়)

ইনজীলে অন্যত্র বলা হয়েছে : “মাসীহ্ মদ্য পান করতেন এবং মদ্যপানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতেন।” (মথি : একাদশ অধ্যায় ও লুক্ : ৭ম অধ্যায়)

কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব যে, হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর মতো পূতপবিত্র পয়গাম্বর এহেন অবাঞ্ছিত ও গর্হিত কাজে জড়িত হবেন। তাছাড়া বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ ও ‘নতুন নিয়ম’ ভুক্ত বিভন্ন পুস্তকে মদ্যপানকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাওরাতে বলা হয়েছে : “সদাপ্রভু হারূনকে বললেন : তুমি ও তোমার সন্তানরা যখন জনসমাবেশের শিবিরে প্রবেশ করবে তখন কোনো অবস্থাতেই দ্রাক্ষারস বা অন্য কোনো নেশাকর দ্রব্য স্পর্শ করবে না যাতে তোমরা মারা না পড়ো। আর এ হচ্ছে এক চিরস্থায়ী নির্দেশ যা তোমাদের সমস্ত ভবিষ্যত বংশধরের জন্য বলবৎ থাকবে - যাতে তোমরা সুন্দর ও কুৎসিত এবং পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারো।” (লেভীয় পুস্তক, ১০ : ৮- ১০)

অন্যদিকে ইনজীলের লুক্ পুস্তকে যোহনের প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রভুর সমীপে অত্যন্ত উচুঁ মর্যাদার অধিকারী; তিনি কখনোই মদ্য বা অন্য কোনো নেশাকর দ্রব্য ঠোঁটে স্পর্শ করেন নি। (লুক্ : প্রথম অধ্যায়)

বস্তুতঃ বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ ও ‘নতুন নিয়ম’ ভুক্ত পুস্তক সমূহে মদপান নিষিদ্ধ হবার সপক্ষে বহু দলীল- প্রমাণ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। তা সত্ত্বেও ‘নতুন নিয়ম’- এ হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর মদপানের কল্পকাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে।

এই হলো বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ ও ‘নতুন নিয়ম’ ভুক্ত পুস্তকসমূহে পরিবেশিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পথভ্রষ্টতা সৃষ্টিকারী ও হাস্যষ্কর বিভিন্ন বিষয় ও বক্তব্যের অংশবিশেষ মাত্র যা কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির সাথেই সামঞ্জস্যশীল নয়। আমরা মুক্তবিবেক মানুষদের খেদমতে উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করলাম যাতে তাঁরা স্বীয় বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডে এগুলো বিচার করেন। তাহলেই তাঁদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মানব জাতির সামনে যে জ্ঞান- বিজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন তা, বিশেষ করে সমুন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোরআন মজীদের বিষয়বস্তু উক্ত পুস্তকসমূহ থেকে আহরণ করেছেন বলে যারা দাবী করছে তাদের সে দাবী আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা। অন্যদিকে যে সব পুস্তক নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) পবিত্র সত্তায় এভাবে অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য ও কলঙ্ক আরোপ করেছে সে সব পুস্তককে কী করে খোদায়ী ওয়াহী বলে ধারণা করা যেতে পারে?

সাম ে র বিচারে কোরআনের অলৌকিকতা

কোরআনে স্ববিরোধিতা নেই

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তথ্যাভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞতার অধিকারী যে কোনো লোকই অত্যন্ত ভালোভাবেই জানেন যে, যে কেউই মিথ্যা ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আইন-কানূন ও ধর্মীয় বিধিবিধান রচনা করবে বা কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে তার বক্তব্যে এবং তার রচিত আইন-কানূন ও ধর্মীয় বিধিবিধানে অবশ্যই বহু বপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিদ্যমান থাকবে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, নতিকতা ও চরিত্র সম্বন্ধে দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং মানুষের জীবনধারা ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে আইন রচনা করে ও মিথ্যার ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়, আর তার আইন-বিধানের আওতা সর্বজনীন হয়, তাহলে এ স্ববিরোধিতা ও বপরীত্য অধিকতর প্রকট রূপ ধারণ করবে। কারণ, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক, মিথ্যাবাদী তার বক্তব্যে স্ববিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেই। এ থেকে বাঁচার কোনো পথই তার সামনে খোলা থাকে না। কারণ, এটাই মানবিক প্রকৃতির দাবী। তাই প্রবাদ বাক্যে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে : মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি থাকে না।

কিন্তু কোরআন মজীদ মানবজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এবং তা-ও অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে মতামত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও এতে সামান্যতম বপরীত্য বা স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই।

কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় উপস্থাপন করেছে, নবুওয়াত্ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি, সমাজ ও সভ্যতার পরিচালনা এবং চরিত্র, নতিকতা ও এতদসহ মানবজীবনের সমস্ত দিক-বিভাগের ওপর আইন-বিধান প্রণয়ন করেছে। তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়, যেমন : নক্ষত্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, যুদ্ধ ও শান্তির বিধান, আসমান ও যমীনের বিভিন্ন সৃষ্টি, যেমন : ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু, সমুদ্র, উদ্ভিদ, প -পাখী ও মানুষ - সব কিছু সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছে এবং বিভিন্ন ধরনের উপমা উপস্থাপন করেছ, এছাড়া ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলী তুলে ধরেছে এবং অন্য যে কোনো কঠিন বিষয়েই বক্তব্য উপস্থাপন করেছে।

কিন্তু এতো বেশী ও বিচিত্র ধরনের বিষয়ে কথা বলা সত্ত্বেও কোরআন মজীদের উপস্থাপিত আইন- কানুন, ধর্মীয় বিধিবিধান ও পেশকৃত মতামতে সামান্যতম স্ববিরোধিতারও অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে এ সমস্ত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কোরআন মজীদ কোথাওই বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাময়তার সীমারেখা লঙ্ঘন করে নি।

কোরআন মজীদ ক্ষেত্রবিশেষে কোনো একটি বিষয়ে দুই জায়গায় বা ততোধিক জায়গায় বক্তব্য রেখেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে কোনোরূপ স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোরআন মজীদে হযরত মূসার (‘আঃ) প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। কোরআন মজীদে এ প্রসঙ্গটি পুনঃপুনঃ এবং বেশ কয়েক বার উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, যেখানেই হযরত মূসার (‘আঃ) প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে সেখানেই তা বিশেষ বশিষ্ট্যের অধিকারী - যে বশিষ্ট্যটি অন্য যেখানে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেখানে বিদ্যমান নেই। অথচ তা সত্ত্বেও মূল বিষয় তথা কাহিনীর প্রশ্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থাপিত বক্তব্যের মধ্যে কোনোরূপ বপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিদ্যমান নেই।

অন্যদিকে এ বিষয়টির প্রতি যদি লক্ষ্য করা হয় যে, কোরআন মজীদের আয়াত সমূহ একবারে নাযিল্ হয় নি, বরং সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে এবং সমকালীন ঘটনাবলীকে উপলক্ষ্য করে নাযিল্ হয়েছে, তাহলে তা থেকেও এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, কোরআন মজীদ মহান আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নাযিল্ হয়েছে এবং এরূপ গ্রন্থ্ রচনা করা মানবিক প্রতিভার ক্ষমতা বহির্ভূত। কারণ, কালের প্রবাহ ও সময়ের ব্যবধানের দাবী এই যে, এরূপ দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ কোনো গ্রন্থ্ রচনা করলে তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও বপরীত্য, কমপক্ষে অসামঞ্জস্য, থাকতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, বড় বড় মনীষী ও কবি- সাহিত্যিকগণ পর্যন্ত সাধারণতঃ দীর্ঘদিন সময় নিয়ে কোনো গ্রন্থ্ রচনা করলে শেষের দিকে গিয়ে প্রথম দিকের লেখা কম- বেশী সংশোধন করেন। এ সংশোধন যেমন হয় তথ্যগত দিক থেকে, তেমনি ভাষার মান ও প্রকাশ- সৌন্দর্যের দিক থেকে। মতামত, পর্যালোচনা, পরিকল্পনা ও উপদেশ থাকলেও তাতেও কম- বেশী

সংশোধন করা হয়। আর বক্তব্যের সাথে যদি চলমান ঘটনাবলীর সম্পর্ক থাকে সে ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন অনেক বেশী সাধিত হয়। ধু তা- ই নয়, এমনকি একবার প্রকাশিত গ্রন্থ লেখকের জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হলে লেখক তা পরিমার্জিত করেন। কারণ, কালের ব্যবধানে স্বয়ং লেখকের কাছেও তাঁর লেখার কিছু, দুর্বলতা, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, এটি আরো ভালো হওয়া উচিত, তাই তিনি তা সংশোধন করেন।

কিন্তু কোরআন মজীদ খোদায়ী গ্রন্থ বিধায়ই তেইশ বছর আগে এ গ্রন্থের যে অংশ পরিবেশন করা হয়েছে তেইশ বছর পরে পরিবেশিত অংশের সাথে তার কোনো সাংঘর্ষিকতা দেখা দেয় নি বা মানগত দিক থেকে পূর্ববর্তী অংশ সমূহ ও পরবর্তী অংশসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পূর্ববর্তী অংশসমূহের পরিমার্জনের প্রয়োজন হয় নি।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ দুই দৃষ্টিকোণের বিচারেই কোরআন মজীদ স্বীয় অলৌকিকতা রক্ষা করেছে। অর্থাৎ কোরআন মজীদ যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং খণ্ড- খণ্ড ভাবে নাযিল্ হয়েছে, তখন খণ্ড- খণ্ডরূপেই তা মু'জিযাহ্ ছিলো, আর যখন তা খণ্ড- খণ্ড রূপ পরিত্যাগ করে একত্রে গ্রথিত হলো তখন তাতে অলৌকিকতার আরেকটি দিক ফুটে উঠেছে।

স্বয়ং কোরআন মজীদও তার এ বিশেষ মর্যাদা ও বশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এরশাদ হয়েছে:

(افلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)

"তারা কি কোরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না? এ কোরআন যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে অবশ্যই এতে বহু বপরীত্য ও স্ববিরোধিতা পাওয়া যেতো।" (সূরাহ্ আন্- নিসা ো' : ৮২)

কোরআন মজীদের এ আয়াত মানুষকে একটি স্বভাবসম্মত ও বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের দিকে পথনির্দেশ করেছে। তা হচ্ছে, যে কেউই তার দাবীতে ও বক্তব্যে মিথ্যার আ য় গ্রহণ করবে তার প্রকাশিত মতামতে অবশ্যই স্ববিরোধিতা থাকবে। কিন্তু আসমানী গ্রন্থ কোরআন মজীদে

কোনোরূপ স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই। অতএব, নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, এ গ্রন্থ মানবিক প্রতিভার ফসল নয় এবং মিথ্যার ওপরে ভিত্তি করে উপস্থাপিত হয় নি।

বপরীত্য ও স্ববিরোধিতা থেকে কোরআন মজীদের মুক্ততার বিষয়টি এতোই সুস্পষ্ট ও অকাট্য যে, এর সপক্ষে নতুন করে কোনো দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলামের দুশমন তৎকালীন আরবরা পর্যন্ত কোরআন মজীদের এ বশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করেছিলো এবং তাদের মধ্যকার কাব্য, সাহিত্য ও ভাষণশিল্পের ে ষ্ঠতম প্রতিভাসমূহ তা স্বীকার করেছিলো।

অন্যদিকে আসমানী কিতাব্ নামে অভিহিত বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের ‘পুরাতন নিয়ম’ ও ‘নতুন নিয়ম’ ভুক্ত পুস্তকসমূহ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে এবং এতে পরিদৃষ্ট স্ববিরোধিতা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে কারো নিকট সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে এবং সত্য ও মিথ্যা উভয়ই স্ব স্ব চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হবে।

প্রচলিত ইনজীলে স্ববিরোধিতা

এবারে আমরা বর্তমানে প্রচলিত ইনজীল্ হওয়ার দাবীদার পুস্তকসমূহ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি :

(১) ইনজীলের লুক্ পুস্তকে বলা হয়েছে, মাসীহ্ [হযরত 'ঈসা ('আঃ)] বলেছেন : "যে কেউ আমার সাথে না থাকবে সে আমার বিরুদ্ধে রয়েছে।" (লুক্ : একাদশ অধ্যায় ও মথি : দ্বাদশ অধ্যায়)

কিন্তু এ ইনজীলেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, মাসীহ্ বলেছেন : "যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে নয় সে-ই আমার সাথে রয়েছে।" (মার্ক্ : নবম অধ্যায় ও লুক্ : নবম অধ্যায়)

(২) ইনজীলে বলা হয়েছে, মাসীহ্- কে যখন 'কল্যাণময় শিক্ষক' বলে সম্বোধন করা হলো তখন তিনি বললেন : "কেন কল্যাণময় বলছো? সদাপ্রভু ছাড়া কোনো কল্যাণময়ের অস্তিত্ব নেই।" (মথি : ১৯তম অধ্যায়, মার্ক্ : ১০ম অধ্যায় ও লুক্ : অষ্টাদশ অধ্যায়)

কিন্তু ইনজীলের অন্যত্র এর ঠিক বিপরীত কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে , মাসীহ্ বললেন : "আমি হচ্ছি কল্যাণময় প্রহরী।" তিনি আবার বললেন : "কিন্তু আমি হচ্ছি সেই কল্যাণময় প্রহরী।" (যোহন : ২৭তম অধ্যায়)

(৩) ইনজীলের মথি পুস্তকে বলা হয়েছে, যে দু'জন চোরকে মাসীহর সাথে শূলে চড়ানো হয় তাদের উভয়ই মাসীহ্- কে তিরস্কার করে এবং তাঁর প্রতি বিষাক্ত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে।" (মথি : ২৭ তম অধ্যায়)

কিন্তু ইনজীলেরই অন্যত্র ঠিক এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, উক্ত দু'জন অপরাধীর মধ্যে একজন মাসীহ্- কে বললো : "তুমি যদি মাসীহ্ হয়ে থাকো তাহলে তোমার নিজেকে এবং সেই সাথে আমাদেরকেও শূলে চড়িয়ে হত্যা করা থেকে রক্ষা করো।" তখন দ্বিতীয় অপরাধী বললো : "তোমার কি সদাপ্রভুর আর তাঁর শাস্তির ভয় নেই যে, মাসীহ্- কে তিরস্কার করছো?" (লুক্ : ২৩তম অধ্যায়)

(৪) ইনজীলের যোহন পুস্তকে বলা হয়েছে, মাসীহ্ বললেন : "আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করি তাহলে আমার সে সাক্ষ্য সঠিক হবে না।" (যোহন : ৫ম অধ্যায়)

এ হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত ইনজীল্ নামধারী পুস্তকসমূহে বিদ্যমান স্ববিরোধিতাসমূহের কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র। ইনজীল্ নামে প্রচলিত স্বল্পায়তন বিশিষ্ট পুস্তকগুলোতে পরিদৃষ্ট এ সব সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতাই অন্ধত্ব থেকে মুক্ত সত্যান্বেষী সুস্থ বিবেকের অধিকারী লোকদের সামনে ঐ সব পুস্তকের স্বরূপ সন্দেহাতীত রূপে তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট।

কোরআনের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্

নিখুঁত ও বিস্ময়কর সামঞ্জস্যের বিচারে কোরআন মজীদের অলৌকিকতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। এরই অন্যতম দিক হচ্ছে এর বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্। এ প্রসঙ্গে ওয়ালীদ্ বিন্ মুগ্বীরাহর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ['বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ কী?' এ সম্বন্ধে গ্রন্থের রুর দিককার একই শিরোনামের নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

আবূ জেহেল্ কোরআন মজীদ সম্পর্কে ওয়ালীদ্ বিন্ মুগ্বীরাহর মতামত জানতে চাইলে ওয়ালীদ বলে : "কোরআন সম্পর্কে আমি কী বলবো! আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আরবী ভাষার কবিতা ও ক্বাছীদাহর সাথে আমার মতো এতোখানি পরিচিত। আরবী ভাষার ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাত্ এবং কবিতা ও গৌরবগাথার সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ আমার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে নি। আমি যে কোনো ধরনের কবিতা, এমনকি জ্বিনদের কবিতা সম্পর্কেও অন্যদের তুলনায় বেশী ওয়াকেফহাল। কিন্তু আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ যে সব কথা বলে তা এ সবের কোনো একটির সাথেও মিলে না। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের বক্তব্যের একটি বিশেষ বশিষ্ট্য আছে যা ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ যে কোনো বক্তব্যকেই হার মানিয়ে দেয় এবং সমস্ত বক্তব্যের ওপরে তা ৎে ষ্ঠত্বের অধিকারী - যার ওপরে ৎে ষ্ঠত্বের অধিকারী বক্তব্য কল্পনাও করা যায় না।"

এ কথা নে আবূ জেহেল বললো : "আল্লাহর শপথ! তুমি যদি এর (কোরআনের) বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য না রাখো তাহলে তোমার গোত্রের লোকেরা এবং তোমার আত্মীয়- স্বজনরা তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না।"

তখন ওয়ালীদ বললো : "তাহলে কিছুটা অপেক্ষা করো যাতে এ ব্যাপারে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারি।"

পরে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর ওয়ালীদ বললো : "আসলে কোরআন হচ্ছে এক ধরনের জাদু; মুহাম্মাদ তা অন্য জাদুকরদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছে।" (৭৮/২৯ -تفسير طبری.)

কোনো কোনো সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী ওয়ালীদ ইবনে মুগ্বীরাহ্ কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলেছিলো :

(و ان له لحلاوة و ان عليه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه ليعلوا و لا يعلى عليه و ما يقول هذا البشر)

"নিঃসন্দেহে এর (কোরআনের) রয়েছে সুমিষ্টতা, নিঃসন্দেহে এর রয়েছে অসাধারণ সৌন্দর্য, অবশ্যই এর রয়েছে সমুন্নত তাৎপর্য, অবশ্যই এর গভীরতা সীমাহীন, নিঃসন্দেহে এ অত্যন্ত উঁচু মানের (কথা) এবং এর চেয়ে উন্নততর ও উচ্চতর মানের (কথা) সম্ভব নয়। আর (প্রকৃত সত্য হলো) এ কথা কোনো মানুষ বলে নি।" (৭২/১৭ -تفسير طبری.)

[ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মনীষী আবদুল ক্বাহের্ জুরজানী তাঁর লিখিত الرسالة الشافية فی الاعجاز গ্রন্থে এই দ্বিতীয়োক্ত ওয়ালীদকে ওয়ালীদ বিন্ 'উক্ববাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।]

ধর্মীয় বিধান ও আইন প্রণয়নে কোরআন

জাহেলী আরবদের বিস্ময়কর পরিবর্তন

এ এক সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলামের প্রদীপ্ত সূর্যের উদয়ের পূর্বে ইতিহাসের এক অন্ধকার বিভীষিকাময় যুগ বিরাজ করছিলো। সে যুগের মানুষ অজ্ঞতা- মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিলো এবং তারা জ্ঞান ও চারিত্রিক দিক থেকে যেমন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, তেমনি বন্যতা ও পশাচিকতার মধ্যে হাবডুবু খাচ্ছিলো। সে অন্ধকার যুগে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে বর্ণ ও ে ণী বিভেদ এবং শক্তির আইন, রক্তচোষা নীতি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা শিকড় গেড়ে বসেছিলো। সকলের মাথায় থাকতো লুটতরাজ ও পরস্ব অপহরণের চিন্তা এবং যখন- তখনই তারা যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতের দিকে ধেয়ে যেতো।

ইসলাম- পূর্ব আরবের লোকেরা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'আক্বীদাহ্- বিশ্বাস পোষণ করতো এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অমানুষিক কর্মনীতি প্রচলিত ছিলো। তৎকালীন আরবদের মধ্যে না এমন কোনো অভিন্ন 'আক্বীদাহ্- বিশ্বাস ও ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারতো, না কোনো সাধারণ আইন- কানূন্ ও অভিন্ন সমাজব্যবস্থা ছিলো যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারতো। অভ্যাস ও গতানুগতিক প্রথার অনুসরণ তাদেরকে দিশাহারায় পরিণত করেছিলো। ফলতঃ তারা যে কোনো দিকেই ঝুঁকে পড়তো। তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিলো। তারা অনেক কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা করতো এবং এ সব মূর্তিকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করার জন্য মধ্যস্থরূপে গ্রহণ করতো।

তাদের মধ্যে তথাকথিত 'ভাগ্যের' ভিত্তিতে অর্থাৎ লটারীর মাধ্যমে ধনসম্পদ বণ্টনের প্রচলিত প্রথা ছিলো। আর তাদের কাছে জুয়াখেলা ছিলো একটা সাধারণ ব্যাপার এবং তা ছিলো অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ধু তা- ই নয়, বরং এই জঘন্য কাজটি তাদের কাছে গৌরবের বিষয়রূপে পরিগণিত হতো। তাদের মধ্যে প্রচলিত অপর একটি ঘৃণ্য প্রথা ছিলো সৎমাকে বিবাহ করা। আর এর চেয়েও জঘন্যতর ও নৃশংস প্রথা ছিলো কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া।

ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগের আরবদের মধ্যে প্রচলিত জঘন্য রীতি-প্রথাসমূহের এ হচ্ছে অংশবিশেষ মাত্র। কিন্তু আরব উপদ্বীপের বুকে রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর সোনালী প্রভাময় আবির্ভাব ও ইসলামের প্রোজ্জ্বল সূর্যের উদয়ের ফলে জাহেলী যুগের এই অন্ধকার হৃদয়গুলোই খোদায়ী জ্ঞানে আলোকিত হলো এবং পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হলো। দেবমূর্তি ও মূর্তিপূজার স্থলাভিষিক্ত হলো তাওহীদ্ বা একেশ্বরবাদ, মূর্খতা ও অজ্ঞতার স্থলাভিষিক্ত হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চারিত্রিক নীচতা উত্তম গুণাবলীতে আর শত্রুতা-বিরোধ মায়া-মহব্বত ও বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হলো। আর এই ধ্বংসোন্মুখ, অপদার্থ ও অসংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী থেকেই এমন এক ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতির সৃষ্টি হলো যে, তারা সারা বিশ্বের ওপর স্বীয় প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও মানবতায় ভূষিত হয়ে সারা দুনিয়াকে আন্দোলিত করতে সক্ষম হলো।

ফ্রান্সের এককালীন মন্ত্রী মিঃ ডাউরী এ প্রসঙ্গে বলেন :

"মুসলমানদের নবী মুহাম্মাদ স্বীয় সমুন্নত ও ঐশী শিক্ষার দ্বারা খুব সহজেই বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের সমন্বয়ে একটি একক জাতি গঠন করে স্বীয় আধিপত্য ও শাসনকে স্পেন থেকে রু করে ভারত পর্যন্ত বিস্তার করতে এবং সারা বিশ্বের বুকে সভ্যতার পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হন।

"এ মহান ব্যক্তি এহেন বিস্ময়কর ও সর্বাত্মক পরিবর্তন এমন এক সময় সাধন করেন যখন ইউরোপ মধ্য যুগীয় অন্ধকার ও মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিলো।"

তিনি এরপর বলেন : "মধ্য যুগে একমাত্র যে জাতিটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিলো, অন্য কথায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় ময়দানে সকলের ওপরে বাজিমাত করেছিলো সে হচ্ছে আরব জাতি। এই আরবরাই ইউরোপের আকাশে পুঞ্জীভূত বন্যতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার ঘন কালো মেঘরাশিকে বিদূরিত করে এবং এ ভূখণ্ডে (ইউরোপে) জ্ঞান-বিজ্ঞান, চরিত্র ও নতিকতার সভ্যতাসূর্য উদিত করে। (١٧٧ – صفوة العرفان: محمد فريد وجدى.)

আরবদের ভাগ্যে এভাবে যে উন্নতি, অগ্রগতি, মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হওয়া সম্ভব হলো তা কেবল আসমানী গ্রন্থ কোরআন মজীদের সমুন্নত শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো যা অন্য সমস্ত আসমানী কিতাবের ওপর ে ষ্ঠত্বের অধিকারী এবং যার আইন- কানূন্ ও বিধি- বিধান বিচারবুদ্ধির ওপর ভিত্তিশীল - যার শিক্ষার রয়েছে স্বকীয় বিশেষ আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী পদ্ধতি।

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা

আইন প্রণয়ন ও বিধি- বিধান নির্ধারণে কোরআন মজীদ এক ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে - যাতে যে কোনো ধরনের চরম পন্থা ও শিথিল পন্থা পরিহার করা হয়েছে।

কোরআন মজীদ ভারসাম্যের প্রতি এতোই গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, সাধারণ মানুষের জন্যও ভারসাম্যকে একটা অপরিহার্য বিষয়রূপে গণ্য করেছে এবং মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বক্রতা, চরম পন্থা ও শিথিল পন্থা থেকে মুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছে। কোরআন মজীদে মানুষের প্রার্থনার ভাষায় এরশাদ হয়েছে :

(اهدنا الصراط المستقيم)

"আমাদেরকে সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থায় পরিচালিত করো।" (সূরাহ্ আল্- ফাাতেহাহ্ : ৬) এ বাক্যটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত সুগভীর। কোরআন মজীদের বহু আয়াতেই ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থা অনুসরণের জন্য আহবান জনানো হয়েছে এবং চরম পন্থা ও শিথিল পন্থা থেকে মুক্ত এক ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সম্মত পন্থার দিকে মানুষকে পথনির্দেশ করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.)

"অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে যথাযথ অধিকারীর কাছে আমানত প্রত্যর্পণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং (এ নির্দেশ দিয়েছেন যে,) তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার- ফয়সালা করবে (বা শাসনকার্য চালাবে) তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে।" (সূরাহ্ আন্- নিসাা' : ৫৮)

(اعدلوا هو اقرب للتقوى)

"তোমরা ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি অবলম্বন করো; এ হচ্ছে (পরকালীন শাস্তি থেকে) বেঁচে থাকার নিকটতর পর্যায়।" (সূরাহ্ আল্- মাাএদাহ্ : ৮)

(و اذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى)

“তোমরা যখন কথা বলবে তখন ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি বজায় রাখবে, যদিও (যার সম্পর্কে কথা বলবে) সে তোমাদের আত্মীয় হয়।” (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ১৫২)

(ان الله يأمركم بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى. يعظكم لعلكم تذكرون)

“অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভারসাম্য ও সুবিচার, সৎকর্ম ও পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দানের জন্য আদেশ করছেন এবং অশ্লীলতা, পাপকর্ম ও জোর- যুলুম- ঔদ্ধত্য থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে এ উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তা স্মরণে রেখে চলো।” (সূরাহ্ আন্- নাহল : ৯০)

দানে উৎসাহ ও কার্পণ্যের নি া

এভাবেই কোরআন মজীদ মানুষকে ভারসাম্য, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছে এবং স্বীয় শিক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থাকে প্রস্ফূটিত করে তুলেছে। তেমনি কোরআন মজীদে বহু জায়গায় কার্পণ্য থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং তার ক্ষতিকারকতা ও অ ভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(و لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم. بل هو شر لهم. سيطقون ما بخلوا به يوم القيامة. و لله ميراث السماوات و الارض. و الله بما تعملون خبير)

"যারা, আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার ব্যাপারে কার্পণ্যের আ য় নেয় তারা যেন মনে না করে যে, এ কর্মনীতি তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর; তারা যা কিছুর ব্যাপারে কার্পণ্য করবে ক্বিয়ামতের দিনে তারই বোঝা তাদের ঘাড়ে জড়িয়ে থাকবে। আর আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহরই। আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সদা অবগত।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরা ান্ : ১৮০)

তবে কোরআন মজীদ দানে উৎসাহিত ও কার্পণ্যের নিন্দা করার পাশাপাশি দানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা ও বাস্তবসম্মত নীতি অনুসরণ করতে বলেছে। এরশাদ হয়েছে :

(ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لا تبسط كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً)

"তোমার হাতকে (দান ও কল্যাণমূলক ব্যয় থেকে) একেবারে কণ্ঠসংলগ্ন করে রেখো না (গুটিয়ে রেখো না), আবার এতো বেশী প্রসারিত করে দিয়ো না যে, শেষে (রিক্তহস্ত হয়ে) ধিকৃত-তিরস্কৃত হবে।" (সূরাহ্ বানী ইসরা াঈল্ : ২৯)

অপচয়- অপব্যয় নিষিদ্ধ

কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতে এবং এ ধরনের আরো যে সব আয়াতে মানুষকে দানে উৎসাহিত ও কার্পণ্যে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, তার পাশাপাশি এমন অনেক আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে অপচয় ও অপব্যয়ে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর ক্ষতিকারকতা সম্বন্ধে মানুষকে জানানো হয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.)

"আর তোমরা অপচয় করো না; নিঃসন্দেহে তিনি (আল্লাহ্) অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরাহ্ আল্- আন্'আম্ : ১৪১)

(ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين.)

"নিঃসন্দেহে অপচয়কারীরা শয়তানদের ভাই।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল্ : ২৭)

ধর্যধারণে উৎসাহ প্রদান

কোরআন মজীদ বিপদাপদের মুখে ধর্য- সহ্য ও দৃঢ়তার নির্দেশ প্রদান করেছে, ধর্যশীল ও অটল লোকদের প্রশংসা করেছে এবং তাদের জন্য বিরাট পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(انما يوفى الصابرون اجراهم بغير حساب.)

"অবশ্যই ধর্যশীল লোকেরা তাদের প্রাপ্য সীমাহীন সুপ্রতিদান লাভ করবে।" (সূরাহ্ আয্- যুমার : ১০)

(و الله يحب الصابرين.)

"আর আল্লাহ্ ধর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরাহ্ আালে 'ইমরান্ : ১৪৬)

কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, কোরআন মজীদ যালেমের মোকাবিলায় মযলূমের হাত- পা বেঁধে রাখে নি এবং তাকে তার অধিকার আদায়েও নিষেধ করে নি। বরং যুলুমের মূলোৎপাটন ও ধরণীর বুকে সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যালেম- অত্যাচারীর মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ানো ও

ন্যায়সঙ্গতভাবে যালেমের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোরআন মজীদ মযলূমকে অনুমতি প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).

"অতএব, যে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে তোমরাও তার বিরুদ্ধে চড়াও হও ঠিক যেভাবে সে তোমাদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৯৪)

নরহত্যার শাস্তি

কেউ যদি স্বেচ্ছায়- সজ্ঞানে কাউকে হত্যা করে সে ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বিধানে ঘাতককে হত্যা করার জন্য নিহত ব্যক্তির আত্মীয়- স্বজনদেরকে অধিকার দেয়া হয়েছে। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لئليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل.)

"যে কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে আমি তার অভিভাবককে পরিপূর্ণ অধিকার প্রদান করেছি (প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য), কিন্তু সে- ও যেন (ঘাতককে) হত্যার ব্যাপারে অপচয় না করে (বাড়াবাড়িমূলক কাজ না করে)।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল্ : ৩৩)

ইহ- পারলৌকিক বিধিবিধানের সমন্বয়

কোরআন মজীদ যেহেতু ভারসাম্য ও মধ্যম পন্থা ভিত্তিক আইন- কানূন্ ও শর‘ঈ বিধান প্রবর্তন করেছে, সেহেতু ইহজাগতিক সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক বিধিবিধানে পরজাগতিক বিধিবিধানের সাথে সঙ্গতি বিধান করেছে এবং এ উভয় জগতের বিধিবিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে।

কোরআন মজীদ একদিকে যেমন মানুষের ইহজাগতিক বিষয়াদিকে সংশোধন ও পরি দ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে মানুষের পারলৌকিক সৌভাগ্যেরও নিশ্চয়তা বিধান করেছে। হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) এ সব মহান আইন- বিধান সম্বলিত কোরআন মজীদ নিয়ে এসেছেন যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বমানবতাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের সৌভাগ্যে উপনীত করা।

কোরআন মজীদ বর্তমানে প্রচলিত তাওরাতের ন্যায় নয় যার আইন- বিধান সমূহ কেবল বস্তুগত জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট - যাতে ইহজগতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, কিন্তু অপর জগতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় নি।

হ্যা, বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ বস্তুজগতের মধ্যে এমনভাবে সীমাবদ্ধ যে, পরজগতের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টিও প্রদান করে নি। এমনকি নেক কাজের পুরষ্কারকেও ইহজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ বলেছে যে, নেক কাজের পুরস্কার হচ্ছে জাগতিক ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং ইহজগতে অন্যদের ওপর আধিপত্য। অন্যদিকে পাপের শাস্তিকেও ইহজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রূপে দেখিয়েছে, বলেছে, পাপের শাস্তি হচ্ছে ধনসম্পদ ও ক্ষমতা- আধিপত্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়া।

অন্যদিকে কোরআন মজীদ বর্তমানে প্রচলিত ইনজীলের অনুরূপও নয় - যার আইন- কানূন্ ও বিধিবিধান ধু পরকালের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইহজাগতিক বিষয়াদি তথা সমাজব্যবস্থা ও জীবনবিধানের প্রতি যা উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে।

বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীল্ উভয়ের বিপরীতে কোরআন মজীদের আইন- কানূন্ ও বিধিবিধান হচ্ছে সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ - যাতে ইহকালীন বৈষয়িক জীবন ও সমাজব্যবস্থা যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি পরকালীন জীবনের সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। কোরআন মজীদে মানুষের জীবনের বস্তুগত ও অবস্তুগত কোনো বিষয়ের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় নি।

কোরআন মজীদ তার ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষকে পরকালীন জীবনের প্রতি মনোযোগী করে তুলেছে, অন্যদিকে তাকে পার্থিব জীবনের বিষয়াদির প্রতিও মনোযোগ দিতে বলেছে। যেমন, পরকালীন জীবনের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তোলার জন্য কোরআন মজীদ এরশাদ করেছে :

(و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و ذالک الفوز العظيم).

“আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে - যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হচ্ছে; সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর এ হচ্ছে এক বিরাট সাফল্য।” (সূরাহ্ আন্- নিসা’ : ১৩)

(و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها و له عذاب مهين)

“আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে ও তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে সে দোযখে প্রবেশ করবে ও চিরদিন সেখানে থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।” (সূরাহ্ আন্- নিসা’ : ১৪)

(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره.)

“অতএব, যে কেউ অণুমাত্রও সৎকর্ম করবে (পরকালে) সে তা দেখতে পাবে।” (সূরাহ্ আয্- যিলযালাহ্ : ৭)

(و من يعمل مثقال ذرة شراً يره)

“আর যে কেউ অণুমাত্রও পাপকর্ম করবে (পরকালে) সে তা দেখতে পাবে।” (সূরাহ্ আয্- যিলযালাহ্ : ৮)

(و ابتغ فيما اتاک الله الدار الآخرة و لا تنس نصيبک من الدنيا)
"(হে রাসূল!) আল্লাহ্ আপনাকে যে পরকালের গৃহ প্রদান করেছেন তাকে আঁকড়ে ধরুন (এবং তা ঠিক রাখার জন্য যথাযথ কাজ করুন), আর পার্থিব জগতে আপনার অংশকেও ভুলে যাবেন না।" (সূরাহ্ আল্- ক্বাছ্বাছ্ব : ৭৭)

কোরআন মজীদের বহু আয়াতেই জ্ঞানার্জন ও তাক্ওয়া- পরহেযগারীর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, একই সাথে পার্থিব জীবনের স্বাদ- আনন্দ ও আল্লাহর দেয়া নে'আমত সমূহের সঠিক ব্যবহারকে বধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদ এরশাদ করেছে :

(قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق)
"(হে রাসূল!) বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দের জন্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যে সব পবিত্র রিযক্ প্রদান করেছেন কে তা হারাম করেছে?" (সূরাহ্ আল্- আ'রাাফ্ : ৩২)

পারস্পরিক সম্পর্ক

কোরআন মজীদ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত ও আনুগত্য করা, সৃষ্টিলোকের নিদর্শনাদি ও শর'ঈ বিধিবিধান নিয়ে চিন্তা- গবেষণা করা এবং সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব, মানুষের রহস্য ও তার সত্তায় নিহিত বিভিন্ন সত্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য বার বার আহবান জানিয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদ ধু মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দিয়ে তথা বান্দাহ্ ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েই নিজের দায়িত্ব শেষ করে নি, বরং মানবজীবনের অপর দিকটি অর্থাৎ মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিও দৃষ্টি প্রদান করেছে, বিশেষ করে মানুষের মধ্যে মায়া- মহব্বত ও আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কোরআন মজীদ বেচাকিনা ও ব্যবসা- বাণিজ্যকে বধ ঘোষণা করেছে এবং রেবা ও নির্বিচার সম্পদ বৃদ্ধি করার প্রবণতাকে হারাম করেছে। যেমন, এরশাদ হয়েছে :

(و احل الله البيع و حرم الربا.)

“আর আল্লাহ্ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং রেবাকে হারাম করেছেন।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২৭৫)

[আভিধানিক অর্থে “রেবা” মানে বৃদ্ধি। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে অবাণিজ্যিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের ওপর আসলের চেয়ে অতিরিক্ত গ্রহণই হচ্ছে রেবা। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ‘ধানের ওপর টাকা লাগানো’র যে রেওয়াজ আছে যাতে ধান ওঠার আগে ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট দরে ধানের অগ্রিম মূল্য দেয়া হয় যার দর ঐ সময়কার ও ধান ওঠার সময়কার বাজার দরের চেয়ে কম। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের লেনদেন বেচাকিনা হিসেবে ছ্বহীহ্ নয়। ফলে এর মাধ্যমে ঋণদাতা যে মুনাফা করে তা রেবা। অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিস্তিতে বাজার- মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে গার্হস্থ্য সামগ্রী সরবরাহ করে যে অতিরিক্ত মুনাফা করে তা- ও রেবা। কোনো দোকানদার নগদ বেচাকিনার ক্ষেত্রে একই পণ্য বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করলে বাকী বিক্রির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম মূল্যে বিক্রি না করলে হাদীছ অনুযায়ী এর অতিরিক্ত মুনাফা হবে রেবা।]

কোরআন মজীদ মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং তা ভঙ্গ না করার জন্য আদেশ দিয়েছে। যেমন, এরশাদ করেছে :

(يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা করো।” (সূরাহ্ আল্- মা‌‌ায়েদাহ্ : ১)

অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোনো যুলুম, অন্যায় বা পাপাচারের কাজের প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার করলে বা ভালো কাজ না করার অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করা ও শর‘ঈ বিধান অনুযায়ী অঙ্গীকার ভঙ্গের কাফফারাহ্ দেয়া ফরয; এরূপ ক্ষেত্রে অঙ্গীকার রক্ষা করা কঠিন গুনাহ্। তেমনি কোনো মোবাহ্ কাজে (যেমন : তালাক্ব্ প্রদানের) অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করার মধ্যে কল্যাণ মনে করলে তা ভঙ্গ করে কাফফারাহ্ প্রদান জায়েয আছে।

বিবাহে উৎসাহ প্রদান

যেহেতু মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নারী ও পুরুষের মাঝে ববাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য, সেহেতু কোরআন মজীদ এ স্বভাবসম্মত কাজটি সম্পাদন অর্থাৎ বিবাহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم)

“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার স্বামী বা স্ত্রী বিহীন নারী ও পুরুষদেরকে এবং তোমাদের বিবাহযোগ্য দাস- দাসীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও। আর এরা যদি দরিদ্র ও নিঃসম্বল হয়ে থাকে তো আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে সচ্ছলতা দান করবেন। আর আল্লাহ্ সীমাহীন উদারতার অধিকারী ও সর্ববিষয়ে সদা ওয়াকেফহাল।” (সূরাহ্ আন্- নূর্ : ৩২)

(فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة.)

“তোমাদের জন্য যারা উত্তম এমন নারীদের মধ্য থেকে বিবাহ করো দু’জন, তিন জন বা চারজনকে, কিন্তু তোমরা যদি ভয় করো যে, তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না তাহলে মাত্র একজনকে বিবাহ করো।” (সূরাহ্ আন্- নিসা’ : ৩)

সদাচরণ ও কল্যাণকর কাজ

কোরআন মজীদ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে ও তার সমস্ত স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। তেমনি কোরআন মজীদ সমস্ত মুসলমানের সাথে, বিশেষ করে পিতা- মাতা, আত্মীয়- স্বজন ও ঘনিষ্ঠ জনদের সাথে সদাচরণের জন্য আদেশ দিয়েছে। বরং কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে সদাচরণ হচ্ছে মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য ব্যাপক ভিত্তিক ও সর্বজনীন কর্মসূচী। তাই ধু মুসলমানদের সাথেই নয়, বরং মুসলিম- অমুসলিম নির্বিশেষে

মানব প্রজাতির প্রতিটি সদস্যের সাথেই সদাচরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و عاشروهن بالمعروف)

"আর তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ করো।" (সূরাহ্ আন্- নিসা' : ১৯)

(و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف)

"আর তাদের ওপরে যেভাবে (তোমাদের অধিকার) রয়েছে ঠিক সেভাবেই (তোমাদের ওপর) রয়েছে তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত অধিকার।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২২৮)

(و اعبدوا الله و لا تشرک به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذى القربى و اليتامى و المساكين و الجارى ذى القربى و الجارى ذى الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً)

"তোমরা আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো এবং সদাচরণ করো আত্মীয়- স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন্, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, বন্ধু- বান্ধব, পথিক এবং তোমাদের দাস- দাসী (ও অধীনস্থ)দের সাথে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ উদ্ধত- অহঙ্কারী লোকদেরকে পসন্দ করেন না।" (সূরাহ্ আন্- নিসা' : ৩৬)

(و احسن كما احسن الله اليک و لا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين)

"আর (অন্যদের প্রতি) কল্যাণকামী ও দয়ার্দ্র হও ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করেছেন। আর ধরণীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি, দুষ্কৃতি ও পাপাচার করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বিপর্যয়সৃষ্টিকারী ও দুর্বৃত্ত- পাপাচারীদেরকে পসন্দ করেন না।" (সূরাহ্ আল্- ক্বাছ্বাছ্ব : ৭৭)

(ان رحمة الله قريب من المحسنين)

"অবশ্যই আল্লাহর রহমত্ সৎকর্মশীল ও কল্যাণকারীদের অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করছে।" (সূরাহ্ আল্- আ'রাফ্ : ৫৬)

(و احسنوا ان الله يحب المحسنين)

“আর তোমরা (অন্যদের) কল্যাণ সাধন করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের পসন্দ করেন।” (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ১৯৫)

এ হচ্ছে কোরআন মজীদের ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের শিক্ষাসমূহের কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র।

ভালো কাজে আদেশ দান ও ম   কাজ প্রতিরোধ

কোরআন মজীদ মুসলিম উম্মাহর সমস্ত সদস্যের ওপর ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধকে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এ দায়িত্বকে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠী বা মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয় নি। কোরআন মজীদ তার এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাপক আইন- বিধান প্রণয়ন করেছে, বরং এর মাধ্যমেই স্বীয় শিক্ষাকে প্রাণময় ও চিরস্থায়ী করেছে।

ইসলাম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে এবং প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে পরস্পরের জন্য পর্যবেক্ষক ও পথনির্দেশকের দায়িত্ব প্রদান করেছে এবং প্রতিটি ব্যক্তিকেই অন্যদের ওপর দায়িত্বশীল করেছে। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির ওপর একেক জন পুলিশের দায়িত্ব প্রদান করেছে যে অন্যদেরকে নেক কাজ, কল্যাণ ও চিরন্তন সৌভাগ্যের দিকে পথনির্দেশ প্রদান করবে এবং যুলুম- শোষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, পাপ ও দুষ্কৃতি থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমস্ত মুসলমানই ইসলামের প্রচার- প্রসার এবং ইসলামী আইন- বিধান বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল।

এমতাবস্থায়, এর চেয়ে বৃহত্তর এবং এর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রভাবশালী কোনো আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা কল্পনা করাও সম্ভব কি?

বর্তমান যুগে যে কোনো দেশেই রাষ্ট্রীয় আইন- কানূন্ কার্যকরী করার জন্য বিরাট পরিচালকমণ্ডলী ও শান্তিশৃঙ্খলা বাহিনীর আ য় নেয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনলঙ্ঘন প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয় না। কারণ, পরিচালনা ও শান্তিশৃঙ্খলা বাহিনী যতোই বিশাল এবং যতোই সুসজ্জিত হোক না কেন, তাদের পক্ষে জাতির প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতিটি স্থানে ও প্রতিটি সময়ে অবস্থান করে তাদের সমস্ত কাজকর্মের ওপর দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু ইসলাম এক সমুন্নত মহান পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর আ য় নিয়ে এবং 'ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিরোধ'কে প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়ে কার্যতঃ

শক্তিশালী ও বিশালায়তন এক বাহিনী সৃষ্টি করেছে। আর অন্যান্য বাহিনী ও এ বাহিনীর মধ্যে রয়েছে এক বিরাট পার্থক্য। তা হচ্ছে, কোনোরূপ ব্যয়বাজেট ছাড়াই এ বাহিনী যথারীতি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সর্বত্র, সব সময় ও সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখছে, আর সেই সাথে ইসলামের সমুন্নত আইন- বিধান বাস্তবায়নেরও নিশ্চয়তা বিধান করছে।

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠা

কোরআন মজীদ একের ওপর অন্যের প্রাধান্য ও ে ষ্ঠত্বের জন্য একমাত্র যে বিষয়টিকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছে তা হচ্ছে জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠা - নীতিনিষ্ঠতা তথা খোদাভীরুতা। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(ان اکرمکم عند ابیه اتقاکم)

"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক সম্মানের পাত্র সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ ও খোদাভীরু।" (সূরাহ্ আল্- হুজুরা‍াত্ : ১৩)

(قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون.)

"(হে রাসূল!) বলুন :, যারা জানে (জ্ঞানের অধিকারী) আর যারা জানে না (অজ্ঞ) তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরাহ্ আয্- যুমার : ৯)

সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা

কোরআন মজীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গভীরতম আইন- বিধান ও শিক্ষাসমূহের অন্যতম হচ্ছে সাম্য ও সমতা। কোরআন মজীদ তার এ সাম্যের বিধানের আওতায় সমস্ত মুসলমানের মধ্যে ঐক্য, অভিন্নতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, সবাইকে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং যে কোনো ধরনের বিশেষ অগ্রাধিকার ও বর্ণগত ভেদাভেদের মূলোৎপাটন করেছে, তেমনি একের ওপর অন্যের প্রাধান্য ও ে ষ্ঠত্বের মূলোচ্ছেদ করেছে।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) এরশাদ করেন : "জাহেলীয়াতের যুগে যারা ঘৃণ্য, নীচ ও পদদলিত ছিলো মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের ছায়াতলে আ য় দান করে তাদেরকে সম্মান ও ে ষ্ঠত্বের অধিকারী করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে জাহেলী যুগের গর্ব- অহঙ্কার - বর্ণ, গোত্র আত্মীয়- স্বজন ও পূর্বপুরুষের গৌরব, আর সব রকমের বর্ণ ও ে ণীগত ভেদাভেদের মূলোৎপাটন করেছেন। সাদা- কালো, আরব- অনারব নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই আদমের

বংশধর, আর আল্লাহ্ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর নিকট প্রিয়তম লোক হিসেবে তারাই গণ্য হবে যারা সর্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ - খোদাভীরু।" (فروع کافی-۲، باب ۲۱: ان المؤمن کفو المؤمنة.)

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) আরো এরশাদ করেছেন : "সাধারণ জনগণের ওপর জ্ঞানীদের মর্যাদার তুলনা হচ্ছে তোমাদের মধ্যকার মুষ্টিমেয় সংখ্যক (৫ ষ্ঠতর) লোকদের ওপর আমার মর্যাদা।" (الجامع الصغیر با شرح مناوی ٤۳۲/٤.)

ইসলাম ঈমানী পূর্ণতার কারণে হযরত সালমান ফার্সীকে অন্য মুসলমানদের ওপর ৫ ষ্ঠত্ব প্রদান করেছে (যদিও তিনি ছিলেন অনারব), এমনকি তাঁকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পরিবারের সদস্য হিসেবে পর্যন্ত ঘোষণা করেছে (بحار الانوار- ٤، باب ۷٦: فضائل سلمان.), অন্যদিকে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর চাচা হওয়া সত্ত্বেও আবূ লাহাব্- কে তার কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার কারণে জাহান্নামী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর জীবনচরিতও প্রমাণ করে যে, তিনি কখনোই এবং কোনো অবস্থায়ই স্বীয় বংশ- গোত্র বা বর্ণকে অন্যদের ওপর ৫ ষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রদান করেন নি। তেমনি ঐ যুগের মানুষ যে সব বিষয়কে গৌরবের কারণ রূপে গণ্য করতো এবং তৎকালে প্রচলিত গর্ব- অহঙ্কার, ৫ ষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও বিশেষ সুবিধার আরো যে সব মানদণ্ড বিদ্যমান ছিলো সেগুলোর ভিত্তিতে তিনি কোনোদিনই গর্ব- অহঙ্কার করেন নি বা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করেন নি। বরং তিনি মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, নবুওয়াত, পরকাল ও নেক আমলের দিকে আহবান করেছেন।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) লোকদেরকে চিন্তা ও কর্মের ঐক্য এবং এক খোদার 'ইবাদত্- বন্দেগী ও আনুগত্যের দিকে পথনির্দেশ দিয়েছেন ও পরিচালনা করেছেন। এ পন্থায় তিনি মানুষের অন্তঃকরণের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে, তাদের অন্তর থেকে অযৌক্তিক গর্ব- অহঙ্কারের মূলোৎপাটন করতে এবং তার পরিবর্তে তাদের হৃদয়ে প্রেম- ভালোবাসা, মায়া-

মহব্বত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্কুরোদগম ঘটাতে সক্ষম হন। এর ফলে দেখা গেছে, অনেক সম্পদশালী ও সম্ভ্রান্ত লোক, ইতিপূর্বে ছোটলোকরূপে পরিগণিত দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের সাথে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কালোত্তীর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

সার্বিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, কোরআন মজীদের ধর্মীয় বিধিবিধান ও পার্থিব আইন-কানূনে এবং ইসলামের নতিক শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। ইসলাম এমন আইন-বিধান ও সমাজব্যবস্থা প্রদান করেছে যা সকল যুগের সকল দেশের সকল মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণে তথা তাদের সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম।

ইসলামের আইন-বিধানে একদিকে যেমন মানুষের বস্তুগত ও পার্থিব জীবনের প্রতিটি দিক-বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, তেমনি মানুষের অবস্তুগত, মনোজাগতিক, নতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক প্রতিটি দিক-বিভাগের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি এহেন নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ, সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক আইন-বিধান উপস্থাপন করেছেন তাঁর নবুওয়াতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে কি? বিশেষ করে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যখন একদল সভ্যতার আলো বর্জিত ও নিরক্ষর মানুষের মাঝে দুনিয়ায় আগমন করেছেন এবং এমন লোকদের মধ্যে বড় হয়েছেন যারা আসমানী কিতাবের শিক্ষার সাথে এক বিন্দুও সম্পর্ক রাখতো না - এর সাথে পরিচিতও ছিলো না, ফলতঃ এ পর্যায়ের আইন-বিধান ও শিক্ষা ছিলো তাদের চিন্তাশক্তির, বরং তাদের কল্পনাশক্তিরও উর্ধে। তাই এ আইন-বিধান না তিনি কারো কাছ থেকে শিখে নিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন, না নিজে রচনা করেছিলেন, বরং তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই তাঁকে প্রদান করা হয়েছিলো - এতে আর কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে কি?

অকাট্য তথ্য উপস্থাপনে কোরআন মজীদ

কোরআন মজীদ বহু বিষয়ে আলোকপাত করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে। কোরআন মজীদ আল্লাহর পরিচয় সহ বিচারবুদ্ধির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে (علوم عقلی - Intellectual or Rational Sciences) বক্তব্য উপস্থাপন করেছে, সৃষ্টির সূচনা ও বিকাশ, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহপরে পুনর্জীবন সম্পর্কে কথা বলেছে নক্ষত্র এবং মৃত্যুর -, অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াদি, মানুষের ব্যক্তিসত্তা বা আত্মা, ফেরেশতা, জ্বিন্, শয়তান ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলেছে। এছাড়া কোরআন মজীদ অতীতের ইতিহাস বর্ণনা করেছে; বিভিন্ন নবী) রাসূল -'আঃ (ও তাঁদের অনুসারীদের অবস্থা তুলে ধরেছে।

কোরআন মজীদ অনেক ক্ষেত্রে উপমা উপস্থাপন করেছে, কখনো বা বিচারবুদ্ধির দলীল- প্রমাণ তথা অকাট্য যুক্তি পেশ করেছে, কখনোবা নতিক- চারিত্রিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছে, কখনোবা ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, কখনোবা অন্য মানুষের পরিচালনা ও সমাজব্যবস্থা এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন- বিধান সম্পর্কে কথা বলেছে। কখনোবা ইবাদত- উপাসনা, বেচাকেনা, লেনদেন, সামাজিক সম্পর্ক ও বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা পেশ করেছে। তেমনি উত্তরাধিকার বণ্টন, বিচার, শাস্তি এবং এ সবের বাইরে আরো বহু বিষয়ে আইন- কানূন্ ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করেছে।

আর এ সমস্ত বিষয়েই কোরআন মজীদ সর্বোত্তম ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সত্যসমূহ তুলে ধরেছে। কোরআন মজীদ এমন সব সত্য তুলে ধরেছে যা ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত হবার সুযোগ নেই এবং যাতে কোনোদিনই সামান্যতম ত্রুটি পরিদৃষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। আর এ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মানবীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই একেবারেই অসম্ভব।

কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, ছোট- বড় প্রতিটি বিষয়ে আইন- কানূন্ প্রণয়ন করবে অথচ সে সব আইন- কানূন্ সব সময়ের জন্য - মানব প্রজাতির অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত

ত্রুটিমুক্ত বলে প্রমাণিত হবে। বিশেষ করে আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি যদি কোনো সভ্যতাবিবর্জিত ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্করহিত কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আবির্ভূত হন - যে জনগোষ্ঠী এ জাতীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান ও নিগূঢ় সত্যের সাথে আদৌ পরিচিত নয়, সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রণীত আইন- বিধান অকাট্য ও নির্ভুল হওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, কোনো ব্যক্তি যদি মানবীয় জ্ঞান- বিজ্ঞানের কোনো শাখার ওপরে একটি গ্রন্থ্ রচনা করেন, সে ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থ্ রচনার পর বেশীদিন না যেতেই তাঁর গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের বেশীর ভাগই ভুল- ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, মানবীয় জ্ঞান- বিজ্ঞানের বশিষ্ট্যই এই যে, এ সম্পর্কে যতো বেশী চিন্তা- গবেষণা ও আলোচনা- পর্যালোচনা করা হবে ততোই অনেক বেশী পরিমাণে সত্য - যা পূর্বে জানা ছিলো না - প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং এর ফলে অতীতের জ্ঞানী- গুণীদের প্রকাশিত মতামতের ভুল- ত্রুটি সমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই যথার্থই বলা হয়েছে : “সত্য হচ্ছে চিন্তা- গবেষণা ও আলোচনা- পর্যালোচনার ফসল।”

জ্ঞান- বিজ্ঞানের অসংখ্য অজ্ঞাত বিষয় ও অস্পষ্ট বিষয়ের সমাধানের ভার অতীতের জ্ঞানী- গুণী ব্যক্তিগণ পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন। তেমনি অতীতের দার্শনিকগণ দর্শনের ওপর বহু গ্রন্থ্ রচনা করে রেখে গেছেন, পরবর্তীকালের জ্ঞানী- গুণী- দার্শনিকগণ যার সমালোচনা করেছেন ও ভুলত্রুটি নির্দেশ করেছেন। এমনকি অতীতের জ্ঞানী- গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ তাঁদের আলোচনার যে সব অংশ দলীল- প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন বলে মনে করেছিলেন ও অভ্রান্ত বলে ধারণা করেছিলেন, সে সবেরও অনেক কিছু পরবর্তীকালীন আলোচনা- পর্যালোচনা ও চিন্তা- গবেষণায় ভিত্তিহীন ধারণা- কল্পনা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু কোরআন মজীদ জ্ঞান- বিজ্ঞানের অসংখ্য দিক- বিভাগের ওপর আলোচনা করা সত্ত্বেও এবং এর আলোচনার অনেক বিষয় খুবই উঁচু স্তরের হওয়া সত্ত্বেও এ মহাগ্রন্থ্ নাযিল্ হবার পর সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এতে সামান্যতম ভুলত্রুটিও প্রমাণিত হয় নি বা তা সমালোচনাযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয় নি। বস্তুতঃ এ পর্যন্ত কোরআন কর্তৃক উপস্থাপিত আইন-

কানূন্, বিধি- বিধান ও সত্যসমূহে সামান্যতম ভুলত্রুটি ও ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না তা নিশ্চয়তার সাথে বলা চলে।

অবশ্য সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী লোকেরা কেবল অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কল্পনার ভিত্তিতে কোরআন মজীদের কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে আপত্তি তুলেছে। আমরা তাদের এ সব আপত্তি নিয়ে পরে আলোচনা করবো ও তাদের মতামতের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করবো।

কোরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআন মজীদের কিছু সংখ্যক আয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। কোরআন মজীদ যে সব ঘটনা সংঘটিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে সে সবের মধ্য থেকে একটিরও অন্যথা হয় নি। বলা বাহুল্য যে, যেহেতু এগুলো খোদায়ী ওয়াহীর ভবিষ্যদ্বাণী সেহেতু তার অন্যথা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এখন আমরা এ জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি সম্পর্কে উল্লেখ করবো।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের আগাম বার্তা

কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم و تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين.)

“আর স্মরণ কর সেদিনের কথা যখন আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তোমরা দু’টি দলের মধ্যে যে কোনো একটির সাথে মুখোমুখি হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যে, দুর্বল দলটির সাথে মোকাবিলা করবে। কিন্তু আল্লাহ্ চান যে, (তোমরা শক্তিশালী দলটির সাথে মোকাবিলা করবে এবং তার মাধ্যমে তিনি) সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন ও কাফেরদের শক্তিকে খর্ব করে দেবন।” (সূরাহ্ আল্- আনফাাল্ : ৭)

উক্ত আয়াতটি বদর যুদ্ধের আগে নাযিল্ হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত আয়াতে এ যুদ্ধে মু’মিনদের বিজয় ও কাফেরদের বিপর্যয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং অচিরেই তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কাফেরদের দু’টি কাফেলার মধ্যে একটি ছিলো বাণিজ্যিক কাফেলা, অপরটি ছিলো সামরিক কাফেলা। কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিলো বিধায় প্রতিপক্ষের বাণিজ্যিক কাফেলাও সামরিক গুরুত্বের অধিকারী ছিলো। তাছাড়া তৎকালে আরবরা সর্বাবস্থায় অস্ত্র বহন করতো এবং বাণিজ্যিক কাফেলায়ও দস্যুহামলা মোকাবিলা করার

জন্য কিছু সংখ্যক শক্তিশালী যোদ্ধা রাখা হতো। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা কাফেরদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর হামলা চালালে তার বিরুদ্ধে বিজয় হতো সহজতর। কিন্তু তা গৌরবজনক হতো না। কাফেলা দু'টি মদীনার কাছে এসে পৌঁছার আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এর খবর জানিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা কাফেরদের সামরিক কাফেলার সাথে যুদ্ধ করে এবং তাতে গৌরবময় বিজয়ের অধিকারী হয়।

ঐ সময় মুসলমানরা সংখ্যাশক্তি ও সামরিক উপকরণাদির দিক থেকে কাফেরদের তুলনায় খুবই দুর্বল ছিলেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সন্যসংখ্যা ছিলো মাত্র ৩১৩ জন, অন্যদিকে কাফেরদের সন্যসংখ্যা ছিলো এক হাজার। মুসলমানদের মধ্যে হযরত মিক্বদাদ্ ও হযরত যুবাইর্ বিন্ 'আওয়াম - মাত্র এই দু'জন অশ্বারোহী সন্য ছিলেন, বাকী সবাই ছিলেন পদাতিক। অন্যদিকে কাফেররা সংখ্যাশক্তিতেও বেশী ছিলো এবং সামরিক সরঞ্জামের দিক থেকেও শক্তিশালী ছিলো। কোরআন মজীদেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদের তুলনায় কাফেররা এতোই শক্তিশালী ছিলো যে, মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই- এর ব্যাপারে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আগেই মুসলমানদেরকে তাঁর আসমানী ফয়সালার কথা জানিয়ে দেন যে, তিনি চান, সত্যকে মিথ্যার ওপর বিজয়ী করবেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (বলা বাহুল্য যে, তিনি কখনোই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না) মুসলমানদেরকে তাঁদের দুশমনদের ওপর বিজয়ী করে দেন এবং কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করে দেন।

কাফেরদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের আগাম বার্তা

কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين. انا كفيناك المستهزءين الذين يجعلون مع الله الهاً آخر. فسوف يعلمون.)

"অতএব, (হে রাসূল!) আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিন এবং মুশরিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করুন। নিঃসন্দেহে সেই বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আমি আপনাকে

যথেষ্ট সামর্থ্যবান করে দেবো যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তারা (তাদের কাজের অ ভ পরিণতি) জানতে পারবে।" (সূরাহ্ আল্- হিজর : ৯৪- ৯৬)

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) মক্কায় ইসলাম প্রচার রু করার পর প্রথম দিকেই এ আয়াত ক'টি নাযিল্ হয়। বাযযাায্ ও ত্বিবরাানী প্রমুখ মুফাসসিরে কোরআন এ আয়াত নাযিলের উপলক্ষ্য সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে : একদিন হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যখন মক্কায় কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা তাঁর প্রতি উপহাস ও বিদ্রুপ করে এবং বলে : "এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ধারণা করছে যে, সে একজন নবী এবং জিবরাঈল তার সাথে রয়েছে।" (১৩৩ - لباب النقئل: جلال الدين سيوطى)

অতঃপর এ আয়াত ক'টি নাযিল্ হয় এবং এতে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর বিজয় ও অদৃশ্য ঐশী সাহায্য লাভ এবং তাঁর প্রতি বিদ্রুপকারীদের অপমান- লাঞ্ছনা ও পর্যুদস্ত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়।

এ আয়াত ক'টি এমন এক সময় নাযিল্ হয় যখন কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিলো না যে, এমন এক সময় আসবে যখন ক্বুরাইশরা তাদের শৌর্য- বীর্য ও ইজ্জত- সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলবে এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর বিজয়ের মাধ্যমে তাদের শক্তি ও আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই একই প্রসঙ্গে মক্কায় নাযিলকৃত অপর একটি আয়াত হচ্ছে :

(هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون.)

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দ্বীনকে সামগ্রিকভাবে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী ও সমুদ্ভাসিত করে দেন।" (সূরাহ্ আছ্- ছ্বাফ্ : ৯)

কোরআন মজীদে আরো এরশাদ হয়েছে :

(ام يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع و يولون الدبر.)

"তারা কি বলছে : "আমরা অপরাজেয় দল।"? এ দল অচিরেই পরাজিত হবে ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।" (সূরাহ্ আল্- ক্বামার : ৪৪- ৪৫)

এ আয়াতদ্বয়েও মোশরেকদের পরাজয় ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর অচিরেই বদর যুদ্ধের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়।

এ যুদ্ধে মোশরেকদের নেতা আবূ জেহেল তার ঘোড়া নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে এবং স্বীয় সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে : "আজ আমরা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী সে নিহত হয় এবং তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন এবং সত্যের বাণীর ে ষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপন্ন করেন। আর এ ঘটনা এমন এক সময় সংঘটিত হয় যখন মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যায় অল্প এবং সামরিক শক্তিতে খবই দুর্বল। তখন কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিলো না যে, মাত্র দু'টি অশ্ব ও সত্তরটি উট (যাতে তাঁরা পালাক্রমে সওয়ার হতেন) সম্বলিত মাত্র তিনশ' তেরো জন লোকের এক বাহিনী - যারা যুদ্ধসরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিলেন না, তাঁরা বিপুল যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যবিধ সামরিক উপকরণে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন এবং তাদের শক্তিকে খর্ব করে দেবেন, তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন, আর তাদের সম্মান, আধিপত্য ও গৌরবকে নস্যাৎ করে দেবেন।

রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(غلبت الروم. فى ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون)

"রোম পরাজিত হয়েছে (আরব থেকে) নিকটতর ভূখণ্ডে, কিন্তু তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা বিজয়ী হবে।" (সূরাহ্ আর্- রূম্ : ২- ৩)

কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত দু'টি পারস্য সামরাজ্যের নিকট রোম সামরাজ্যের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই নাযিল্ হয়। এতে অচিরেই পারস্যের বিরুদ্ধে রোমের বিজয়ের

ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কার্যকরী হয় এবং রোম সমরাটের সেনাবাহিনী পারস্যে প্রবেশ করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ৬১৪ খৃস্টাব্দে রোমান সামরাজ্য পারস্য সামরাজ্যের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং ঐ বছরই আরব উপদ্বীপ সংলগ্ন সিরিয়া ও ফিলিস্তিন রোমানদের হাত থেকে পারস্যের হাতে চলে যায়। যদিও অগ্নিপূজারী পারস্য সামরাজ্য ও খৃস্টান রোমান সামরাজ্য উভয়ই ছিলো অমুসলিম, কিন্তু এ সত্ত্বেও খৃস্টানরা আহলে কিতাব্ ও তাওহীদবাদী হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণে মুসলমানরা অগ্নিপূজারীদের মোকাবিলায় তাদের প্রতি নতিক সমর্থন ব্যক্ত করতেন, অন্যদিকে মক্কাহর মুশরিকরা অগ্নিপূজারী পারসিকদের সমর্থন করতো।

এমতাবস্থায় রোমান সামরাজ্য পরাজিত হলে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে এই বলে উপহাস করতে থাকে যে, তোমাদের দাবী অনুযায়ী খোদা যদি মাত্র একজন হবেন এবং দেবদেবী সব মিথ্যা হবে তাহলে সে খোদা অগ্নিপূজারী পারসিকদের মোকাবিলায় তাওহীদবাদী আহলে কিতাব্ রোমান খৃস্টানদের পরাজয় ঠেকাতে পারলেন না কেন?

যদিও এটা ছিলো একটা অপযুক্তি, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার এটা নীতি নয় যে, পার্থিব কার্যকারণ বিধিকে অকার্যকর করে সর্বাবস্থায় তাওহীদবাদীদের বিজয়ী করে দেবেন, তা সত্ত্বেও কালোর্ধ পরম জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই রোমানদের বিজয়ী হবার তথ্য জানিয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং নয় বছরের মধ্যে তা বাস্তবে রূপায়িত হয় - যা কোরআন মজীদের ঐশিতাও প্রমাণ করে।

আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীর পরিণতি

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(تبت يدا ابى لهب و تب. ما اغنى عنه ماله و ما كسب. سيصلى ناراً ذات لهب و امرأته. حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد.)

“আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক (তার শক্তি খর্ব হোক) আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধনসম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে তা তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না। অচিরেই সে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে (দোযখে) প্রবেশ করবে। আর তার জ্বালানী কাষ্ঠ বহনকারিনী স্ত্রী- ও (অচিরেই সে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে) - এমন অবস্থায় যে, তার গলায় খেজুর পাতায় তরী রশি থাকবে।” (সূরাহ্ লাহাব্ : ১- ৫)

এ সূরাহটি আবূ লাহাবের জীবদ্দশায় মক্কায় নাযিল্ হয় এবং এতে তার ও তার স্ত্রীর অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যার মানে হচ্ছে এরা দু’জন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করবে না, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্ধ বিরোধিতা অব্যাহত রাখবে। কার্যতঃও তা- ই হয় এবং তারা উভয়ই কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হয়।

উল্লেখ্য, এ সূরাহ্ নাযিল হওয়ার সময় মক্কার অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ছিলো ইসলামের ঘোরতর বিরোধী। তাই তাদের মধ্যে পরবর্তীতে কে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং কে ইসলাম গ্রহণ করবে না তা মানবীয় বিচারবুদ্ধির পক্ষে বলা সম্ভব ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মধ্য থেকে আবূ সুফিয়ান পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় সুস্পষ্টভাবে আবূ লাহাবের জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা কেবল খোদায়ী ওয়াহীর পক্ষেই সম্ভব ছিলো।

বর্ণিত আছে, আবূ লাহাবের স্ত্রী জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করে তার বোঝা খেজুর পাতার রশি দিয়ে বেঁধে সে রশির মধ্যে গলা প্রবেশ করিয়ে বোঝাটি পিঠের ওপর নিয়ে বহন করতো। এটা ছিলো তার নিয়মিত অভ্যাস। ঘটনাক্রমে একদিন তার পিঠের বোঝা ঘুরে গিয়ে তার গলার রশিতে টান পড়ে রশিটি শক্তভাবে তার গলায় এঁটে যায়। এর ফলে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। এভাবেই বিশেষভাবে উক্ত সূরাহর শেষ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী হয়।

মক্কাহ্ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(انا فتحنا لک فتحاً مبیناً.)

"(হে রাসূল!) অবশ্যই আমি আপনার জন্য এক সুস্পষ্ট বিজয় এনে দিয়েছি।" (সূরাহ্ আল্-ফাতহ্ : ১)

এ আয়াতটি দিয়ে সূচিত সূরাহ্ আল্- ফাতহ্ হুদায়বীয়াহর সন্ধির পর পরই নাযিল্ হয়।

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নেতৃত্বে মুসলমানরা কা'বাহ্ শরীফের 'উমরাহ্ করতে যান। কিন্তু জাহেলীয়্যাতের যুগেও হজ্ব ও 'উমরাহর মাসগুলো এমনকি মোশরেকদের কাছেও পবিত্র ও সম্মানার্হ গণ্য হওয়া এবং এ সব মাসে যুদ্ধ- বিগ্রহ গর্হিত কাজ বলে পরিগণিত হওয়া সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা মুসলমানদের 'উমরাহ্ করতে আসার খবর জানতে পেরে তাঁদেরকে মক্কায় আসতে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মোশরেকদের এ যুদ্ধপ্রস্তুতির মুখে রক্তপাত এড়াবার লক্ষ্যে মক্কা নগরীর অদূরে হুদায়বীয়াহ্ নামক স্থানে স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে যাত্রাবিরতি করেন। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ- আলোচনার পর বাহ্যতঃ মুসলমানদের জন্য অপমানজনক এমন কতক শর্তে, বিশেষ করে মুসলমানরা ঐ বছরের মতো 'উমরাহ্ না করে মদীনায় ফিরে যাবেন এ শর্তে, দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মুসলমানদের সকলেই প্রয়োজনে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাই তাঁদের প্রায় সকলেই এ ধরনের সন্ধির বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কাফেরদের দেয়া সকল শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করেন। এতে মুসলমানদের অনেকেই দুঃখিত হন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মদীনায় ফিরে আসার পথে উক্ত সূরাহ্ নাযিল্ হয় এবং তাঁদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এ সন্ধি বাহ্যতঃ অপমানজনক হলেও এর চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে সুস্পষ্ট বিজয়। কার্যতঃও তা- ই হয়েছিলো।

উক্ত সন্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুফল ছিলো এই যে, এর মাধ্যমে মক্কাহ্‌র কাফেররা মুসলমানদেরকে - যাদেরকে তারা এর আগে ধর্মত্যাগী ও গোত্রত্যাগী বলে গণ্য করতো - নিজেদের সমকক্ষ একটি পক্ষ ও শক্তি হিসেবে মেনে নেয়। দ্বিতীয়তঃ মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকায় মুসলমানদের জন্য আরব উপদ্বীপের সর্বত্র ও এর বাইরে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ মক্কাহ্‌ ও মদীনার লোকদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় গোপনে মক্কায় ইসলামের যথেষ্ট বিস্তার ঘটে ও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এর ফলে, দুই বছরের মধ্যে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার কারণে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ) যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ধিচুক্তি বাতিল করে দেন এবং এরপর মক্কা বিজয়ের জন্য অভিযান চালান তখন পুরোপুরি বিনা রক্তপাতে মক্কাহ্‌ বিজয় সম্ভবপর হয়।

দলে দলে ইসলাম গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী

(اذا جاء نصر الله والفتح و رأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجاً.)

“যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে এবং (হে রাসূল!) আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, . . . ।” (সূরাহ্‌ আন্‌- নাছ্বর্‌ : ১- ২)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে ধু ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয় নি, বরং লোকদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণেরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর ইতিহাস তা- ই প্রত্যক্ষ করেছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কোনো শক্তি যুদ্ধে বিজয়ী হলেই যে পরাজিত পক্ষের লোকেরা অতি দ্রুত দলে দলে তার ধর্ম গ্রহণ করবে এর কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখা যায় না। অবশ্য ইতিহাসে কতক ক্ষেত্রে বিজয়ীদের দ্বারা জবরদস্তিমূলকভাবে পরাজিতদের ধর্মান্তরকরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে (যেমন স্পেনে ও ফিলিপাইনে মুসলমানদেরকে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তর)। কিন্তু ইসলাম জবরদস্তি ধর্মান্তরের ঘোরতর বিরোধী এবং ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ধর্মান্তরের নযীর নেই। তা সত্ত্বেও হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায় দলে দলে গোত্রের পর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে কোরআন মজীদের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী হয়।

কতিপয় বজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআন মজীদে ভবিষ্যত আবিষ্কার- উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তৎকালীন বিশ্ব বজ্ঞানিক অগ্রগতির যে স্তরে অবস্থান করছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সব ভবিষ্যদ্বাণী সরাসরি করা হলে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো এবং অনেকে হয়তো এগুলোকে কল্পকাহিনী মনে করে তার ভিত্তিতে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত্ ও কোরআন মজীদকে প্রত্যাখ্যান করতো। সম্ভবতঃ এ কারণে এ সব ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ প্রকাশকৌশলের আ য়ে প্রচ্ছন্নভাবে করা হয়েছে - যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাগবেষণার ফলে পরবর্তীকালে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করছি :

খাদ্যশ উৎপাদনে বিস্ময়কর অগ্রগতি :

[ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে "কোরআন ও নুযূলে কোরআন" অধ্যায়ের "সাত যাহের্ ও সাত বাত্বেন্" উপশিরোনামে নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র অধ্যায়ের দাবী অনুযায়ী এখানে পুনরুক্তি করা হলো।]

(مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی كل سنبلة مائة حبة. و الله يضاعف لمن يشاء. و الله واسع عليم.)

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের (এ কাজের) উপমা হচ্ছে, যেন একটি শস্যদানায় সাতটি শীষ উদগত হলো - যার প্রতিটি শীষে একশ'টি করে দানা হলো। আর আল্লাহ্ যাকে চান বহু গুণ বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ অসীম উদার ও সদাজ্ঞানময়।" (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২৬১)

এ আয়াতে একটি প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তা হচ্ছে, একটি শস্যদানা থেকে সাতশ' বা তার বেশী সংখ্যক শস্যদানা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন একটি শস্যদানা থেকে সাতশ' বা তার বেশী শস্যদানা উৎপন্ন হবে।

উক্ত আয়াত থেকে যে আমরা এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করছি তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের আওতায় অসম্ভব এমন কিছুর উদাহরণ দেবেন - তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোরআন মজীদ নাযিলের যুগের কৃষিব্যবস্থায় একটি ধান বা গম অথবা অন্য কোনো দানা জাতীয় শস্য থেকে সাতশ' দানা উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টি ছিলো অকল্পনীয়, কিন্তু সে যুগেও একটি ফলের বীজ থেকে গজানো গাছে ধু এক বার নয়, বরং প্রতি বছর সাতশ' বা তার বেশী ফলের উৎপাদন অসম্ভব ছিলো না। আরব দেশে উৎপন্ন জলপাই, খেজুর, আঞ্জির (ডুমুর), আঙ্গুর ইত্যাদি ছিলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমতাবস্থায় যদি উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতো ধু আল্লাহর পথে ব্যয়ের ভ প্রতিফল বর্ণনা করা তাহলে এ ক্ষেত্রে ফলের বীজের উদাহরণই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা দানা জাতীয় শস্যের উদাহরণ দিয়েছেন এবং এভাবে দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদ নাযিলের যুগের পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। তাই তাঁরা উক্ত আয়াতের প্রথম বাহ্যিক তাৎপর্য (দানের প্রতিদানের অঙ্গীকার) নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে ধান ও গমের বহু উচ্চফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতিমধ্যেই একটি দানা থেকে সাতশ' দানা বা তার বেশী উৎপন্ন হচ্ছে।

নভোলোকে পরিভ্রমণ :

(يا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات الارض فانفذوا. لا تنفذون الا بسلطان)

"হে জিন্ ও মানব গোষ্ঠী! তোমরা যদি আসমান সমূহ ও ধরণীর পরিধিকে ভেদ করে যেতে সক্ষম হও তো ভেদ করে যাও। কিন্তু (যথাযথ) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা ভেদ করবে না।" (সূরাহ্ আর্-রাহমা়ান্ : ৩৩)

এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে, এক সময় মানুষের পক্ষে আসমান সমূহ ও পৃথিবীর পরিধি ভেদ করে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কোরআন নাযিলের যুগের লোকদের পক্ষে এ কথা

কল্পনা করা সম্ভব ছিলো না। তাই এ আয়াতের অর্থ করা হতো যে, এতে অক্ষমতা প্রমাণের জন্য তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতের বাচনভঙ্গি নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। এ থেকে বুঝা যায় যে, কোরআন মজীদ আসমান- যমীনের পরিধিকে ভেদ করা মানুষের জন্য অসম্ভব বলে নি, তবে কাজটি সহজ নয়; এ জন্য যথাযথ প্রস্তুতি পয়োজন হবে। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের পূর্বাপর থেকে এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না যে কারণে লোকদেরকে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা চলে। বিশেষ করে কথাটি যখন কেবল কাফেরদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয় নি, বরং সকল মানুষকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে তখন এটাকে চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য করা কঠিন।

তৃতীয়তঃ তৎকালীন মানবসমাজ যে কাজকে মানুষের আওতাবহির্ভূত বলে মনে করতো এমন কাজ সম্পাদনের জন্য তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতো না। বরং এ ধরনের চ্যালেঞ্জ দেয়া হলে কাফেররা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারতো যে, তিনি যখন নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করছেন তখন তিনিই আসমান সমূহ ও পৃথিবীর অক্ষ ভেদ করে দেখান। কিন্তু ইতিহাসে বা হাদীছে এ ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে পক্ষে- বিপক্ষে কোনো বিতর্ক বা আলোচনার তথ্য পাওয়া যায় না।

অবশ্য এর পরবর্তী এক আয়াতের আলোকে চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকতে পারে। কারণ, এরশাদ হয়েছে :

(يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران.)

"তোমাদের জন্য অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও ধূম্র পাঠানো হবে; অতঃপর তোমরা কোনোরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" (সূরাহ্ আর- রাহমান্ : ৩৫)

অনেকে এ আয়াতে উল্কাপাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ উর্ধকাশে গমনের চেষ্টা করলে উল্কা নিক্ষেপ করে প্রতিহত করা হবে (যা শয়তানদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে)। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ধূম্র পাঠানোর কথাটিকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। অন্যদিকে ধরণীর পরিধি ভেদ করার চেষ্টা করা হলে সে ক্ষেত্রেও অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও ধূম্র পাঠানোর বিষয়টি পুরোপুরি

খাপ খায় না। বিশেষ করে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে ‘পাঠানো’ শব্দটির প্রয়োগ বেশ কঠিন। দৃশ্যতঃ এ আয়াতে অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলা হয়েছে যাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও ধূম্র উভয়ই শামিল থাকে। এর পর পরই নভোলোক ধ্বংসের তথা ক্বিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। (আয়াত নং ৩৭) তাই উপরোক্ত আয়াতে ক্বিয়ামতের পূর্বে ব্যাপকভাবে অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে - এ সম্ভাবনাই সর্বাধিক।

সৃষ্টিসূচনার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন :

(او لم يروا كِف يُبدء الله الخلق ثم يعيده. ان ذالک على الله يسير. قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدء الخلق.)

“তারা কি দেখে নি আল্লাহ্ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন? আর এরপর তিনিই তাকে প্রত্যাবর্তন করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর জন্য এ কাজ খুবই সহজ। (হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, তোমরা ধরণীর বুকে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো যে, কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন।” (সূরাহ্ আল্- ‘আনকাবূত্ : ১৯- ২০)

অত্র আয়াতে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধরণীর বুকে এমন সব নিদর্শন আছে যা নিয়ে গবেষণা করা হলে সৃষ্টির সূচনাপ্রক্রিয়া ও অগ্রগতি সম্বন্ধে জানা যাবে। তাই দৃশ্যতঃ এ উপদেশ কোরআন নাযিলের অনেক পরবর্তীকালীন এমন এক প্রজন্মের উদ্দেশে যখন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষের পক্ষে গবেষণা করে সৃষ্টির সূচনাপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা সম্ভব হবে। অবশ্য خلق শব্দটি সৃষ্টিকরণ, প্রাণীকুল ও মানুষ - এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে প্রথম অর্থে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের আদিসূচনা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মোদ্দা কথা, অত্র আয়াতে এতদসংক্রান্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, বিশেষ করে ফসিল পরীক্ষা ও জেনেটিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষের প্রাচীনতম প্রজন্ম সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। তেমনি সাম্প্রতিক কালে এমন অনেক প্রাণী প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলোকে পরীক্ষা করে

বিজ্ঞানীগণ প্রাচীনতম প্রজাতিসমূহের অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন - যাদের বশিষ্ট্যে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অতএব, সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান সৃষ্টির আদিসূচনা সম্পর্কিত তথ্যাদিও উদঘাটন করতে সক্ষম হবে।

কোরআন মজীদে সৃষ্টিরহস্য

কোরআন মজীদের বহু আয়াতে সৃষ্টি, প্রাকৃতিক জগত, নভোমণ্ডলের গ্রহ- নক্ষত্রাদি এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক বিধিবিধান সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। কোরআন মজীদ এমন এক যুগে এ সব সত্য ও রহস্য উন্মোচন করে দেয় যে যুগে একমাত্র খোদায়ী ওয়াহী ছাড়া এ সব সত্য ও রহস্যে উপনীত হবার মতো অন্য কোনো পন্থা কারো কাছেই বর্তমান ছিলো না।

অবশ্য সে যুগে গ্রীসে এবং আরো কোনো কোনো জায়গায় অত্যন্ত মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন যারা সৃষ্টিলোকের রহস্যাবলীর অংশবিশেষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং নিখুঁত বজ্ঞানিক তথ্যাদির কিছু কিছু উদঘাটন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালে আরব উপদ্বীপ এ সব জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিলো, বরং এ জাতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যন্ত ওয়াকেফহাল ছিলো না।

কিন্তু কোরআন মজীদ যে সব বজ্ঞানিক তথ্যের রহস্য উন্মোচন করেছে তার অংশবিশেষ এবং কোরআন মজীদের অধিকাংশ জ্ঞানমূলক বিষয়াদি - যা এখন থেকে চৌদ্দশ’ বছর আগে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়, তা এতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এমনই নিখুঁত ও সূক্ষ্ম যে, তৎকালীন গ্রীস ও অন্যান্য দেশের জ্ঞানী- গুণী- বিজ্ঞানীগণ পর্যন্ত সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবার পর এবং বিজ্ঞানের প্রসার ও অগ্রগতির সাথে সাথে এ সব রহস্য উদঘাটন সম্ভব হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন মজীদ তার বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত সমূহে একদিকে যেমন হুবহু বজ্ঞানিক তথ্যাদি তুলে ধরেছে, অন্যদিকে তৎকালীন মানুষের গ্রহণ ও অনুধাবন ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু যে সব বিষয় তৎকালীন মানুষের অনুধাবনশক্তির বহির্ভূত ছিলো সে সব বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার পরিবর্তে মোটামুটিভাবে তুলে ধরাটাই যথোপযোগী ছিলো এবং মোটামুটি আভাসদানই যথেষ্ট ছিলো - যার পরিপূর্ণ উদঘাটন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ পরবর্তীতে বিভিন্ন শতাব্দীতে আগত বিজ্ঞানীদের

ওপর ন্যস্ত করাই সঙ্গত ছিলো। কোরআন মজীদ তা- ই করেছে এবং পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উন্নততর ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ইত্যাদির ফলে কোরআন মজীদের উপস্থাপিত এ সব বজ্ঞানিক তথ্য বিস্তারিত রূপ লাভ করেছে।

এখন আমরা সৃষ্টিরহস্য, বিশ্বব্যবস্থাপনা ও সূক্ষ্ম বজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াত সমূহের অংশবিশেষ তুলে ধরবো।

সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত উপাদানে সৃষ্টি

কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و انبتنا فيها من كل شيء موزون)

"আমি তাতে (ধরণীর বুকে) প্রতিটি জিনিসকে যথাযথ পরিমিতি ও ভারসাম্য সহকারে উদ্ভূত করিয়েছি।" (সূরাহ্ আল্- হিজর : ১৯)

সৃষ্টিলোকের গুরুত্বপূর্ণ রহস্যাবলীর অন্যতম হচ্ছে যথাযথ পরিমিতি ও বিভিন্ন উপাদানের যথোপযোগী অনুপাতের যৌগিকতা সহকারে সব কিছুর সৃষ্টি। অত্র আয়াতে এরই আভাস দেয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের انبتنا (উদগত করিয়েছি) দৃষ্টে মুফাসসিরগণ সাধারণতঃ এ আয়াতটিকে কেবল উদ্ভিদরাজি সম্পর্কিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আয়াতের কর্মপদ كل شيء (প্রতিটি জিনিস)- এর প্রতি দৃষ্টি দিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রাণীকুলও এর আওতাভুক্ত যার প্রতিটি প্রজাতিকে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উপাদানের সুনির্দিষ্ট অনুপাতের যৌগের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোজম ও জিনের যে পার্থক্য রয়েছে যান্ত্রিক অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক পন্থায় তাতে পরিবর্তন ঘটা ও এক প্রজাতির অন্য প্রজাতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয় (কৃত্রিম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভব হলে হতেও পারে) - যা বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিকে পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, এ আয়াতের বক্তব্যের অন্যতম প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে উদ্ভিদরাজি। ধরণীর বুকে যে সব উদ্ভিদের উদগম ঘটে এবং উদ্ভিদ থেকে যে পুষ্পরাজি প্রস্ফূটিত হয়, তার প্রতিটিই সুনির্ধারিত উপাদানসমষ্টির সমন্বয়ে এবং বিশেষ পরিমিতির ভিত্তিতে সৃষ্ট। সম্প্রতি উদ্ভিদবিজ্ঞানেও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিটি ধরনের উদ্ভিদই সুনির্দিষ্ট অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত এবং তা সুনির্দিষ্ট উপাদানসমষ্টির পরিমিত ও নির্ধারিত অনুপাত সমন্বয়ে গঠিত যার ফলে এর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ছোট- বড় হলেও তা ঐ উদ্ভিদের সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয় না এবং অন্য উদ্ভিদে পরিণত হয় না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের অনুপাতের ব্যবধান এমনই সূক্ষ্ম যে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এখনো তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

বায়ুবাহিত পরাগায়ণ

খোদায়ী ওয়াহী যে সব বিস্ময়কর সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আভাস দিয়েছে তার মধ্যে উদ্ভিদজগতের পরাগায়ণ অন্যতম। বায়ুর সাহায্যে অসংখ্য গাছপালা, লতাপাতা ও তৃণ- আগাছার পরাগায়ণ সম্পাদিত হয় এবং এর ফলেই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি সম্ভব হয়; ফুল, ফল ও নব নব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, যদিও পাখী ও বিভিন্ন ধরনের কীট- পতঙ্গের দ্বারাও পরাগায়ণ ঘটে থাকে, কিন্তু তা সমগ্র উদ্ভিদ জগতের মোট পরাগায়ণের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আরো লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা সৃষ্টিপ্রকৃতিতে বায়ুবাহিত পরাগায়ণের ব্যবস্থা না রাখলে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের বর্তমান যুগে ফল- ফসল ফলানো সম্ভব হতো না অথবা কীটনাশক বর্জন করতে হতো, ফলে ফল- ফসল হলেও আনুপাতিক হারে কম হতো।

আল্লাহ্ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ করেন :

(و ارسلنا الرياح لواقح.)

“আর আমি পরাগায়ণ সম্পাদনকারী বায়ু পাঠিয়েছি।” (সূরাহ্ আল্- হিজর : ২২)

যেহেতু অতীতে বায়ুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পরাগায়ণের বিষয়টি মানুষের জানা ছিলো না, তাই প্রাচীন কালের মুফাসসিরগণ অভিধানে تلقيح শব্দের (যার অভিন্ন মূল থেকে لواقح শব্দটি উৎসারিত) অন্যতম অর্থ حمل (বহন) দৃষ্টে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন : "আমি বায়ু পাঠিয়েছি যাতে তা মেঘমালাকে বহন করে।" বা "আমি বায়ু পাঠিয়েছি যা মেঘমালার মধ্যে বৃষ্টিকে বহন করে।" এছাড়া অনেকে উক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছেন : "আমি গর্ভবতী বায়ু প্রেরণ করেছি।" এবং الرياح لواقح- এর অর্থ করেছেন 'মেঘকে গর্ভে ধারণকারী বায়ু'।

কিন্তু কোরআন মজীদের এ আয়াতের যে এরূপ অর্থ করা হয়েছে তা এর সঠিক অর্থ বলে মনে হয় না। কারণ, বহন করে নেয়া বলতে যা বুঝায় সে অর্থে বায়ু মেঘকে বহন করে না, বরং বায়ু মেঘকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করে মাত্র।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পাখী বা পাতা, তুলা, ঘুড়ি ইত্যাদিকে বায়ু যেভাবে বহন করে মেঘকে সেভাবে বহন করে না। কারণ, মেঘ কোনো কঠিন পদার্থ নয়, বরং মেঘ হচ্ছে বিরাট ঘনক্ষেত্র জুড়ে জলীয় বাষ্পের অবস্থান (যা বায়ুরই ন্যায় গ্যাসীয় অবস্থার অধিকারী এবং যাতে বায়ু মি ত থাকে), তবে দূর থেকে দৃষ্টি প্রতিহত করায় তা দেখতে ঘন কঠিন পদার্থের মতো মনো হয়। কিন্তু কার্যতঃ বায়ু মেঘকে বহন করে না, বরং মেঘ নামে অভিহিত 'বায়ু ও জলীয় বাষ্পের সংমি ণ' বায়ুপ্রবাহের ফলে বায়ুরই অংশ হিসেবে গতিশীল ও স্থানান্তরিত হয়।

বস্তুতঃ এ আয়াত আমাদেরকে এক উঁচু স্তরের বজ্ঞানিক সত্যের দিকে পরিচালিত করে যা পর্যবেক্ষণে অতীতের জ্ঞানী- মনীষীগণ অক্ষম ছিলেন। এ সত্যটি হচ্ছে এই যে, প্রাণীজগতের ন্যায় গাছপালা- লতাপাতারও গর্ভসঞ্চারের অর্থাৎ নারী ও পুরুষ - এ দুই উপাদানের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে; এছাড়া ফল উৎপাদিত হয় না ও বংশবৃদ্ধি ঘটে না।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই গর্ভসঞ্চার বা দুই বিপরীত উপাদানের একত্রিত হওয়ার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে, যেমন : ডালিম, কমলা, তুলা, বিভিন্ন ধরনের ডাল ইত্যাদি। এগুলোর পরাগায়ণ বায়ুর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে পুরুষ

জাতীয় পরাগরেণু বায়ুর সাহায্যে ফুলের গর্ভকেশরে পৌঁছার ফলে ফুলের গর্ভসঞ্চার ঘটে এবং ফল উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের বা উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

কোরআন মজীদ তার বজ্ঞানিক সত্য উদঘাটনকারী আয়াত সমূহে অপর যে একটি সত্য তুলে ধরেছে তা হচ্ছে, জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি তথা প্রজাতিসমূহের নারী ও পুরুষ রূপে সৃষ্টি এবং তাদের উভয়ের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি কেবল প্রাণীকুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উদ্ভিদও এ প্রাকৃতিক বিধানের আওতাভুক্ত। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين)

“আর প্রতিটি ফল- ফসলের ক্ষেত্রে তিনি দুইয়ে দুইয়ে জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।” (সূরাহ্ আর্-রা‘দ্ : ৩)

(سبحان الذى حلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون.)

“পরম প্রমুক্ত সেই সত্তা যিনি ধরণীর বক্ষে যা কিছু উদগত হয় সে সব কিছুকে, স্বয়ং তাদেরকে (মানুষকে) এবং এমন অনেক কিছুকে যাদের সম্পর্কে তারা জ্ঞান রাখে না, সে সবের প্রতিটিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।” (সূরাহ্ ইয়া- সীন্ : ৩৬)

এখানে স্মর্তব্য যে, কোরআন নাযিলের যুগে উদ্ভিদকুলের মধ্যে মাত্র হাতে গণা কয়েকটি উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যতীত - যেগুলোর পুরুষ গাছ ও নারী গাছ আলাদা - অন্যান্য উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে নারী ও পুরুষ উপাদানের বিষয়টি কারো জানা ছিলো না যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে এটা সকলেরই জানা যে, যে সব উদ্ভিদের স্বতন্ত্র নারী গাছ ও পুরুষ গাছ নেই সে সব উদ্ভিদে হয় একই গাছে নারী ফুল ও পুরুষ ফুল - দুই ধরনের ফুল ধরে, অথবা একই ফুলে গর্ভকেশর ও পুংকেশর হয়ে থাকে। এমনকি ডুমুরে - দৃশ্যতঃ যা ফুল ছাড়া সরাসরি ফল হিসেবেই বের হয়, তাতেও গর্ভকেশর ও পুংকেশর আছে বলে অতি সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডুমুর যখন বের হয় প্রকৃত পক্ষে তা- ই ফুল এবং এর পশ্চাদদেশে

গর্ভকেশর ও পুংকেশর থাকে; এক ধরনের পিঁপড়ার দ্বারা এর পরাগায়ণ হয় এবং এর ফলে তা ফলে পরিণত হয়; এ পরাগায়ণ না ঘটলে বের হওয়া ডুমুর ঝরে পড়ে যায়।

পৃথিবীর গতিশীলতা

কোরআন মজীদ তার বজ্ঞানিক সত্য উপস্থাপনকারী আয়াত সমূহে অপর যে একটি সত্য তুলে ধরেছে তা হচ্ছে পৃথিবীর গতিশীলতা। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(الذی جعل لکم الارض مهداً.)

"(তিনিই আল্লাহ্) যিনি এ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়ে দিয়েছেন।" (সূরাহ্ ত্বা- হা : ৫৩)

লক্ষ্য করার বিষয়, এ আয়াতে কীভাবে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে পৃথিবীর গতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা কোরআন নাযিলের বহু শতাব্দী পরে মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। এ আয়াতে পৃথিবীকে শি র দোলনার সাথে তুলনা করা হয়েছে যার শান্ত ও সুশৃঙ্খল গতিশীলতার ফলে দুগ্ধপোষ্য শি আরাম অনুভব করে ঘুমিয়ে পড়ে।

পৃথিবীও মানুষের জন্য দোলনাস্বরূপ। কারণ, এর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী তার অধিবাসীদের আরামের জায়গা হয়েছে। ঠিক যেভাবে দোলনার গতির ফলে শি আরাম ও বি াম লাভ করে ঠিক সেভাবেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে এ পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য পরিবৃদ্ধি ও আরাম- আয়েশের জায়গায় পরিণত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোরআন মজীদে যে সব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে একই বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ভিন্ন ভিন্ন উপমা ব্যবহার করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টি শব্দের বা দু'টি উপমার মধ্যে যদি তাৎপর্যে আংশিক মিল ও আংশিক অমিল থাকে - যুক্তিবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে عموم و خصوص من بعض (অংশতঃ সাধারণ ও বিশেষ) বলা হয় - সে ক্ষেত্রে একটি শব্দের বা উপমার পরিবর্তে অন্য শব্দ বা উপমা ব্যবহারের উদ্দেশ্য হয় তাৎপর্যের 'বিশেষ' অংশটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

এ কারণেই কোরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পৃথিবীকে بساط (নে‘আমতপূর্ণ বিস্তৃত জায়গা) বানিয়ে দিয়েছেন (সূরাহ্ আন্- নূহ্ : ১৯), কোথাও বলা হয়েছে, قرار (বাসোপযোগী) বানিয়ে দিয়েছেন (সূরাহ্ আল্- মু’মিন : ৬৪), কোথাও বলা হয়েছে, فراش (বিছানা) বানিয়ে দিয়েছেন (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২২), আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে مهد (দোলনা)। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে পৃথিবীর গতিশীলতা বুঝানোই লক্ষ্য।

যেহেতু পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি না থাকলে তার এক পিঠ হতো সর্বাবস্থায় আক্ষরিক অর্থেই আগুনের মতো গরম এবং এক পিঠ হতো অনেক বেশী ঠাণ্ডা; কেবল দুই অংশের মধ্যবর্তী একটি বলয়রূপ অংশে তাপমাত্রা কম হতো এবং তাতেও ঋতুবৈচিত্র হতো না। ধু তা-ই নয়, সব সময়ই দ্রুত গতিতে গরম অংশের বায়ু উর্ধাকাশে উঠে ঠাণ্ডা অংশের দিকে ছুটে যেতো এবং ঠাণ্ডা অংশের হাওয়া ভূমি ছুঁয়ে গরম অংশের দিকে ছুটে যেতো। ফলে পৃথিবী বাসোপযোগী হতো না। কেবল আহ্নিক গতির কারণেই তা বাসোপযোগী হয়েছে এবং বার্ষিক গতির ফলে ধু ঋতুবৈচিত্রই সৃষ্টি হয় নি, বরং গোটা পৃথিবীই বাসোপযোগী হয়েছে। আর এখানে পৃথিবীর গতিশীলতা বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়ে আরামদায়ক বাসস্থান বুঝানো উদ্দেশ্য হলে فراش (বিছানা) বলাই যথেষ্ট হতো।

উপরোক্ত আয়াতে (সূরাহ্ ত্বা- হা : ৫৩) পৃথিবীর গতি সম্পর্কে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি। কারণ, এ আয়াত এমন এক যুগে নাযিল্ হয়েছে যে যুগের সমস্ত মানুষের, এমনকি জ্ঞানী- গুণী ও বিজ্ঞানীগণের পর্যন্ত ধারণা ছিলো যে, পৃথিবী স্থির ও গতিহীন। সে যুগের সকল মানুষের নিকটই পৃথিবীর স্থিরতা একটি অকাট্য বিষয়রূপে পরিগণিত ছিলো।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হিজরতের দশ শতাব্দী পরে নক্ষত্র বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এ দীর্ঘ বদ্ধমূল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং পৃথিবীর দু’টি গতি - আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি প্রমাণ

করেন ও তা ঘোষণা করেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই এ ঘোষণার জন্য তিনি অপমান, লাঞ্ছনা- গঞ্জনা ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হন। ধু তা- ই নয়, এ অপরাধে (!) তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এতো বড় বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এহেন পরিস্থিতির কারণেই - খৃস্টধর্মের যাজকদের দ্বারা ধর্মীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও অপরিহার্য রূপে পরিগণিত গতানুগতিক ধারণা- বিশ্বাস ও কুসংস্কারাদির সাথে সাংঘর্ষিক হবার কারণে - ইউরোপের জ্ঞানী, মনীষী, বিজ্ঞানী ও আবিষ্কর্তাগণ তাঁদের বজ্ঞানিক ও জনকল্যাণমূলক অন্য বহু আবিষ্কার- উদ্ভাবনকে প্রাণের ভয়ে গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পশ্চিম গোলার্ধের ভূখণ্ড

কোরআন মজীদ দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যার রহস্য উন্মোচন করেছে এবং মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে যা আবিষ্কৃত হয়েছে এরূপ একটি বিষয় হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের যে পার্শ্বে তৎকালীন বিশ্বের মানুষ অবস্থান করতো - অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে গঠিত মহাভূখণ্ড - তার অপর পার্শ্বে আরেকটি মহাভূখণ্ডের অবস্থান। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদ এরশাদ করেছে :

(رب المشرقين و رب المغربين)

"তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) দুই মাশরেক্ব্ ও দুই মাগ্বরেবের প্রভু।" (সূরাহ্ আর্- রাহমান্ : ১৭)

এ আয়াতটি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত সমস্ত মুফাসসিরে কোরআনকে মশগূল রেখেছিলো; এ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁরা স্থিরনিশ্চিত ও অভিন্ন মতে উপনীত হতে পারছিলেন না। মুফাসসিরগণের অনেকে বলেছেন, এ আয়াতে বর্ণিত 'দুই মাশরেক্ব্' (مشرقين) ও 'দুই মাগ্বরে' (مغربين) - এর তাৎপর্য হচ্ছে সূর্যের মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ (পূর্ব ও পশ্চিম বা উদয় ও অস্তের জায়গা) এবং চন্দ্রের মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ (পূর্ব ও পশ্চিম বা উদয় ও অস্তের জায়গা)। আবার অনেকে বলেছেন, দুই মাশরেক্ব্ ও দুই মাগ্বরেবের মানে হচ্ছে সূর্যের শীতকালীন উদয়াস্তের জায়গা ও গ্রীস্মকালীন উদয়াস্তের জায়গা। কিন্তু এ সব অভিমত যে ঠিক নয় তা সুস্পষ্ট। কারণ, সাধারণভাবে আমরা যখন উদয়াস্তের 'দিক'কে পূর্ব ও পশ্চিম বলি তখন পূর্ব ও

পশ্চিমের ধারণায় পূর্ব ও পশ্চিমের দিগন্তের দুই সুপ্রশস্ত অংশকে বুঝায় এবং সূর্য ও চন্দ্রের উদয়াস্ত এর মধ্যেই ঘটে থাকে। অন্যদিকে আমরা যদি উদয়াস্তের 'সুনির্দিষ্ট স্থান'কে (Spot) বুঝাতে চাই তো সে ক্ষেত্রে উদায়াস্তের স্থানের সংখ্যা অনেক, কারণ, প্রতিদিনই সূর্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদয় হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত যায়; চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা- ই। এভাবে উদয়- দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সূর্যের অন্ততঃ ১৮২টি বা ১৮৩টি উদয়স্থান আছে এবং অনুরূপভাবে অন্ততঃ সমসংখ্যক অস্তগমনস্থান আছে; চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা- ই।

সুতরাং উক্ত আয়াতের শাব্দিক তাৎপর্য থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় আয়াতটিতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতটি তৎকালে জ্ঞাত মহাভূখণ্ড ছাড়াও অপর একটি মহাভূখণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে - যা এ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত। ফলে পৃথিবীর এ পৃষ্ঠে অবস্থিত আমাদের মহাভূখণ্ডে যখন সূর্যোদয় তখন সেখানে সূর্যাস্ত এবং এখানে যখন সূর্যাস্ত তখন সেখানে সূর্যোদয়। ফলে এ পৃথিবীতে দু'টি মাশরেক্ব্ (সূর্যোদয়ের দিক) ও দু'টি মাগ্বরেব্ (সূর্যাস্তের দিক) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

কোরআন মজীদের আরো একটি আয়াতে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে :

(يا ليت بينى و بينک بعد المشرقين. فبئس القرين.)

"হায়! তোমার ও আমার মাঝে যদি দুই মাশরেক্বের ব্যবধান থাকতো! কেমন নিকৃষ্ট সঙ্গীই না তুমি!" (সূরাহ্ আয়- যুখরূফ : ৩৮)

এ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ধরণীবক্ষে দুই মাশরেক্বের মধ্যকার ব্যবধান হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যবধান। অতএব, ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াতে দুই মাশরেক্ব্ মানে চন্দ্র ও সূর্যের উদয়স্থল এবং দুই মাগ্বরেব্ মানে চন্দ্র ও সূর্যের অস্তগমনস্থল হতে পারে না, তেমনি তা গ্রীস্মকালের উদয়স্থল ও শীতকালের উদয়স্থলও হতে পারে না; দ্বিতীয়োক্ত আয়াতের লক্ষ্যের সাথে এ দু'টি তাৎপর্যের একটিও খাপ খায় না।

সুতরাং এখানে দুই মাশরেক্ব্ ও দুই মাগ্বরেব্ মানে দুই মহাভূখণ্ডের মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ বলে মেনে নিতে আমরা বাধ্য। কারণ, আমাদের এ মহাভূখণ্ডের মাশরেক্ব্ (সূর্যোদয়স্থল - পূর্ব

দিগন্তের প্রশস্ত স্থান) ও পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠস্থ মহাভূখণ্ডের মাশরেক্বের ব্যবধান এ ভূপৃষ্ঠে দীর্ঘতম ব্যবধান। আর অপর মহাভূখণ্ডের মাশরেক্ব্ মানে আমাদের মাগ্বরেব্। অতএব, এ আয়াত থেকে অপর একটি মহাভূখণ্ডের অস্তিত্বের আভাস- এর তাৎপর্য গ্রহণ করলেই সঠিক অর্থ গ্রহণ করা হবে।

অতএব, যে সব আয়াতে 'মাশরেক্ব্' ও 'মাগ্বরেব্' শব্দদ্বয় একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, সে সব আয়াতে শব্দ দু'টি এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন : لله المشرق و المغرب. (পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকই আল্লাহর।) - যেখানে সাধারণ অর্থে পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক বুঝানো হয়েছে। আর যে সব আয়াতে শব্দ দু'টি দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তা ভিন্নতর এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এ সব ক্ষেত্রে অপর এক মহাভূখণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যে সব ক্ষেত্রে শব্দ দু'টি বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তা তৃতীয় এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, বিভিন্ন দেশ, শহর ও ভূখণ্ডের অবস্থানভেদের কারণে প্রতিটি জায়গার যে মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ রয়েছে তা- ই। এই শেষোক্ত প্রসঙ্গে আমরা এর পরেই আলোচনা করছি।

এখানে বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদের অনুধাবনের সুবিধার্থে উল্লেখ করা ভালো মনে করছি যে, আরবী ভাষায় ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান ও কালের বেশ কয়েকটি শব্দ- প্যাটার্ন (وزن) আছে, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাশরিক্ব, মাগ্বরিব্, মাসজিদ্, মাজলিস্ ইত্যাদি। সে হিসেবে 'মাশরিক্ব্' ও মাগ্বরিব্' (যার পরিবর্তিত বাংলা উচ্চারণ 'মাশরেক্ব্' ও 'মাগ্বরেব্') - এর মানে হচ্ছে যথাক্রমে : 'সূর্যোদয়ের স্থান/ সময়' ও 'সূর্যাস্তের স্থান/ সময়'।

তবে আরবী ভাষায় প্রচলিত অর্থে (প্রত্যেক ভাষায়ই যেভাবে কিছু শব্দ নতুন অর্থ পরিগ্রহণ করে থাকে ও সে অর্থে প্রচলিত হয়ে থাকে) মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্- এর আরো দু'টি করে প্রচলিত অর্থ রয়েছে। তা হচ্ছে, 'মাশরেক্ব্' মানে পূর্ব দিক (সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে সূর্যোদয় সোজা পূর্ব দিকে না হলেও) ও প্রাচ্য ভূখণ্ড এবং 'মাগ্বরেব' মানে পশ্চিম দিক (সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে সূর্যাস্ত সোজা পশ্চিম দিকে না হলেও) ও পশ্চিমা ভূখণ্ড। এ কারণেই মরক্কোকে 'মাগ্বরেব্' নামকরণ করা হয় আরব

উপদ্বীপ থেকে পশ্চিমের দেশ হিসেবে। তেমনি একই কারণে, পশ্চিম গোলার্ধ আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাকেও আরবী ভাষায় 'মাগ্বরেব্' (পাশ্চাত্য) বলা হয়।

এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত আয়াত থেকে 'মাশরেক্ব্ ও 'মাগ্বরেব্'-এর মানে যথাক্রমে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' গ্রহণ করা হলে 'মাশরেক্বাইন্' ও 'মাগ্বরেবাইন্'-এর মানে দাঁড়ায় 'দুই প্রাচ্য' ও 'দুই পাশ্চাত্য'। সে ক্ষেত্রে 'দুই প্রাচ্য' মানে দাঁড়ায় প্রাচ্য মহাভূখণ্ডের প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত দুই ভূখণ্ড অর্থাৎ 'এশিয়া-ইউরোপ' ও 'আফ্রিকা' এবং 'দুই পাশ্চাত্য' মানে দাঁড়ায় পাশ্চাত্য মহাভূখণ্ডের প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত দুই ভূখণ্ড অর্থাৎ 'উত্তর আমেরিকা' ও 'দক্ষিণ আমেরিকা'। তবে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে 'মাশরেক্বাইন্' মানে 'দুই মহাভূখণ্ডের সূর্যোদয়ের দিক' এবং 'মাগ্বরেবাইন্' মানে দুই মহাভূখণ্ডের সূর্যাস্তের দিক।

পৃথিবীর গোলাকৃতি

কোরআন মজীদ প্রাকৃতিক জগতের অপর যে একটি রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করেছে তা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা তথা গোলাকৃতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها.)

"দুর্বল হয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে আমি ধরণীর মাশরেক্ব্ সমূহের ও মাগ্বরেব্ সমূহের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি।" (সূরাহ্ আল্-আ'রাাফ্ : ১৩৭)

(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ.)

"তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) আসমান সমূহ ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু, আর তিনি মাশরেক্ব্ সমূহেরও প্রভু।" (সূরাহ্ আছ্-ছ্বাফফাত্ : ৫)

(فلا اقسم برب المشارق و المغارب و انا لقادرون)

"(তারা যা বলছে) তা কক্ষনোই নয়, শপথ মাশরেক্ব্ সমূহের ও মাগ্বরেব্ সমূহের প্রভুর, আমি অবশ্যই সক্ষম।" (সূরাহ্ আল্-মা'আারেজ্ : ৪০)

উল্লিখিত আয়াত সমূহ একদিকে যেমন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ও স্থান সমূহের বহুত্বের কথা প্রকাশ করছে, তেমনি ভূপৃষ্ঠের বক্রতার প্রতিও ইঙ্গিত করছে। কারণ, কেবল ভূপৃষ্ঠের বক্র

অবস্থাতেই এটা সম্ভব যে, ভূপৃষ্ঠের কোনো এক অংশে যখন সূর্যোদয় তখন অপর এক অংশে সূর্যাস্ত এবং এভাবেই বহু মাশরেক্ব ও বহু মাগ্বরেব্ অস্তিত্ব লাভ করে এবং এতে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় সংঘটিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ বক্র না হলে বহু মাগ্বরেব্ ও বহু মাশরেক্ব- এর কোনো মানে হয় না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম ক্বুরত্বুবী এবং আরো অনেক মুফাসসির 'মাশরেক্ব্ সমূহ' ও 'মাগ্বরেব্ সমূহ'- এর অর্থ করেছেন : বছরের বিভিন্ন দিনের মধ্যকার পার্থক্য জনিত কারণে মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেবের (সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ও কালের) পার্থক্য। এভাবে তাঁরা মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেবের বহুত্ব নির্দেশ করেছেন।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা উক্ত আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতিশীল নয়, অতএব, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বছরের বিভিন্ন দিনের ক্ষেত্রে যে কোনো পর পর দুই দিনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ও সময়ের ব্যবধান এতো স্থূল নয় যে, তা সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পড়বে - যা আল্লাহ্ তা'আলার শপথের বিষয়ে পরিণত হতে পারে। অতএব, এ ক্ষেত্রে 'মাশরেক্ব্ সমূহ' ও 'মাগ্বরেব্ সমূহ'- এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর গতি ও ভূপৃষ্ঠের বক্রতাজনিত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রাঘিমাংশে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ও কাল সমূহ - পরস্পর থেকে যার ব্যবধান সব সময়ই অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অতএব, এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এ জাতীয় আয়াত সমূহে ভূপৃষ্ঠের বক্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পবিত্র আহলে বাইতের ('আঃ) ধারাবাহিকতায় আগত মা'ছূম্ ইমামগণের বিভিন্ন বক্তৃতা- ভাষণ, হাদীছ ও দো'আয় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ সব থেকে এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি :

(১) হযরত ইমাম জা'ফর ছাদেক ('আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এরশাদ করেছেন : "একবার আমার এক সফরে এক ব্যক্তি আমার সাথে সফর করে। সে সব সময়ই রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হবার পর মাগ্বরেবের নামায আদায় করতো এবং ছুবহে ছ্বাদেক্ব্ হবার বেশ পূর্বে শেষ রাতের আঁধারে ফজরের নামায আদায় করতো। কিন্তু আমি তার বিপরীতে অর্থাৎ মাগ্বরেবের

নামায সূর্যোস্তের পর পরই এবং ফজরের নামায ছুবেহ ছ্বাদেক্ব্ হবার পর আদায় করতাম। লোকটি আমাকে বললো : “আপনিও আমার ন্যায় আমল করুন, কারণ, আমাদের দ্রাঘিমারেখায় যখন সূর্যোদয় ঘটে তার বেশ আগেই অন্যদের দ্রাঘিমারেখায় সূর্যোদয় হয়ে থাকে, অন্যদিকে আমাদের দ্রাঘিমারেখায় যখন সূর্য অস্ত যায় তখনো অন্যদের দ্রাঘিমারেখায় সূর্য আকাশে বিদ্যমান।” আমি তাকে বললাম যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রশ্নে প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠীকেই স্ব স্ব দ্রাঘিমা রেখার অনুসরণ করতে হবে এবং তদনুসারেই স্ব স্ব দ্বীনী কর্তব্য পালন করতে হবে, অন্যদের দ্রাঘিমারেখা অনুসারে নয়।” (وسائل الشيعة- ١/٢٣٧- باب ١١٦.)

(২) হযরত ইমাম জা‘ফর ছাদেক (রহ্ঃ) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এরশাদ করেছেন : “তোমাকে স্বীয় দ্রাঘিমার (বা দিগন্তের) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অনুসরণ করতে হবে।”

(৩) হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (‘আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে যে দো‘আ করতেন তাতে বলতেন : “আল্লাহ্ তা‘আলা দিন ও রাত্রির প্রতিটির জন্যই সীমারেখা ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকে তিনি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, অপরটিকেও এটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন।” (صحيفة سجادية)

হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (‘আঃ) তাঁর এ চমৎকার সাহিত্যসমৃদ্ধ উক্তির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের বক্রতাকে - যার কারণে দিন রাতের মধ্যে ও রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করছে - তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়টি তৎকালীন মানুষের অনুধাবনক্ষমতার উর্ধে ছিলো বিধায় তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম আভাসের মাধ্যমে ও সমুন্নত সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় এমনভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে, প্রকৃত সত্যটিও তুলে ধরা হলো অথচ ঐ যুগের মানুষের দৃষ্টিতে বিষয়টি সামঞ্জস্যহীন বলে পরিগণিত হয় নি।

কেউ হয়তো ধারণা করতে পারে যে, এ কথার পিছনে হযরত ইমামের (‘আঃ) উদ্দেশ্য ছিলো এটা বুঝানো যে, দিন ও রাত ছোট- বড় হয়; পৃথিবীর বক্রতা বা গোলাকার অবস্থা বুঝানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, হযরত ইমাম যদি দিন- রাত্রির ছোট- বড় হওয়ার বিষয়টি বুঝাতে চাইতেন - যা সবাইই লক্ষ্য করে থাকে, তাহলে তাঁর এতদসংক্রান্ত বক্তব্যের প্রথম অংশটিই যথেষ্ট ছিলো যেখানে তিনি বলেছেন : “আল্লাহ্ তা‘আলা দিন ও রাত্রির প্রতিটির জন্যই সীমারেখা ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকে তিনি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন।” এরপর আর একথা বলার প্রয়োজন হতো না যে, “এমন অবস্থায় যে, অপরটিকেও এটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন।” কারণ, বাহ্যতঃ দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটিরই পুনরাবৃত্তি। তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, দ্বিতীয় বাক্যটি - আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী যা প্রথম বাক্যের ক্রিয়াটি কী অবস্থায় সংঘটিত হচ্ছে তা- ই বুঝাচ্ছে - উল্লেখের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, দিন যখন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক সে সময়ই রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে।

অতএব, হযরত ইমামের (‘আঃ) দো‘আর অন্তর্ভুক্ত এ বাক্যটি থেকে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা তথা গোলাকার অবস্থা প্রমাণিত হয়। কারণ, কেবল ভূপৃষ্ঠের গোলাকার অবস্থায়ই একই সময় দিন ও রাত্রির পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর। অর্থাৎ পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে যখন দিন, অপর পৃষ্ঠে তখন রাত্রি; ফলতঃ এক পৃষ্ঠে যখন দিনের আলো রাতের আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই অপর পৃষ্ঠে রাতের আঁধার দিনের আলোয় দূরীভূত হচ্ছে। হযরত ইমামের (‘আঃ) বক্তব্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যথায় তাঁর বক্তব্যের শেষোক্ত বাক্যটি বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। আর হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ্ঃ)- এর মতো ব্যক্তির বক্তব্যে বাহুল্য থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

কোরআন মজীদের অপর এক আয়াতেও পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে : تولج الليل فى النهار و توليج النهار فى الليل - “তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান ও দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান।” (সূরাহ্ আালে ‘ইমরা়ান্ : ২৭) বস্তুতঃ এখানে ليل

(রাত্রি) ও نهار (দিন) উভয়ের পূর্বে ال যোগ হওয়ায় বিভিন্ন দিন- রাত্রি না বুঝিয়ে স্বয়ং ‘দিন’ ও ‘রাত্রি’ নামক ধারণা দু’টিকে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা সর্বাবস্থায় দিনকে রাতের মধ্যে ও রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান। এর মানে হচ্ছে একটিই দিন ও একটিই রাত পরস্পরের পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পরস্পরকে গ্রাস করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এটা কেবল তখনি সম্ভব হয় যখন তা একটি গোলাকার বস্তুর ওপর দিয়ে একে অপরের পিছনে এগিয়ে যেতে থাকে। এ হচ্ছে কোরআন মজীদের অলৌকিকতার বিভিন্ন দিকের অংশবিশেষ মাত্র। গ্রন্থের আয়তন সীমিত রাখার লক্ষ্যে আমরা ধু এতোটুকু উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাই কোরআন মজীদের খোদায়ী ওয়াহী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে রচিত হয়েছে এবং কোনো অসাধারণ মানবিক প্রতিভার পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। এ গ্রন্থ্ মানবিক প্রতিভার উর্ধে।

কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ফাছ্বাহাত্ ও জ্ঞানগর্ভতার একটি দৃষ্টান্ত -

কোরআন মজীদের মু'জিযাহর একটি অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে এই যে, সমগ্র কোরআন মজীদে যে জ্ঞান ও শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে প্রতিটি সূরায়ই তার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু তা এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন সূরাহ্ পাঠের সময় পাঠক- পাঠিকার কাছে তার পুনরাবৃত্তিকে মোটেই পুনরাবৃত্তি বলে অনুভূত হয় না। আর ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কোরআনের মু'জিযাহর আরেকটি প্রধান দিক হচ্ছে তার ভাষার গতিশীলতা ও প্রাঞ্জলতা ব্যাহত না করেই বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর সমাহার ঘটানো। কোরআনের তৃতীয় আরেকটি প্রধান বশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তার ভাষা না কবিতা, না গদ্য, বরং বিভিন্ন ধরনের কবিতার ভাষায় ব্যবহার্য মাধুর্য ও বলিষ্ঠতার সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত গদ্যে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন - যার ফলে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মহানায়কগণও এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলে।

বলা বাহুল্য যে, কোরআন মজীদ কোনো প্রথাগত গ্রন্থের মতো গ্রন্থ নয় এবং এর সূরাহগুলোও কোনো প্রথাগত গ্রন্থের অধ্যায়ের মতো বা কোনো প্রবন্ধের মতো নয়। বরং কোরআন মজীদ ও তার সূরাহ্ সমূহের বক্তব্য ও ভাষা অনেকটা ভাষণের বক্তব্য ও ভাষার ন্যায়, কিন্তু তার সাহিত্যকুশলতা এমনই যার ফলে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মহানায়কগণ এর মোকাবিলায় দিশাহারা ও হতভম্ব হয়ে পড়তে বাধ্য।

এখানে আমরা কোরআন মজীদের একটি সূরাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তার প্রকাশকুশলতার প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টি দেবো - যা থেকে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণ মিলবে।

আমরা এখানে কোরআন মজীদের সূরাহ্ আল্- মুল্ক্ উদ্ধৃত করছি :

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَلَقَدْ زَيَّنَّا

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ
(٩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١)
إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣)
أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ (١٥) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (١٨) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ
فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١٩) أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ
مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ (٢٠) أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
(٢١) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ (٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٦) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ
وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (٢٧) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ
الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٨) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٢٩) قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ)

“পরম দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে। পরম বরকতময় তিনি যার হাতে রয়েছে (আসমান-যমীনের) সকল রাজত্ব; আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপরই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী - যিনি তোমাদের মধ্যে কর্মের বিচারে কে অধিকতর উত্তম হবে তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল। তিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে সপ্ত উর্ধলোক সৃষ্টি করেছেন; তুমি পরম দয়াবানের সৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য (খুঁত) দেখতে পাবে না। আরেক বার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো, কোনো ফাঁক (অসম্পূর্ণতা) দেখতে পাও কি? কিছুক্ষণ পরে তুমি দ্বিতীয় বারের জন্য (সেদিকে) দৃষ্টি ফেরাও; তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত াান্ত হয়ে ফিরে আসবে। আর আমি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা অলঙ্কৃত করে রেখেছি এবং আমি তাকে শয়ত্বানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রস্বরূপ করেছি, আর প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তি,

আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি। আর তা কতোই না নিকৃষ্ট স্থান! আর যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন নতে পাবে। তখন তা (জাহান্নাম) আক্রোশে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। কোনো গোষ্ঠীকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে : "তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেন নি?" তারা বলবে : হ্যা, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ্ কোনো কিছুই নাযিল করেন নি।" (দোযখের প্রহরীরা বলবে :) "তোমরা তো বড় ধরনের গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলে।" তখন তারা (পরিতাপের সাথে) বলবে : "আমরা যদি (মনোযোগের সাথে) বণ করতাম এবং বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাতাম তাহলে আমরা দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম না!" অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। দূর হোক দোযখবাসীরা। (অন্যদিকে) যারা তাদের রব- কে না দেখেও ভয় করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট ভ প্রতিদান। আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর বা প্রকাশ কর (তাঁর কাছে তা সমান, কারণ,) অবশ্যই তিনি অন্তরস্থ বিষয়াদি সম্বন্ধে সদাজ্ঞাত। সাবধান! যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? বরং তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ। তিনিই হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সুগতিসম্পন্ন করে বানিয়েছেন, সুতরাং তোমরা তার স্কন্ধে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক্ ভক্ষণ কর; আর তাঁর কাছেই তোমাদের পুনরুত্থান। উর্ধলোকে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দেবেন এবং তা প্রকম্পিত হতে থাকবে - এ ব্যাপারে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হয়ে গিয়েছো? অথবা, যিনি উর্ধলোকে আছেন তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা অচিরেই জানতে পারবে আমার সতর্কীকরণ কেমন ছিলো - এ ব্যাপারে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হয়ে গিয়েছো? বস্তুতঃ তাদের পূর্ববর্তীরা (আমার সতর্কবাণীকে) প্রত্যাখ্যান করেছিলো; অতঃপর কেমন ছিলো আমার অস্বীকৃতি! তারা কি তাদের (মাথার) ওপরে উড়ন্ত পাখীদেরকে দেখে নি - যারা পাখা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? বস্তুতঃ পরম দয়াবান ব্যতীত কেউই তাদেরকে স্থির রাখে না; নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তোমাদের সাহায্য করবে পরম

দয়াবান ব্যতীত তোমাদের জন্য এমন কোন্ বাহিনী আছে? কাফেররা তো কেবল আত্মপ্রতারণার কবলে নিপতিত ব নয়। তিনি যদি রিযক্ বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কে আছে যে তোমাদেরকে রিযক্ প্রদান করবেন? বরং তারা জিদের বশে অবাধ্যতায় ও বিমুখতায় নিমজ্জিত রয়েছে। যে ব্যক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে সে- ই কি অধিকতর সঠিক পথ প্রাপ্ত, নাকি যে ব্যক্তি মেরুদণ্ড সোজা করে সরল- সুদৃঢ় পথে চলে? (হে রাসূল!) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য বণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। (হে রাসূল!) বলুন, "তিনিই তোমাদেরকে ধরণীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমরা সমবেত হবে।" আর তারা বলে : "কখন এ প্রতিশ্রুতি (বাস্তবায়িত হবে) যদি তোমরা (এ প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো?" (হে রাসূল!) বলুন, "অবশ্যই তার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই কাছে, আর আমি তো কেবল সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী ব নই।" অতঃপর তারা যখন তা (সেই প্রতিশ্রুতি) আসন্ন দেখতে পাবে তখন কাফেরদের চেহারাগুলো কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে এবং (তাদেরকে) বলা হবে : "এই হলো তা- ই যা তোমরা চাচ্ছিলে।" (হে রাসূল!) বলুন, "তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো যে, আল্লাহ্ যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীসাথীদেরকে ধ্বংস করে দেন বা অনুগ্রহ করেন, তো কে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?" (হে রাসূল!) বলুন, "তিনি পরম দয়াবান; আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর ওপরই ভরসা করেছি; তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তিনি যদি তোমাদের পানিকে (ভূগর্ভে) ষিয়ে দেন, তো কে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানির ব্যবস্থা করবে?"

এ সূরাহটির বাচনভঙ্গিতে একই সাথে যে মাধুর্য ও ওজস্বিতার সমাহার ঘটেছে এবং এর ভাষায় যে ধরনের বিমোহিতকর ঝর্ণাধারার গতি ও ঝঙ্কার রয়েছে তা এর মূল (আরবী) পাঠের যে কোনো পাঠক- পাঠিকার কাছেই সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, মাত্র ৩০টি আয়াত বিশিষ্ট স্বল্পায়তনের এ সূরাহটিতে অনেকগুলো পয়েন্ট স্থান পেয়েছে এবং বক্তব্যে এক পয়েন্ট থেকে

আরেক পয়েন্টে গমনের বিষয়টি তাসবীহ্- মালার একটি দানা থেকে আরেকটি দানায় স্থানান্তরের ন্যায় এমনভাবে ঘটেছে যে, বক্তব্যের গতিশীলতায় কোথাওই কোনো ধরনের ছেদ অনুভূত হয় না।

এ সূরায় যে সব পয়েন্ট স্থান পেয়েছে আমরা তার একটা ফিরিস্তি তরী করার চেষ্টা করি :

০ এতে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে : তিনি দয়াময়, মেহেরবান, পরম বরকতময়, আসমান- যমীনের সকল রাজত্বের অধিপতি, সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান, মৃত্যু ও জীবনের স্রষ্টা, মহাপরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল, অদৃশ্য, অন্তরস্থ বিষয়ে অবগত, সকল কিছুর স্রষ্টা, সৃষ্টির সব কিছু সম্পর্কে অবগত, সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ, প্রতিটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং বান্দাহকে সাহায্যকারী।

এছাড়া এতে অপর যে পয়েন্টগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে :

০ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (কর্মের পরীক্ষা)

০ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্ত উর্ধলোক সৃষ্টি

০ আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য নেই (সবই নিখুঁত)।

০ আল্লাহর সৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতা নেই।

০ পৃথিবীর আকাশ প্রদীপমালা (নক্ষত্রমালা) দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

০ শয়ত্বানের উর্ধলোকে অনুপ্রবেশ প্রতিহত করার ব্যবস্থা আছে।

০ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা (উল্কা) সৃষ্টি

০ কাফেরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির ব্যবস্থা

০ জাহান্নাম নিকৃষ্ট স্থান

০ জাহান্নামের গর্জন

০ জাহান্নামে প্রহরী আছে।

০ আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছেন।

০ কাফেররা নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

o কাফেররা সতর্ককারী আগমন ও তাদের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যানের কথা স্বীকার করবে।

o কাফেররা স্বীকার করবে যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী নাযিলের সম্ভাবনার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছিলো।

o কাফেররা গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।

o কাফেররা নবীর দাও'আত্ মনোযোগ দিয়ে শোনে নি এবং 'আক্ল্ দ্বারা বিবেচনা করে নি।

o কাফেররা নবীর দাও'আত্ অন্ধভাবে প্রত্যাখ্যানের জন্য আফসোস্ করবে।

o (মানুষের উচিত যে কোনো কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও 'আক্ল্ দ্বারা বিবেচনা করা।)

o দোযখবাসীদের প্রতি আল্লাহর ধিক্কার

o ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও ভ প্রতিদান

o পৃথিবী সুগতিসম্পন্ন ও বিচরণের উপযোগী

o আল্লাহ্ সকলের জন্য রিয়্ক্বের ব্যবস্থা রেখেছেন।

o সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

o পুনরুত্থান সংঘটিত হবে।

o আল্লাহর আযাব : ভূগর্ভে প্রোথিত করণ

o আল্লাহর আযাব : প্রস্তরবৃষ্টি

o পানি ছাড়া প্রাণী বাঁচে না (ইঙ্গিত)।

o আল্লাহ্ পানি মাটিতে ষিয়ে দিয়ে আযাব দিতে পারেন।

o পূর্ববর্তীরা আল্লাহকে অস্বীকার করেছিলো।

o আল্লাহ্ পাখীদেরকে আকাশে উড্ডয়নকারী বানিয়েছেন।

o কাফেররা আত্মপ্রতারিত।

o কাফেররা জিদের বশে অবাধ্য ও বিমুখ হয়ে আছে।

o আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত সরল- সুদৃঢ় পথই সঠিক পথ।

o মানুষকে বণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ দেয়া হয়েছে।

০ মানুষ খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

০ মানুষ ধরণীর বুকে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে আছে।

০ কাফেররা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে (ক্বিয়ামত্ সম্পর্কে) উড়িয়ে দেয়।

০ ক্বিয়ামত্ কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই আছে।

০ রাসূল (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সতর্ককারী মাত্র (জবরদস্তিকারী নন)।

০ ক্বিয়ামতের দিনে কাফেরদের চেহারা কালিমালিপ্ত হবে।

০ কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

০ নবী ও ঈমানদারগণ পরম দয়াবান আল্লাহর ওপর ভরসা করেন।

এখানে উক্ত সূরাহর বক্তব্যকে কেবল এতে সন্নিবেশিত তথ্যাদির দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়েছে। এ সূরাহর বক্তব্যের বালাগ্বাত্- ফাছ্বাহাতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ সূরাহটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কোরআনের অলৌকিকতা সম্পর্কে আপত্তি

অন্ধ আপত্তি : বিভ্রান্তি সৃষ্টিই উদ্দেশ্য

কোরআন মজীদ আল্লাহর কালাম্ হিসাবে সমগ্র মানব জাতির প্রতি এই বলে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে যে, সম্ভব হলে তারা যেন কোরআনের সূরাহ্ সমূহের যে কোনো একটি সূরাহর সমতুল্য একটি সূরাহ্ রচনা করে নিয়ে আসে। কিন্তু কোনো মানুষই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম হয় নি। বরং কোরআন মজীদ কর্তৃক প্রদত্ত চ্যালেঞ্জের সামনে প্রত্যেকেই অক্ষমতার শির নত করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু কোরআন মজীদের অন্ধ দুশমনদের জন্য কোরআনের মোকাবিলায় এ পরাজয় ছিলো অসহনীয়। তাই তারা অন্ধ বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কোরআন মজীদ সম্পর্কে নানা রকম মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আপত্তি তুলে মানুষের কাছে এ মহাগ্রন্থের মর্যাদাকে খাটো করার এবং কোরআন মজীদের সাথে ভালোভাবে পরিচিত নয় এমন লোকদেরকে কোরআনের প্রতি বিমুখ করার ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে।

অত্র অধ্যায়ে আমরা কোরআন মজীদের অন্ধবিরোধী পরাজিত দুশমনদের উত্থাপিত এ সব আপত্তি তুলে ধরবো এবং তার জবাব দেবো। এ থেকে একদিকে যেমন এ সব লোকের জ্ঞানের দৌড় ও চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, তেমনি এ- ও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ লোকেরা প্রবৃত্তির দাসবৃত্তির কারণে কীরূপ অন্ধভাবে আবোল- তাবোল বকছে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার লক্ষ্যে ঘৃণ্য তৎপরতার আ য় নিয়েছে।

এক : কোরআনে সাহিত্যিক ত্রুটি

তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানেন, একদল খৃস্টান ধর্মযাজক ও পাশ্চাত্য জগতের একদল ইসলাম- বিশেষজ্ঞ খৃস্টান পণ্ডিত (প্রাচ্যবিদ)- এর পক্ষ থেকে কোরআন মজীদ সম্পর্কে কতক ভিত্তিহীন আপত্তি তুলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলে আসছে। বর্তমানে এমন অনেক লোকও এ কাফেলায় যোগ দিয়েছে যারা কোরআন মজীদের জ্ঞান ও সাহিত্যিক মান

সম্পর্কে আদৌ বিশেষজ্ঞ নয়। এদের সংখ্যা অনেক। তবে সামান্য চিন্তা করলেই, কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখে এমন যে কোনো লোকের কাছেই এদের আপত্তির অসারতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, আপত্তিকারীরা জেনে বুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং অজ্ঞ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এহেন নোংরা অপকৌশলের আ য় নিয়েছে।

এরা বলে : কোরআনে এমন অনেক বাক্য রয়েছে যা আরবী ভাষার ব্যাকরণিক নিয়ম- বিধি এবং বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্- এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অতএব, এহেন গ্রন্থ মু'জিযাহ্ হতে পারে না।

জবাব : **দুই দিক থেকে তাদের এ আপত্তি অসার ও ভিত্তিহীন** :

প্রথমতঃ আরবী ভাষার ইতিহাসে আরবরা যখন বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয় তখন এবং বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের ে ষ্ঠতম নায়কগণের উপস্থিতিতে কোরআন মজীদ নাযিল্ হয়। আর কোরআন মজীদ তাদেরকেই এই বলে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে যে, তাদের যদি শক্তি থাকে তাহলে তারা কোরআন মজীদের সূরাহ্ সমূহের মধ্য থেকে যে কোনো একটি সূরাহর সাথে তুলনীয় একটি সূরাহ্ নিয়ে আসুক। আর চ্যালেঞ্জ প্রদানের সাথে সাথেই এ- ও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা মানবীয় শক্তি- ক্ষমতা ও প্রতিভার উর্ধে, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয় এবং এ কাজে পরস্পরকে সাহায্য- সহযোগিতা প্রদান করে, তবুও।

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের কোনো সূরাহর সমতুল্য সূরাহ্ রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কখনোই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(فان لم تفعلوا و لن تفعلوا)

"এবং তোমরা যদি তা না পারো - আর (আল্লাহ্ জানেন যে,) তোমরা কখনোই তা পারবে না, ।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ২৪)

অতএব, কোরআন মজীদে যদি আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-নীতির সামান্যতম ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হতো, তাহলে আরবী ভাষা, তার ব্যাকরণগত নিয়ম-নীতি, শল্পিক কারুকার্য, বাকমাধুর্য, প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিকতর ওয়াকেফহাল এ ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের শিরোমণিদের পক্ষ হতেই কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হতো। তাদের পক্ষ থেকে খুব সহজেই এ যুক্তি উপস্থাপন করা হতো যে, "ব্যাকরণ ও বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাতের বিচারে পর্যন্ত এ গ্রন্থে অমুক অমুক ত্রুটি আছে; এমতাবস্থায় কী করে তা খোদায়ী কালাম্ হতে পারে?" আর ধু এ যুক্তির জোরেই তাদের পক্ষে কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিলো। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষই তর্কযুদ্ধ ও তলোয়ারের যুদ্ধ - উভয় ধরনের যুদ্ধের হাত থেকেই রেহাই পেয়ে যেতো।

আর প্রকৃতই যদি এরূপ ঘটনা ঘটতো অর্থাৎ ঐ যুগে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাতের শিরোমণিদের - যারা সর্ব যুগেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাতের ে ষ্ঠতম নায়করূপে স্বীকৃত - তাদের পক্ষ থেকে যদি কোরআন মজীদে ব্যাকরণগত ও বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাত্ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা নির্দেশ করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যেতো। অন্ততঃ অমুসলিম ইতিহাসবিদগণ, বিশেষ করে ইসলামের বিরোধী ইতিহাসকারগণ তা উল্লেখের সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করতেন না। কিন্তু ইসলামের বন্ধু-দুশমন নির্বিশেষে কোনো ইতিহাসকারের ইতিহাসেই এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন মজীদ যখন নাযিল্ হয় তখন বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থাবদ্ধ আরবী ব্যাকরণের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। বরং আরবী ভাষার বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাতের নায়কদের কথা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে এবং তাদের বক্তব্যের বাক্যগঠন ও শব্দসংযোজন প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-গবেষণা করে পরবর্তীকালে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-বিধি সমূহ উদঘাটন ও সংকলিত করা হয়; কেবল তার পরেই আরবী ব্যাকরণ এক বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, কোরআন মজীদ খোদায়ী ওয়াহী নয় - কোরআন-বিরোধীরা যেরূপ দাবী করছে - তথাপি এটা সবাই মেনে নিতে বাধ্য যে, এ মহাগ্রন্থ বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাতের মহানায়কদের বক্তব্য থেকে কোনো অংশে পশ্চাদপদ নয়, বরং অধিকতর উন্নত মানের। কারণ, কোরআন মজীদ আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের পূর্ণতাবিধানে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, যে কারণে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম-বিধি সমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে কোরআন মজীদ।

অতএব, কোরআন মজীদ নাযিলের পরে প্রণীত আরবী ব্যাকরণের কোনো একটি নিয়ম যদি কোরআন মজীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে তা ঐ নিয়মেরই ত্রুটি ও দুর্বলতার পরিচায়ক; কোরআনের নয়। তেমনি কোরআন মজীদের কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ যদি আরবী ব্যাকরণের কোনো কাঠামোতেই ফেলা সম্ভব না হয় তাহলে তা-ও বিধিবদ্ধ ব্যাকরণের ও সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণেতার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক; কোরআন নাযিলকালীন আরবদের ভাষার মানদণ্ডে তা নিয়মবহির্ভূত ছিলো না।

তাছাড়া কোরআন মজীদের কোনো বাক্যকে কেবল তখনই আরবী ব্যাকরণের নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যহীন বলা যেতে পারে যদি ঐ বাক্যটির পঠনপ্রক্রিয়া (قرأت) সর্বসম্মত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বাক্যটির পঠনপ্রক্রিয়ায় যদি মতপার্থক্য থাকে এবং একটি বিশেষ পাঠ আরবী ব্যাকরণের নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে তা ঐ বিশেষ পাঠটির অগ্রহণযোগ্যতাই প্রমাণ করে, কোরআন মজীদের দুর্বলতা প্রমাণ করে না এবং তা তার মর্যাদাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করে না। কারণ, কোরআন মজীদের এই বিখ্যাত পঠনপ্রক্রিয়াগুলো এক ধরনের ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ণীত হয়েছে; সংশ্লিষ্ট ক্বারীগণ নিজস্ব চিন্তা-গবেষণা থেকে এ জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) থেকে মুতাওয়াতির্ পর্যায়ে ও অকাট্যভাবে এ সব পঠনপ্রক্রিয়া বর্ণিত হয় নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কোরআন মজীদের সাতটি বিখ্যাত এবং অপেক্ষাকৃত কম খ্যাত আরো তিনটি পঠনপ্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে। এই পঠনপ্রক্রিয়ার বিভিন্নতা মানে কোরআন (قرأت) মজীদের পাঠ [Text - متن] - এর বিভিন্নতা নয়। এ পার্থক্য হচ্ছে কতক ক্ষেত্রে যতি বা বিরতির পার্থক্য এবং কদাচিৎ ই'রাব্ -(বাক্যমধ্যস্থ ভূমিকার ভিত্তিতে শব্দের শেষবর্ণের স্বরচিহ্ন - اعراب) এর পার্থক্য।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগে আরবী লেখায় নোকতাহ্, স্বরচিহ্ন ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও লেখাপড়া- জানা আরবরা নির্ভুলভাবেই আরবী লেখা পড়তে পারতেন। পরবর্তীকালে প্রধানতঃ অনারবদের কোরআন পাঠের সুবিধার্থে এগুলো উদ্ভাবন ও যোগ করা হয়। (এখনো আরব জাহানের আরবী বই- পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।) এছাড়া কোরআন মজীদের লিপিতে কেবল শ্রুতিমাধুর্য তথা পাঠসৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে ধ্বনির মাত্রা, গ্রাম ও টান ইত্যাদি নির্দেশের লক্ষ্যে কতক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যার সাথে অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যা অন্য কোনো আরবী বই- পুস্তকে ব্যবহৃত হয় না।

কোরআন মজীদের পঠনপ্রক্রিয়ার বিভিন্নতার বিষয়টি প্রধানতঃ এরূপ যে, ক্ষেত্রবিশেষে কেউ হয়তো কোথাও বিরতি সহকারে পড়েছেন, কেউ হয়তো পরবর্তী ও পূর্ববর্তী বাক্যদ্বয় বা বাক্যাংশদ্বয়কে অথবা বাক্য ও বাক্যাংশকে বিরতিহীনভাবে একত্রে পড়েছেন। এ ধরনের পঠনপ্রক্রিয়ার পার্থক্যের ফলে কোরআন মজীদের কোনো আয়াত বা তার অংশের তাৎপর্যে সাধারণতঃ কোনোই পার্থক্য ঘটে না। আর যদি কোথাও সামান্য পার্থক্য ঘটে সে ক্ষেত্রে যেখানে যে পঠনপ্রক্রিয়া অধিকতর ব্যাকরণসম্মত তা- ই গ্রহণ করতে হবে।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম্ এ সাত বা দশ ধরনের পঠ (ছ্বাঃ)নপ্রক্রিয়ায় কোরআন পাঠের অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ পঠনপ্রক্রিয়াগুলো হযরত রাসূলে আকরাম্ থেকে মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত নয় বিধায় তা অকাট্য নয়। অর্থাৎ কোরআন (ছ্বাঃ)

মজীদের পাঠ [Text - متن] হযরত নবী করীম থেকে যেভাবে মানবজাতির ইতিহাসে (ছ্বাঃ) সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যতিক্রমী মুতাওয়াতির্ ভাবে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত সাত বা দশ পঠনপ্রক্রিয়া সেরূপ মুতাওয়াতির্ ভাবে বর্ণিত হয় নি। অতএব (قرأت), উক্ত দশ পঠনপ্রক্রিয়ার বাইরে কোরআন মজীদের আরো যে সব ব্যতিক্রমী পঠনপ্রক্রিয়া রয়েছে সে সব কেউ অনুসরণ করলেও দোষের কিছু নেই। বরং কোরআনর ক্ষেত্রে কোনো বিশেষজ্ঞদের জন্য সমগ্র কোরআন মজীদে - বিশেষ পঠনপ্রক্রিয়ার অন্ধ অনুসরণের পরিবর্তে যেখানে যে পঠনপ্রক্রিয়া অধিকতর ব্যাকরণসম্মত ও তাৎপর্য গ্রহণের জন্য অধিকতর সহায়ক সে ক্ষেত্রে সে পঠনপ্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত।

দুই : কোরআনের অলৌকিকতার অনুধাবন সর্বজনীন নয়

কোরআন মজীদের অলৌকিকতা সম্পর্কে আপত্তিকারীরা আরো বলে : নীতিগতভাবেই বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের অধিকারী কালাম্ মু'জিযাহ্ হতে পারে না, যদিও অন্যরা অনুরূপ কালাম্ রচনায় অক্ষম হয়। কারণ, কোনো কালামের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ বিচারের ক্ষমতা সকলের থাকে না। বরং মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই তা বিচার করতে পারেন। অথচ মু'জিযাহ্ সকলের বোধগম্য হওয়া অপরিহার্য - যাতে সবাই মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করে মু'জিযাহ্ প্রদর্শনকারীর নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।

জবাব : এ আপত্তিটিও পূর্ববর্তী আপত্তিটির ন্যায় দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন। কারণ, মু'জিযাহর জন্য এটা কোনো শর্ত নয় যে, তা সমস্ত মানুষের বোধগম্য হতে হবে। মু'জিযাহর সাথে এ ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়া হলে কোনো মু'জিযাহকেই মু'জিযাহ্ রূপে গণ্য করা সম্ভব হবে না। কারণ, যে কোনো মু'জিযাহর প্রতি লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাবো যে, কোনো না কোনো দিক থেকে তা সমস্ত মানুষের জন্য অনুধাবনযোগ্য নয়। বরং মু'জিযাহ্ হচ্ছে এমন কাজ

যা কিছু লোক প্রত্যক্ষ করে ও তার মু‘জিযাহ্ হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করে এবং পরম্পরা সূত্রে ও মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের বর্ণনার মাধ্যমে অন্য লোকদের জন্য তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উদাহরণ স্বরূপ, কেবল জাদুকরদের পক্ষেই প্রত্যয়ের সাথে বোঝা সম্ভব ছিলো যে, হযরত মূসা (‘আঃ) যা দেখিয়েছেন তা জাদু নয় - জাদুবিদ্যার মাধ্যমে তা দেখানো সম্ভব নয়। আর তাদের অক্ষমতা ও পরাজয়ই সাধারণ মানুষের জন্য হুজ্জাত্ ছিলো। অন্যথায় সাধারণ মানুষ তাঁকে বড় ধরনের একজন জাদুকর মনে করতে পারতো। অনুরূপভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান যে জন্মান্ধকে দৃষ্টি দিতে পারে না (অন্ততঃ ঐ সময়কার চিকিৎসাবিজ্ঞান পারতো না) তা কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পক্ষেই বোঝা ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)কে নবীরূপে চেনা সম্ভব ছিলো। অন্যথায় সাধারণ মানুষ তাঁকে অত্যন্ত উঁচু দরের একজন ডাক্তার মনে করতে পারতো। তেমনি কোরআন মজীদের একটি ছোট সূরাহর অনুরূপ একটি সূরাহ্ রচনা করতেও আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের নায়কদের সম্মিলিত ব্যর্থতা ও অক্ষমতার স্বীকৃতি সাধারণ মানুষের সামনে প্রমাণ করে যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন নামে যা পেশ করেছেন তা রচনা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব, তা তাঁর নিজের রচিত নয়, বরং তা আল্লাহ্ তা‘আলার কালাম্।

কিন্তু ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত নবী- রাসূলের (‘আঃ) আনীত মু‘জিযাহর মধ্যে কোরআন মজীদ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কারণ, কালের প্রবাহে মুতাওয়াতির্ বর্ণনার তাওয়াতোর্ হারিয়ে যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট মু‘জিযাহর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু কোরআন মজীদ হচ্ছে চিরস্থায়ী ও সর্বকালীন মু‘জিযাহ্। যতোদিন আরব-অনারব নির্বিশেষে আরবী ভাষার সাথে পরিচিত লোকেরা বিদ্যমান থাকবে কোরআন মজীদের মু‘জিযাহর বশিষ্ট্যও ততোদিন বিদ্যমান থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাধিক শক্তিশালী মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত গ্রন্থ যার একটি শব্দের ব্যাপারেও এ গ্রন্থ নাযিলের সময় থেকে রু করে এ পর্যন্ত কোনোরূপ বিবেচনাযোগ্য মতপার্থক্য হয় নি এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় হচ্ছে এই যে, সর্ব যুগে সর্বস্থানে কোরআন মজীদের একটিই সংস্করণ বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানে তাওরাত্ ও ইনজীল্ নামে 'বাইবেল'- এ যা অন্তর্ভুক্ত আছে তা এ পর্যায়ের নয়।

একদিকে যেমন বর্তমান বাইবেলের বহু সংস্করণ বিদ্যমান, তেমনি তা অধ্যয়ন থেকে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, এতে আল্লাহর কালামের কিছু অংশের সাথে, যেটিকে যে নবীর ('আঃ) ওপর অবতীর্ণ কিতাব্ বলে দাবী করা হয় তাতে - সে নবীর ('আঃ) জীবনেতিহাস, নবী- রাসূলগণের ('আঃ) উক্তি এবং সংকলকদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সংমি ত রয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলভুক্ত পুস্তকসমূহ সংশ্লিষ্ট নবীদের ('আঃ) যুগে সংকলিত হয় নি এবং যখন সংকলিত হয়েছে তখন তা মুতাওয়াতির্ সূত্রভিত্তিক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে সংকলিত হয় নি এবং সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীদের সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় নি; পরবর্তী পর্যায়েও বহু যুগ পর্যন্ত তা মুতাওয়াতির্ সূত্রে বিস্তার লাভ করে নি ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষিত হয় নি। আর এ সব পুস্তকের বিকৃতি এবং বিভিন্ন সংস্করণ হওয়ার জন্য এটাই দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের ('আঃ) প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহ সম্পর্কে কেবল কোরআন মজীদের সাক্ষ্য থেকেই প্রত্যয় উৎপাদিত হওয়া সম্ভব, তবে কেবল মুসলমানরাই এ ধরনের প্রত্যয়ের অধিকারী। অন্যথায়, কোরআন মজীদের খোদায়ী কালাম্ হওয়ার বিষয়ে যারা ঈমান পোষণ করে না তাদের জন্য পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের ('আঃ) প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহ প্রত্যয় উৎপাদনকারী হতে পারে না। কারণ, ঐ সব মু'জিযাহর বর্ণনা প্রামাণ্য মুতাওয়াতির্ পর্যায়ের নয়। অর্থাৎ প্রতিটি যুগের সমস্ত বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা এবং বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইমূলক পরিচিতি সংরক্ষিত হয় নি যেভাবে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) থেকে মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত হাদীছ সমূহের সকল যুগের বর্ণনাকারীদের নাম, পরিচয়, জীবনেতিহাস ইত্যাদি সবই সংরক্ষিত হয়েছে।

তাই দেখা যায়, মুসলমানরা কোরআন মজীদে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের ('আঃ) নবুওয়াত ও তাঁদের মু'জিযাহ্ সমূহের ব্যাপারে ততোখানি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে ঠিক যতোখানি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত ও মু'জিযাহ্ সমূহের ওপর।

আর কোরআন মজীদের তাওয়াতোর্ তো মুতাওয়াতির্ হাদীছে সমূহের তাওয়াতোরের তুলনায়ও বহু গুণে বেশী।

বস্তুতঃ কেউ যদি কোরআন মজীদের আল্লাহর কালাম্ ও হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর নবী হওয়ার বিষয়ে ঈমানের অধিকারী না- ও হয় তথাপি কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ওয়াকেফহাল লোকের পক্ষেই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সম্ভব নয় যে, বর্তমানে প্রচলিত কোরআন নামক গ্রন্থখানিকে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) আল্লাহর কিতাব্ বলে দাবী করে রেখে গেছেন এবং তিনি যেভাবে রেখে গেছেন সামান্যতম পরিবর্তন ছাড়াই তা হুবহু বর্তমান আছে।

অন্যদিকে তাওরাত্ ও ইনজীলের অনুসারী হবার দাবীদার লোকদেরও অনেকেই, এমনকি তাদের মধ্যকার অনেক পণ্ডিত- গবেষক পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) মু‘জিযাহ্ সমূহের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন এবং তাঁরা এ সব মু‘জিযাহর পার্থিব ও বস্তুগত কারণ ভিত্তিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছেন। যেমন : হযরত মূসা (‘আঃ)- এর লাঠি মানে তাঁর রাজনৈতিক শক্তি - বানী ইসরাঈলকে সজ্ঘবদ্ধ করার মাধ্যমে তিনি যার অধিকারী হয়েছিলেন, আর হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর দ্বারা মৃতকে জীবন্ত করা মানে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত বানী ইসরাঈলকে আধ্যাত্মিক জীবন দান এবং জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান মানে অজ্ঞদেরকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসা ইত্যাদি।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে এভাবে রূপক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই দেখা যায়, ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয় ধর্মাবলম্বীরা হযরত মূসা (‘আঃ)কে নবী হিসেবে স্বীকার করা সত্ত্বেও অনেক ইয়াহূদী- খৃস্টান পণ্ডিত মানতে পারছেন না যে, তাঁর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়ে তাঁদেরকে মিসরের মূল ভূখণ্ড থেকে সীনাই উপদ্বীপে পৌঁছার সুযোগ তরী করে দিয়েছিলো। তাঁরা গলদঘর্ম হয়ে চিন্তা- গবেষণা করেও ভেবে পাচ্ছেন না যে, তিনি কীভাবে সীনাই- এ পৌঁছলেন।

এ ব্যাপারে তাঁদের মতামতসমূহের মধ্যে আছে : তিনি লোহিত সাগর নয়, ভাটার সময় নীল নদ পার হয়েছিলেন; মিসরের মূল ভূখণ্ড ও সীনাই- এর মধ্যকার সীমান্তের কোনো নিরাপদ জায়গা

দিয়ে পার হয়েছিলেন, সীমান্তে হয়তো কোনো ছোটখাট হ্রদ ছিলো, তাঁরা তা-ই পার হয়েছিলেন; ভূমধ্য সাগরের উপ লবর্তী কোনো ছোট উপসাগর পার হয়েছিলেন; প্রবল বায়ুপ্রবাহের ফলে সুয়েয উপসাগরের পানি সরে যাওয়ায় তাঁরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁরা যখন দেখতে পান যে, লক্ষ লক্ষ লোক সাথে নিয়ে ফির্‘আউন ও তার সন্যসামন্তদের নাগাল অতিক্রম করে এর কোনো পন্থায়ই তাঁদের পক্ষে মিসরের মূল ভূখণ্ড থেকে সীনাই উপদ্বীপে পৌঁছা সম্ভব নয় তখন তাঁরা বিষয়টি অমীমাংসীত রেখে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

তাঁদের এ সব সন্দেহসংশয়কে দোষারোপ করা যায় না। কারণ-, এ সব পণ্ডিত ব্যক্তি অকাট্যভাবে জানেন যে, বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীল্ হিসেবে দাবীদার পুস্তকসমূহ সহ বাইবেলভুক্ত পুস্তকগুলো এবং হযরত মুহাম্মাদ) রাসূলগণের -র্ববর্তী নবীএর পূ -(ছ্বাঃ)‘আঃ (নবুওয়াত ও মু‘জিযাহর বিষয়টি, এমনকি তাঁদের অনেকের ঐতিহাসিকতার বিষয়টিও তাঁদের নিকট অকাট্য প্রত্যয় উৎপাদনকারী মু (খৃস্টান পণ্ডিতদের -ইয়াহূদী)তাওয়াতির্ সূত্রে পৌঁছে নি। ধু তাই নয়-, তাঁরা এ ব্যাপারেও অকাট্য প্রত্যয়ের অধিকারী যে, যে সব নবী রাসূলের -)‘আঃ ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁরা (‘মোটামুটি’ নিশ্চিত তাঁদের উপস্থাপিত ঐশী গ্রন্থগুলোও দারুণভাবে বিকৃত হয়েছে। তাঁরা এও জানেন যে-, বরং প্রকৃত সত্য হলো, ঐ সব গ্রন্থ আদৌ বিদ্যমান নেই। কারণ, গ্রন্থগুলোর পাঠ (Text) থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এগুলো তাঁদের পরে অন্য লোকদের দ্বারা লিখিত।

কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে কোরআন মজীদ সর্বোচ্চ মুতাওয়াতির্ গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ না হওয়া, বক্রচিন্তা, খুঁতখুঁতে স্বভাব বা সন্দিগ্ধমনা হবার কারণে কারো মনে হয়তো কোরআন মজীদের মুতাওয়াতির্ হওয়া ও অবিকৃত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে চৌদ্দশ’ বছর আগে নাযিল্ হওয়ার কারণে কোরআন মজীদের সর্বোচ্চ তাওয়াতোরের বিষয়টি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে যথেষ্ট অধ্যয়নের পরি ম স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যথাযথ যোগ্যতা ও প্রস্তুতির অভাবে অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। এমনকি যাদের যথাযথ

যোগ্যতা ও প্রস্তুতি আছে তাঁদেরও অনেকের পক্ষেই এ জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করা সম্ভব না- ও হতে পারে।

আর যে সব পণ্ডিত ও মনীষী এ ব্যাপারে যথেষ্ট অধ্যয়ন ও গবেষণা করে কোরআন মজীদের সর্বোচ্চ তাওয়াতোর্ সম্বন্ধে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে যারা কোরআন মজীদের ওপর ঈমানদার নন সে ক্ষেত্রে এ মহাগ্রন্থের তাওয়াতোর্ প্রশ্নে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও এর ঐশিতায় ঈমানদার না হওয়ার কারণে তাঁরা এর তাওয়াতোরের বিষয়টি প্রচার থেকে বিরত থাকতে পারেন। অন্যদিকে তাঁদের মধ্যে যারা কোরআন মজীদের ওপর ঈমানদার তাঁদের মতের ওপর সাধারণ মানুষ আস্থাশীল না- ও হতে পারে। মানুষ সন্দেহ করতে পারে যে, কোরআন মজীদের ঐশিতায় ঈমানদার (তাদের ধারণায় অন্ধ বিশ্বাসী) হবার কারণে এ সব মনীষী এ গ্রন্থের তাওয়াতোর্ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া সত্ত্বেও দাবী করছেন যে, তাঁরা এ ব্যাপারে অকাট্য প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন। শয়ত্বানের কুমন্ত্রণার কারণে এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশেষ করে অমুসলিম জনগণের মনে কোরআন মজীদের সর্বোচ্চ তাওয়াতোর্ সম্বন্ধে মুসলিম মনীষীদের দাবী প্রত্যয় সৃষ্টি করতে না- ও পারে। তাছাড়া কোরআন মজীদের তাওয়াতোর্ সম্বন্ধে প্রত্যয় হাছ্বিলের মানে এ নয় যে, অকাট্যভাবেই এটি ঐশী গ্রন্থ। বরং তাওয়াতোর্ থেকে অকাট্যভাবে কেবল এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) এ গ্রন্থ যেভাবে রেখে গেছেন এটি ঠিক সেভাবেই বর্তমান আছে; এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটে নি। এ সত্য স্বীকার করেও যে কোনো অমুসলিমের মনে হতে পারে যে, এটি কোনো ঐশী গ্রন্থ নয়, বরং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ই এটি রচনা করেছিলেন।

এমতাবস্থায় এমন একটি উপায় থাকা অপরিহার্য যা চৌদ্দশ’ বছর পরবর্তী বর্তমান প্রজন্মের জন্যই ধু নয়, বরং হাজার হাজার বছর পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছেও কোরআন মজীদকে অকাট্যভাবে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরবে। স্বয়ং কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জই হচ্ছে সেই একমাত্র পন্থা যা সমস্ত রকমের সন্দেহ- সংশয় ও শয়ত্বানী কুমন্ত্রণার জঞ্জাল অপসারণ করে যে কোনো সত্যান্বেষীর সামনে এ মহাগ্রন্থকে খোদায়ী কিতাব্ হিসেবে অকাট্যভাবে তুলে ধরছে।

কারণ, সুস্থ বিচারবুদ্ধির অধিকারী যে কোনো ব্যক্তির নিকটই এটা একটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্য হিসেবে পরিগণিত হতে বাধ্য যে, যে গ্রন্থ খোদায়ী কিতাব্ হওয়ার দাবী করে তার সূরাহ্ সমূহের যে কোনো একটির (ক্ষুদ্রতমটির হলেও) সমতুল্য একটি সূরাহ্ তরীর জন্য সমগ্র মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, অথচ তার বিরোধীরা সকলে মিলেও প্রায় দেড় হাজার বছরেও সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে নি, তখন সে গ্রন্থ সন্দেহাতীতভাবেই ঐশী গ্রন্থ।

সূর্য যখন মধ্যগগনে দেদীপ্যমান থাকে তখন তার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি এবং সময়টি দিন হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোনোরূপ যুক্তিতর্ক ও অনুসন্ধানের আ য় গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। ঠিক সেভাবেই মধ্যগগনের সূর্যের ন্যায়ই চ্যালেঞ্জ প্রদান করে দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে না পাওয়াই প্রমাণ করে যে, কোরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব। আর কোরআন যখন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কিতাব্ এবং সেই কোরআনে যখন ঘোষণা করা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ই কোরআনকে রক্ষা করবেন, তখন কোরআন মজীদ যে সমস্ত রকমের বিকৃতির উর্ধে তাতেও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় যে, কোরআন মজীদের এ চ্যালেঞ্জের বিষয়টি যেভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত ছিলো - যা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব - সে তুলনায় সহস্রাংশ পরিমাণেও তা প্রচার করা হয় নি ও হচ্ছে না। ফলে অমুসলিমদের মধ্যকার সত্যান্বেষী লোকদের নিকট কোরআন মজীদের ঐশিতা অকাট্যভাবে প্রতিভাত হওয়া তো দূরের কথা অনেক মুসলমানেরও কোরআন সংক্রান্ত ধারণা বহুলাংশে অস্বচ্ছ। বিশেষ করে মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণকারী ও আজীবন মুসলমান হিসেবে পরিচয় প্রদানকারী কতক লোক যখন কোরআন মজীদের কোনো কোনো বিধান পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয় বা দাবী তোলে বা এ সব বিধানের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে অথবা বলে যে, চৌদ্দশ' বছর আগেকার প্রেক্ষপটে নাযিল হওয়া এ সব বিধিবিধান বর্তমান কালে হুবহু প্রয়োগযোগ্য নয়, তখন বোঝাই যায় যে, কোরআন মজীদ সম্পর্কিত তাদের ধারণা ঈমানের পর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু এ জন্য তাদেরকে যতোটা দোষ দেয়া যায় তার

চেয়ে বেশী দোষারোপ করতে হয় কোরআন মজীদের স্বরূপ তথা এর মু'জিযাহ্ বা ঐশিতার বিষয়টি প্রচার না করাকে।

তিন : কোরআন চ্যালে যোগ্য

আপত্তিকারীরা আরো বলে : আরবী ভাষার বালাগ্বাতের সাথে পরিচিত যে কোনো লোকের পক্ষেই কোরআনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অনুরূপ উন্নত মানের শব্দসম্ভার সংগ্রহ করা সম্ভব। আর যে ব্যক্তি আলাদাভাবে এক একটি শব্দের সাথে পরিচিত, তার পক্ষে ঐ সব শব্দ পরস্পর গ্রথিত করে কোরআনের বাক্যাবলীর ন্যায় বাক্য রচনা করা খুবই সহজ ব্যাপার। অতঃপর এ জাতীয় বাক্যাবলী সুবিন্যস্ত করে কোরআনের ন্যায় গ্রন্থ্ রচনা করাও তার পক্ষে সম্ভব।

জবাব : উত্থাপিত এ আপত্তি এমন কোনো যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য নয় যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, কোনো ব্যক্তির যদি কোরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অনুরূপ শব্দ তরী করার ও কোরআন মজীদের বাক্যাবলীর অনুরূপ বাক্য রচনার ক্ষমতা থাকে তাহলেই যে তার পক্ষে কোরআন মজীদের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ্ রচনা বা কোরআনের কোনো সূরাহ্র অনুরূপ সূরাহ্ রচনা করা সম্ভব হবে - এরূপ মনে করার পিছনে কোনোই যৌক্তিকতা নেই। কারণ, কোনো ব্যক্তির শব্দগঠন ও বাক্যরচনার যোগ্যতা থাকলেই তার গ্রন্থ্ বা প্রবন্ধ রচনার যোগ্যতা থাকবেই এমন নয়। কী করে এটা দাবী করা যেতে পারে যে, যেহেতু মানবজাতির যে কোনো সদস্যই কোনো ভবন নির্মাণে এক বা একাধিক ইট গাঁথতে সক্ষম সেহেতু যে কারো পক্ষেই একেকটি সুরম্য প্রাসাদ গড়ে তোলা সম্ভব?!

এটাই বা কী করে সম্ভব যে, আরবী ভাষাভাষী যে কোনো লোক বা আরবী- জানা যে কোনো লোকই বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বক্তৃতা- ভাষণ প্রদানে বা কবিতা রচনায় সক্ষম হবে?! অথচ আরবী ভাষাভাষী প্রতিটি লোকই তো আরবী ভাষার বাগ্মিতামণ্ডিত ভাষণ ও উন্নত মানের কবিতাসমূহের শব্দাবলী আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে সক্ষম।

কারণ, ধু আরবী ভাষা বা কোরআন মজীদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই সুন্দর সুন্দর শব্দ আয়ত্ত করতে বা বিচ্ছিন্নভাবে সুন্দর বাক্য রচনা করতে সক্ষম ব্যক্তিমাত্রই সুন্দর কবিতা বা কথিকা বা প্রেরণাদায়ক ভাষণ রচনা করতে সক্ষম নয়। তবে কবি- সাহিত্যিকগণ চেষ্টা করলে অন্য কবি- সাহিত্যিকের রচনার সম মানের বা তার চেয়ে উন্নততর মানের রচনা উপস্থাপনে সক্ষম হতে পারেন, ঐ সব কবিতা বা রচনার শব্দাবলী মুখস্তকারী যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের বিচারে কোরআন মজীদ এমন এক ব্যতিক্রমী মানের গ্রন্থ যে, কোরআনের সমস্ত শব্দের সাথে পরিচিত যে কোনো লোকের পক্ষে তো দূরের কথা, আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের নায়কদের পক্ষেও এর সমতুল্য গ্রন্থ বা এর কোনো সূরাহর অনুরূপ সূরাহ্ রচনা করা সম্ভব নয়; সম্ভব হলে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগের কোরআন- বিরোধী বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মহানায়করা এ থেকে মোটেই পিছপা হতো না।

এদের এ আপত্তির ত্রুটি ও দুর্বলতা "ছ্বারফাহ্" (صرفة) তত্ত্বের প্রবক্তাদের বক্তব্যের ত্রুটি ও দুর্বলতারই অনুরূপ। এ তত্ত্বের প্রবক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোরআন মজীদের বিকল্প রচনা করা সম্ভব, কিন্তু কোরআনের অলৌকিকত্ব এখানে যে, যে কেউ কোরআন মজীদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা থেকে বিরত রাখবেন। কিন্তু এ তত্ত্বে ত্রুটি ও দুর্বলতা নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে :

(১) তাঁদের এ তত্ত্বের দ্বারা তাঁরা যদি বুঝাতে চান যে, "আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কোরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার ক্ষমতা দিতে পারেন, কিন্তু তিনি কাউকেই এ ক্ষমতা দেন নি", তাহলে তা অবশ্য সঠিক কথা হবে। কিন্তু এ অর্থে 'ছ্বারফাহ্' ধু কোরআন মজীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত নবী- রাসূলের ('আঃ) সমস্ত মু'জিযাহর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

আর 'ছ্বারফাহ্' তত্ত্বের দ্বারা তাঁরা যদি এ কথা বুঝাতে চেয়ে থাকেন যে, "মানুষ কোরআনের বিকল্প রচনায় সক্ষম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোরআনের মোকাবিলা থেকে বিরত

রেখেছেন এবং তাদের এ কাজের উদ্যোগ নেয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছেন”, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ দাবীর অযথার্থতা স্বতঃই সুস্পষ্ট। কারণ, আমরা জানি যে, বহু লোকই কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার (এর বিকল্প রচনা করার) চেষ্টা করেছিলো এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলা যে তাদেরকে বিরত রাখেন নি ধু তা- ই নয়, বরং এ ক্ষেত্রে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা ও এর বিকল্প রচনার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। তাই শেষ পর্যন্ত তারা কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মোকাবিলায় স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

(২) কোরআন মজীদের অলৌকিকতা যদি ‘ছ্বারফাহ্’ তত্ত্বের ওপর ভিত্তিশীল হয় অর্থাৎ বিষয়টি যদি এরূপ হয় যে, কোরআন মজীদ নাযিলের পর আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের কাছ থেকে এর বিকল্প উপস্থাপনের ক্ষমতা হরণ করে নিয়েছেন, তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, কোরআন মজীদের অবতরণ ও চ্যালেঞ্জ প্রদানের পূর্বেকার বাগ্মী ও কবি- সাহিত্যিকদের যে সব বক্তব্য ও কবিতা বিদ্যমান ছিলো (এবং এখনো রয়েছে) তাতে কোরআন মজীদের সম মানের কবিতা, ভাষণ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকা সম্ভব। কিন্তু এহেন কোনো কিছু বিদ্যমান থাকলে কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জের জবাবে এর বিরোধীরা তা উপস্থাপন করতো এবং পরম্পরায় তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতো। কিন্তু যেহেতু এহেন কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত হয় নি, সেহেতু এটা সপ্রমাণিত যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে খোদায়ী মু‘জিযাহ্ যার মোকাবিলা ও বিকল্প রচনা করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

এ তত্ত্বের ভিত্তিহীনতা আরো এক দৃষ্টিকোণ থেকেও সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে, কোরআন মজীদের বিকল্প রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদানের ভিত্তি এই যে, সৃষ্টির কালাম্ ও স্রষ্টার কালাম্ কখনোই এক মানের হতে পারে না। অতএব, কোরআন মজীদের আল্লাহর কালাম্ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তোমরা সকলে মিলে এর বিকল্প রচনার চেষ্টা করে দেখো। তোমরা যদি মনে করো যে, এটি মানুষের [হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর] রচিত তাহলে, তোমাদের ধারণা অনুযায়ী, এক ব্যক্তির রচিত গ্রন্থের মোকাবিলায় সকলে মিলে উন্নততর না হোক, অন্ততঃ সম মানের গ্রন্থ

উপস্থাপনে সক্ষম হবে, আর যদি সক্ষম না হও (এবং আল্লাহ্ জানেন যে, সৃষ্টির পক্ষে স্রষ্টার কালামের সম মান সম্পন্ন কালাম্ রচনা সম্ভব নয়) তাহলে তোমরা এ কোরআনকে আল্লাহর কালাম্ রূপে মেনে নাও। তার পরিবর্তে সৃষ্টির মধ্যে যেমন স্রষ্টার কালামের সম মানের কালাম্ রচনা করার ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়, অন্যদিকে, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, তা সম্ভব, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রদত্ত সে স্বাভাবিক ক্ষমতা হরণ করে নিয়ে তাকে অক্ষম বানিয়ে এরপর তাকে চ্যালেঞ্জ দেবেন আল্লাহ তা'আলার মহান মর্যাদার সাথে এটা সামঞ্জস্যশীল নয়।

অবশ্য সৃষ্টি বা সৃষ্টিলক্ষ্যের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলা কোনো মানুষের কোনো স্বাভাবিক ক্ষমতা হরণ করে নিতে পারেন, সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু প্রদত্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে চ্যালেঞ্জ দেবেন এ ধরনের নীচু মানের কাজ আল্লাহ্ তা'আলার শানে চিন্তা করাও অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এভাবে বিকল্প রচনার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে যদি কোরআনের সামনে নতি স্বীকার করাতে হয় তাহলে তার চেয়ে উত্তম হয় যদি আদৌ কারো মনে কোরআনের খোদায়ী কিতাব্ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এভাবে মানুষকে যন্ত্র বানিয়ে তাঁর আনুগত্যে বাধ্য করা আল্লাহ্ তা'আলার নীতি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা চান, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা সত্ত্বেও স্বীয় বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞানের ফয়ছালার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করুক।

চার : পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলীর সাথে কোরআনের বপরীত্য

এরা বলে : আমরা যদি কোরআনের মু'জিযাহ্ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেও নিই, তথাপি একে এর উপস্থাপনকারীর সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, কোরআনে যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ তাওরাত্ ও ইনজীলের সাথে বপরীত্য রয়েছে, অথচ তাওরাত্ ও ইনজীল্ নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ।

জবাব : আপত্তিকারীদের এ আপত্তিটি মূলগতভাবেই একটি ভ্রমাত্মক অপযুক্তি (Fal l acy - مغالطة) । কারণ, কোরআন মজীদ মু'জিযাহ্ হওয়ার মানে হচ্ছে, তা আল্লাহর কালাম্ এবং যিনি তা উপস্থাপন করেছেন তিনি আল্লাহর নবী। এমতাবস্থায় অন্য যে কোনো লেখা বা কথা তার সাথে সাংঘর্ষিক হলে তার মিথ্যা ও বিকৃত হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও তা অবশ্য প্রত্যাখ্যাত। এর বিপরীতে যে সব পুস্তকের (বর্তমানে তাওরাত্ ও ইনজীল্ নামে প্রচলিত পুস্তক সমূহ) আল্লাহর মু'জিযাহ্ হওয়া প্রমাণিত নয় এবং যাদের নামে সেগুলো প্রচলিত তাঁদের ঐতিহাসিকতা ও তাঁদের সাথে ঐ সব পুস্তকের সম্পর্ক অকাট্যভাবে (তাওয়াতোর্ পদ্ধতিতে) প্রমাণযোগ্য নয় সে সব পুস্তককে আসমানী কিতাব্ বলে দাবী করে তার মানদণ্ডে বিচার করে মু'জিযাহর বাহকের নবুওয়াত- দাবী প্রত্যাখ্যান করা একটা হাস্যষ্কর অপযুক্তি ব নয়।

সুতরাং বর্তমানে তাওরাত্ ও ইনজীল্ নামে যা প্রচলিত আছে তাতে বর্ণিত উদ্ভট ও কুসংস্কারমূলক কাহিনীসমূহের সাথে কোরআন মজীদের বপরীত্য বরং এ মহাগ্রন্থের খোদায়ী ওয়াহী হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে এবং কোরআন মজীদ সম্পর্কে যে কোনো রূপ সন্দেহ- সংশয় সৃষ্টির সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে। কারণ, ঐ সব গ্রন্থে যে সব গাঁজাখুরী ধরনের কিচ্ছা- কাহিনী বর্ণিত হয়েছে - যা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান নবী- রাসূলগণ ('আঃ) সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয় - তা থেকে কোরআন মজীদ মুক্ত ও পবিত্র, বরং কোরআন এ সবকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

অতএব, এ সব ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীলের সাথে কোরআন মজীদের বপরীত্য বরং কোরআনের ওয়াহী হওয়ারই আরেকটি প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি এবং বর্তমানে তাওরাত্ ও ইনজীল্ নামে যা প্রচলিত আছে তাতে বিদ্যমান উদ্ভট ও গাঁজাখুরী ধরনের কিচ্ছা- কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরেছি এবং প্রমাণ করেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীল্ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যথাক্রমে হযরত মূসা ('আঃ) ও হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর ওপর নাযিলকৃত তাওরাত্ ও ইনজীল্ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আপত্তিকারীরা যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীলকে আসমানী কিতাব্ বলে দাবী করে থাকে সেহেতু এখানে উক্ত নামের পুস্তকগুলো ও আরো কতগুলো পুস্তকের সংকলন 'বাইবেল' সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে একটি সমন্বিত স্বচ্ছ ধারণা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি।

এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সম্পর্কে খুব কম লোকই সচেতন তা হচ্ছে বাইবেলভুক্ত পুস্তকসমূহের বিকৃতি কোনো সাধারণ বিকৃতি নয় অর্থাৎ পুস্তকগুলোর মূল কাঠামো ঠিক রেখে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সংযোজন- বিয়োজনের ব্যাপার নয়। বরং বাইবেলভুক্ত পুস্তকসমূহের কাঠামোই প্রমাণ করে যে, এগুলো যাদের নামে প্রচলিত তাঁদের পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে। এ কারণে, ঐ সব পুস্তকে সংশ্লিষ্ট নবীদের (অর্থাৎ যে পুস্তক যে নবীর নামে প্রচলিত তাতে তাঁর) জীবনকাহিনী, সংশ্লিষ্ট লেখকদের উপস্থাপনা ও কিছু কিছু খোদায়ী ওয়াহীর সংমি ণ ঘটেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ ও ওয়াহীর উদ্ধৃতিতেও বিকৃতিসাধন করা হয়েছে।

বাইবেলভুক্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে 'গীতসংহিতা', 'হিতোপদেশ', 'উপদেশক' ও 'সোলায়মানের পরম গীত' বাদে বাকী পুস্তকগুলোর গ্রন্থনাকাঠামো সম্পূর্ণরূপে মানবরচিত বইপুস্তকের, বরং সাধারণ স্তরের লেখকদের বইপুস্তকের গ্রন্থনাকাঠামোর অনুরূপ। (উপরোল্লিখিত চারটি পুস্তক মূলতঃ দো'আ ও ওয়াযের সংকলন; অবশ্য তা- ও বিকৃতিমুক্ত নয়।) উপরোক্ত চারটি পুস্তক এবং স্বল্প বিকৃতি যুক্ত 'গণনা পুস্তক' ও 'দ্বিতীয় বিবরণ'- এর অংশবিশেষ - যাতে বিভিন্ন হুকুম- আহকাম্ বর্ণিত হয়েছে - বাদে গোটা বাইবেল হচ্ছে একটি বিকৃতিভারাক্রান্ত 'ইতিহাসগ্রন্থ' মাত্র - যার রয়েছে পারস্পরিক বিরাট পার্থক্যযুক্ত বহু সংস্করণ।

বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত (এবং বাংলাদেশেও প্রচলিত) 'বাইবেল'- এর 'পুরাতন নিয়ম' অংশে ৩৯টি পুস্তক ও 'নতুন নিয়ম' অংশে ২৭টি পুস্তক রয়েছে। কিন্তু 'এ্যাপোক্রিফা বাইবেল'- এর 'পুরাতন নিয়ম' অংশে আরো ১২টি অতিরিক্ত পুস্তক রয়েছে। অন্যদিকে রোম্যান ক্যাথলিক বাইবেলে এ তিনটি অংশই রয়েছে, তবে 'এ্যাপোক্রিফা বাইবেল'- এর 'পুরাতন নিয়ম'ভুক্ত ১২টি পুস্তকের মধ্যে 'ইদরীস- ১', 'ইদরীস- ২' ও 'মানাসসার প্রার্থনা' এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

বাইবেলের অনেকগুলো পুস্তক, বিশেষ করে 'নতুন নিয়ম'ভুক্ত পুস্তকগুলোর মধ্য থেকে প্রথম চারটি পুস্তক বাদে বাকী ২৩টি পুস্তককে স্বয়ং বাইবেল- প্রণেতারাও কোনো নবীর সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সব পুস্তককে তাঁরা নবীদের ('আঃ) সাথে সম্পৃক্তকৃত পুস্তক সমূহের সাথে অভিন্ন সংকলনে স্থান দিয়ে 'পবিত্র পুস্তক'- এর মর্যাদা দিয়েছেন।

অন্যদিকে 'পুরাতন নিয়ম'- এর প্রথম পাঁচটি পুস্তককে 'তাওরাত্' (অর্থাৎ তাওরাতের পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক খণ্ড) বলে এবং 'নতুন নিয়ম'- এর প্রথম চারটি পুস্তককে 'ইনজীল্' বলে দাবী করা হয়। তবে এ চারটি পুস্তক তাওরাতের পাঁচ পুস্তকের ন্যায় ইনজীলের পর্যায়ক্রমিক চারটি খণ্ড নয়, বরং একই বিষয়ে চারজন লেখকের লেখা চারটি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক। বলা বাহুল্য যে, চারটি পুস্তকের প্রতিটিই হচ্ছে হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর জীবনকাহিনী। অবশ্য তাতে তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের (ইনজীলের) আয়াত সমূহের কিছু অংশও তাঁর উক্তি হিসেবে (বিকৃতি সহ) স্থান পেয়েছে।

উক্ত চারটি পুস্তকের মধ্যে বহু পরস্পরবিরোধিতার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও খৃস্টানরা এ চারটি পুস্তককেই সঠিক গণ্য করে 'নতুন নিয়ম'- এ স্থান দিয়েছে ও 'পবিত্র' (!) পুস্তকের মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য বাইবেল- প্রণেতাদের প্রতি এ জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় যে, তাঁরা এ চারটি পুস্তকের নামকরণ করেছেন এর লেখকদের নামে, হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর নামে নয়। অবশ্য এছাড়া উপায়ও ছিলো না। কারণ, চারজন লেখকের একই বিষয়ে লেখা পুস্তক চালাতে গিয়ে তাঁরা লেখকদের নাম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন।

তবে এই তথাকথিত ইনজীলের সংস্করণ মাত্র চারটি নয়। বরং সেন্ট পল্ - যিনি প্রথমে হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর উর্ধলোকে গমনের পরে (ইয়াহূদী ও খৃস্টান মতে, শূলে বিদ্ধ হয়ে নিহত হবার পরে) খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 'ঈসা ('আঃ)- এর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের পরিবর্তে এ ধর্মের মুখপাত্রে পরিণত হন - সুবিধাজনক বিবেচনায় ইনজীলের এ চারটি সংস্করণকে অনুমোদন প্রদান করেন। অন্যথায় তথাকথিত ইনজীলের সংস্করণ অনেক। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় ২৫টি ইনজীলের তালিকা আছে। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে লন্ডন থেকে

প্রকাশিত প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের বিখ্যাত গ্রন্থ এক্সিহোমো- তে প্রাথমিক যুগের ৭৭টি (সংস্করণের) ইনজীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [‘আল্লামাহ্ মোহাম্মাদ ছ্বাদেক্বী প্রণীত ও মৎ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত বাইবেলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।]

ইনজীলের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে একমাত্র বারনাবা (Bar nabas) লিখিত পুস্তকটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অবশ্য হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর প্রত্যক্ষ শিষ্য বারনাবা লিখিত পুস্তকটিও ধু খোদায়ী কালামের (ইনজীলের) সংকলন নয়, বরং হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর জীবনকাহিনী - যাতে তাঁর যবানীতে খোদায়ী কালাম্ও রয়েছে। তবে প্রাপ্ত যে সব পুস্তক ইনজীল্ হবার দাবীদার সেগুলো অধ্যয়ন করলে বারনাবাসের ‘ইনজীল’কেই মোটামুটি ‘ইচ্ছাকৃত বিকৃতি’ থেকে মুক্ত বলা চলে যদিও ছোটোখাটো ভুলভ্রান্তি রয়েছে।

উল্লেখ্য, ‘ইনজীল্’ নামে অভিহিত হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর জীবনীপুস্তকগুলোর লেখকদের মধ্যে একমাত্র বারনাবাই ছিলেন হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ছ্বাহাবী (হাওয়ারী)।

যদিও প্রচলিত সবগুলো ইনজীলেই রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তবে তাঁর নামকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বা ‘পারাক্লিতাস্’ হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র বারনাবার ইনজীলের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর ‘মুহাম্মাদ’ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ পুস্তকে এ- ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর রূহ্ হচ্ছে প্রথম সৃষ্টি ও আল্লাহ্ তা‘আলার সমগ্র সৃষ্টিকর্মের কেন্দ্রবিন্দু এবং আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, তাঁকে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তেমনি এ পুস্তকে ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার ও নিন্দা করা হয়েছে এবং হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর নিহত না হওয়া ও উর্ধলোকে আরোহণের কথা বলা হয়েছে। এ সব কারণে সেন্ট পল্ ও তাঁর অনুসারীরা বারনাবাসের ইনজীলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

যাই হোক, কোরআন মজীদ যেভাবে সংরক্ষিত আছে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর ওপর নাযিলকৃত ইনজীল্ যে কোনোরূপ বিকৃতি ও সংমি ণ ছাড়া সেভাবে সংরক্ষিত নেই - এ সত্য অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাওরাতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে

হযরত মূসা (‘আঃ)- এর গোটা জীবনকাহিনী, এমনকি তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত অধ্যায় তাঁর ওপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত তাওরাতের অংশ বলে দাবী করার মতো হাস্যকর কাজ কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ইয়াহূদী বা খৃস্টান করবেন না বলে আশা করা যায়।

পাঁচ : কোরআনে স্ববিরোধিতা

কোরআন- বিরোধীরা দাবী করে যে, কোরআনে স্ববিরোধী কথাবার্তা রয়েছে। তাদের দাবী অনুযায়ী কোরআনে এমন দু’টি স্ববিরোধী কথা রয়েছে যা কোরআনের ওয়াহী হওয়াকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। তা হচ্ছে :

(১) হযরত যাকারিয়া (‘আঃ)- এর দো‘আ কবুল হওয়ার নিদর্শন এই যে, তিনি তিনদিন লোকদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন না। এ কথা বুঝাতে গিয়ে কোরআন এক জায়গায় উল্লেখ করেছে :

(قال آيَتک اَلاّ تکلم الناس ثلاثة ايام الا رمزاً.)

“তিনি (আল্লাহ্) বললেন : তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন প্রতীকী ভাষায় ব্যতীত লোকদের সাথে কথা বলবে না।” (সূরাহ্ আালে ‘ইমরান্ : ৪১)

কিন্তু অন্যত্র একই প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতের বিপরীতে তিনি তিন রাত লোকদের সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

(قال آيَتک اَلاّ تکلم الناس ثلاثة ليال سوياً.)

“তিনি (আল্লাহ্) বললেন : তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন রাত স্বাভাবিক (বা একভাবে) কথা বলবে না।” (সূরাহ্ মারইয়াম্ : ১০)

উপরোক্ত দু’টি আয়াত পরস্পর বিরোধী। কারণ, দো‘আ কবুল হওয়ার নিদর্শন হিসেবে একটিতে তিন দিন এবং অপরটিতে তিন রাত স্বাভাবিক কথা না বলার উল্লেখ করা হয়েছে।

জবাব : আরবী ভাষায় يوم শব্দটি কখনো কখনো দিন অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং সে ক্ষেত্রে তার বিপরীত অর্থ তথা রাত্রি অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় বুঝাতে ليل শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(سخرها عليهم سبع ليل و ثمانية ايام حُسوماً.)

"তিনি তাদের ('আাদ্ জাতির) ওপর সাত রাত ও আট দিনের জন্য তাকে (প্রবল বায়ু প্রবাহকে) বলবৎ করে দিলেন।" (সূরাহ্ আল্- হাাক্কাহ্ : ৭)

এ আয়াতে يوم ও ليل পরস্পরের বিপরীত অর্থে ব্যহৃত হয়েছে।

কিন্তু আরবী ভাষায় কখনো কখনো يوم বলতে পুরো দিন ও রাত বুঝানো হয় । যেমন, কোরআন মজীদ এরশাদ হয়েছে :

(و تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام.)

"আর তোমরা তিন দিনের জন্য (অর্থাৎ তিন দিন ও তিন রাত্রির জন্য) তোমাদের বাড়ীঘরে অবস্থানের সুবিধা ভোগ করে নাও।" (সূরাহ্ হূদ : ৬৫)

অনুরূপভাবে ليل শব্দটি কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و الليل اذا يغشى.)

"শপথ রাত্রির যখন তা (সব কিছুকে অন্ধকারে) আবৃত করে নেয়।" (সূরাহ্ আল্- লাইল্ : ১)

তেমনি ওপরে যেমন উদ্ধৃত করা হয়েছে :

(سخرها عليهم سبع ليل و ثمانية ايام حُسوماً.)

"তিনি তাদের ('আাদ জাতির) ওপর সাত রাত ও আট দিনের জন্য তাকে (প্রবল বায়ু প্রবাহকে) বলবৎ করে দিলেন।" (সূরাহ্ আল্- হাাক্কাহ্ : ৭)

কিন্তু কখনো কখনো ليل শব্দটি পুরো দিন- রাত্রি বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(و اذا واعدنا موسى اربعين ليلة)
"আর আমি যখন মূসাকে চল্লিশ রাত্রির জন্য (অর্থাৎ পর পর চল্লিশ দিন- রাত্রির জন্য) প্রতিশ্রুতি দিলাম।" (সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহ্ : ৫১)

বস্তুতঃ পুরো দিন- রাত বুঝাবার জন্য ধু يوم বা ধু ليل ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় ভুরি ভুরি রয়েছে; কোরআন মজীদেও এর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, হযরত যাকারিয়া ('আঃ)- এর দো'আ কবুল হওয়া সংক্রান্ত উক্ত দু'টি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে পুরো দিন- রাত্রি বুঝাতে ليل ব্যবহৃত হয়েছে এবং একইভাবে দ্বিতীয়টিতে পুরো দিন- রাত্রি বুঝাতে يوم ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনোরূপ স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই। উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে স্ববিরোধিতা তো নেই- ই, বরং আয়াতদ্বয় পরস্পরের ব্যাখ্যাকারী।

এছাড়া উভয় আয়াতেই যদি ধু يوم ব্যবহৃত হতো তাহলে কারো পক্ষে 'তিন দিন ও তিন রাত্রি' এবং কারো পক্ষে ' ধু তিন দিন (রাত্রি নয়)' অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। অনুরূপভাবে উভয় আয়াতে যদি ধু ليل ব্যবহৃত হতো তাহলে কারো পক্ষে 'তিন দিন ও তিন রাত্রি' এবং কারো পক্ষে ' ধু তিন রাত্রি (দিন নয়)' অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ থাকতো। এমতাবস্থায় দুই আয়াতে দুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আর কোনো মতপার্থক্যের সুযোগ থাকলো না।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে যারা স্ববিরোধিতা কল্পনা করেছে তারা يومকে ধু 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত' অর্থে এবং অনুরূপভাবে ليلকে ধু 'সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়' অর্থে গ্রহণ করেছে। অথচ উভয় শব্দেরই এতদভিন্ন অন্য অর্থও রয়েছে। তা হচ্ছে, উভয় শব্দেরই অন্যতম অর্থ 'পুরো দিন- রাত্রি'।

উল্লেখ্য, অন্য অনেক ভাষায়ই ‘দিন’ ও ‘রাত’ শব্দদ্বয়ের এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষায় ‘দিন’ বলতে ‘সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়’ এবং ‘দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা -’ উভয়ই বুঝানো হয়। ফার্সী ভাষায় এর ব্যবহার আরবী ভাষার অনুরূপ। -(রাত) شب ও (দিন) روز

যেমন, বলা হয় - دو شب آنجا بوديم :“আমরা দুই রাত অর্থাৎ দুই)‘দিনরাত -’) সেখানে ছিলাম।” ইংরেজী ভাষায়ও এ ধরনের প্রচলন রয়েছে। যেমন, বলা হয় : Hotel fare per night 100 dollar. - “হোটেল- ভাড়া প্রতি রাত (অর্থাৎ প্রতি ‘দিন- রাত’) একশ” ডলার।” এখানে ধু রাতের ভাড়া বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং দিন- রাত চব্বিশ ঘণ্টার ভাড়া বুঝানোই উদ্দেশ্য।

অতএব, উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে স্ববিরোধিতার কল্পনা যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য।

এখানে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে, উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে স্ববিরোধিতা থাকলে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগের ইসলাম- বিরোধী আরবরা একে পুঁজি করে কোরআনের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতো। কিন্তু শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকায় তারা প্রতিবাদ করে নি। এ থেকে আরো সুস্পষ্ট যে, আরবী ভাষায় যথাযথ জ্ঞান ছাড়াই বিরোধীরা কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে হাস্যকর আপত্তি তুলেছে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যরূরী মনে করছি, তা হচ্ছে, অনেকেই رمز শব্দের অর্থ করেছেন ‘আকার- ইঙ্গিত’ অর্থাৎ তিনি মুখে কথা বলতে পারেন নি, বরং যাকে যা কিছু বলার তা ইশারা- ইঙ্গিতে বলেছেন। এ অর্থ গ্রহণ সঠিক বলে মনে হয় না, কারণ, মুখে কথা বলতে না পারাটা সকলের কাছে অসুস্থতার লক্ষণ। এমতাবস্থায় তা আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীকে প্রদত্ত মু‘জিযাহ্ (آية) হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

বস্তুতঃ رمز শব্দের অর্থ ‘আকার- ইঙ্গিত’ বা ‘ইশারা’। তবে এর মানে হাতের বা শারীরিক ‘আকার- ইঙ্গিত’ বা ‘ইশারা’ নয়, বরং ‘আকার- ইঙ্গিত’ বা ‘ইশারা’র ভাষা তথা রহস্যজনক

ও প্রতীকী ভাষা যা বোঝার জন্য অনেক বেশী মাথা ঘামাতে হয়। এ ধরনের কথাবার্তা যে কোনো ব্যক্তির জন্য মর্যাদা বা গুরুত্বের পরিচায়ক। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি সব সময় যে ধরনের ভাষায় কথাবার্তা বলেন তার পরিবর্তে তিনি হঠাৎ করে আকার- ইঙ্গিতবাচক বা রহস্যময় ভাষায় কথা বলা রু করলে সবাই আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় যে, এটা তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব হলো। ফলে তাঁর মর্যাদা বা গুরুত্ব অনেক বেশী বেড়ে যায়। বিশেষ করে যে সব লোক ইঙ্গিতবাচক ভাষায় কথা বলতে সুদক্ষ তাঁরাও সারা দিনে হয়তো কয়েক বার এ ধরনের কথা বলেন; অনবরত এ ধরনের ভাষায় কথা বলা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

কিন্তু হযরত যাকারিয়া ('আঃ) তিন দিন এ ধরনের ইঙ্গিতবাচক বা প্রতীকী ভাষায় কথা বলেন। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যবানে এ ধরনের কথা জারী করে দেন - যা ছিলো একটি মু'জিযাহ্ (آية)। অত্র আলোচনার ধারাবাহিকতায় পরে যে আয়াত উদ্ধৃত হচ্ছে (অর্থাৎ সূরাহ্ মারইয়াম্- এর ১০ নং আয়াত) তাতেও তিনি 'স্বাভাবিক কথা' বা 'একভাবে কথা' বলবেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, তিনি এক এক সময় এক এক ধরনের বাকভঙ্গিতে ইঙ্গিতবাচক কথা বলেছিলেন। এছাড়া সূরাহ্ মারইয়াম- এর পরবর্তী আয়াতে (১১) লোকদেরকে সকাল- সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা (তাসবীহ্) করার জন্য নির্দেশ সম্বলিত ওয়াহী জানিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে - যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, তিন দিনের জন্য তাঁর কথা বলার ক্ষমতা স্থগিত হয়ে যায় নি।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদে যে স্ববিরোধিতার কোনো স্থান নেই তা এক অনস্বীকার্য সত্য। কিন্তু কিছু লোক এ সত্যকে অস্বীকার করে কোরআন মজীদের মর্যাদাকে খাটো করার লক্ষ্যে বৃথা হীন প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একেবারেই গাফেল হয়ে আছে যে, তাদের গ্রন্থ বর্তমানে প্রচলিত ইনজীলে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা এবং যথার্থই স্ববিরোধিতা রয়েছে।

ইনজীল্ নামধারী 'মথি' পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যীশূ [হযরত 'ঈসা ('আঃ)] জানান যে, তাঁর দেহ তিন দিন ও তিন রাত কবরস্থ থাকবে। কিন্তু উক্ত 'মথি' পুস্তকেরই অন্যত্র এবং ইনজীল্ নামধারী অপর তিনটি পুস্তকে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে : যীশূ ক্রবারের দিনের

শেষাংশের কিছু সময়, শনিবার রাত (অর্থাৎ ক্রবার দিবাগত রাত), শনিবার দিন ও প্রভাতের পূর্ব পর্যন্ত রোববার রাতে (অর্থাৎ মোট দেড় দিনের কিছু বেশী সময়) কবরে ছিলেন।

বর্তমানে ইনজীল্ নামে পরিচিত বিভিন্ন পুস্তকের শেষ দিকে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে। তাই বর্তমান ইনজীলের অন্যতম লেখক মথিকে ও বর্তমানে প্রচলিত ইনজীল্ নামধারী পুস্তকগুলোকে যারা আসমানী গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, এই তিন দিন ও রাত্রির হিসাব কীভাবে মিলানো হয়েছে? এই মথি পুস্তকেরই অন্যত্র এবং ইনজীল্ নামধারী অন্যান্য পুস্তকে যা বলা হয়েছে তার সাথে এই তিন 'দিন ও রাত্রি'র সামঞ্জস্য কোথায়?

আশ্চর্যের বিষয় যে, পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত (!) ব্যক্তিরা উদ্ভট ও গাঁজাখুরী গালগল্পে ঠাসা তাওরাত্ ও ইনজীল্ নামে পরিচিত পুস্তকসমূহে বিশ্বাস পোষণ করেন এবং এগুলোকে ওয়াহী বলে মনে করেন, কিন্তু কোরআন মজীদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ এই কোরআন মজীদ সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং মানবতাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দিকে পথপ্রদর্শন করেছে। কিন্তু কী আর করা! কারণ, মানুষের স্বাধীন চিন্তাচেতনার ও বিচারবুদ্ধির জন্য ধর্মান্ধতা হচ্ছে এক মারাত্মক মারণ ব্যাধি, আর সত্যান্বেষী লোকের সংখ্যা খুবই কম।

(২) তারা বলে : কোরআনে দ্বিতীয় যে স্ববিরোধিতা রয়েছে তা হচ্ছে, কোরআন কখনোবা মানুষের কাজের দায়- দায়িত্ব মানুষের ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মানুষ স্বীয় ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বলে কাজ করে থাকে বলে উল্লেখ করেছে। যেমন, বলেছে :

(فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.)

"অতঃপর যে চায় সে ঈমান আনবে এবং যে চায় কাফের হবে।" (সূরাহ্ আল্- কাহফ্ : ২৯)

আবার কোথাও কোথাও কোরআন সমস্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেছে। এমনকি মানুষের কাজকর্মকেও আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছে। যেমন, বলেছে :

(و ما تشاؤن الا ان يشاء الله.)

“তোমরা ইচ্ছা করবে না আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।” (সূরাহ্ আল্- ইনসান্/ আদ্-দাহর : ৩০)

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোরআন মজীদে কতগুলো আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাদের কাজের ব্যাপারে এখতিয়ারের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যদিকে অপর কতগুলো আয়াতে মানুষকে এখতিয়ার বিহীন রূপে তুলে ধরা হয়েছে এবং সমস্ত কাজ আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কোরআনের এ দুই ধরনের আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা বর্তমান কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে যা নিরসন করা সম্ভব নয়।

এর জবাব এই যে, কোরআন মজীদে যে কোথাও কোথাও বান্দাহদের কাজকে তাদের নিজেদের ওপর আরোপ করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও যে তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়েছে - উভয়ই স্ব স্ব স্থানে সঠিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোনোরূপ স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নেই। কারণ,

প্রতিটি মানুষই স্ব স্ব সহজাত অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা এ সত্য অনুভব করে যে, সে কতোগুলো কাজ করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী এবং স্বাধীনভাবে ঐ সব কাজ করতে বা করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম। এ হচ্ছে এমন বিষয় মানবিক প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধি যার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। এ ব্যাপারে কেউ সামান্যতম সন্দেহও পোষণ করতে পারে না। এ কারণে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানবান লোকই দুষ্কৃতিকারীকে তিরস্কার ও শাস্তি প্রদান করেন। এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ স্বীয় কাজকর্মে স্বাধীনতা ও এখতিয়ারের অধিকারী এবং কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য তাকে বাধ্য করা হয় না।

অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি মানুষই লক্ষ্য করে থাকে যে, সাধারণভাবে পথ চলার সময় তার যে গতি তার সাথে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাবার ক্ষেত্রে তার গতিতে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য থেকে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রথমোক্ত গতির ক্ষেত্রে সে স্বাধীন ও এখতিয়ার সম্পন্ন, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত গতির ক্ষেত্রে সে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাধ্য।

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আরো লক্ষ্য করে যে, যদিও সে কতোগুলো কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন; সে চাইলে স্বেচ্ছায় সে কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে এবং চাইলে স্বেচ্ছায় সে কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকতে পারে, তথাপি তার এখতিয়ারাধীন এ সব কাজের অধিকাংশ পটভূমি বা পূর্বশর্ত সমূহ তার এখতিয়ারের বাইরে। যেমন : মানুষের কাজের পটভূমি, তার আয়ুষ্কাল, তার অনুভূতি ও অনুধাবনক্ষমতা, তার ঐ কাজের প্রতি আগ্রহ, তার অভ্যন্তরীণ চাহিদাসমূহের কোনো একটির জন্য কাজটি অনু ল হওয়া এবং সবশেষে কাজটি সম্পাদনের শক্তি ও ক্ষমতা।

বলা বাহুল্য যে, মানুষের কাজের এ পটভূমিসমূহ তার এখতিয়ারের গণ্ডির বাইরে এবং এ পটভূমিসমূহের স্রষ্টা হচ্ছেন সেই মহাশক্তি যিনি স্বয়ং মানুষেরই স্রষ্টা।

অতএব, এ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কাজকর্মকে একই সাথে যেমন মানুষের প্রতি আরোপ করা চলে, তেমনি তা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিও আরোপ করা চলে - যিনি এ কাজসমূহের সমস্ত পটভূমি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিচারবুদ্ধি বলে যে, সৃষ্টিকর্তা সমস্ত সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করার পর নিজেকে কাজ থেকে গুটিয়ে নেন নি বা অবসর গ্রহণ করেন নি এবং সৃষ্টিলোকের পরিচালনা থেকেও হাত গুটিয়ে নেন নি, বরং সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব টিকে থাকা ও অব্যাহত থাকার বিষয়টি তাদের সৃষ্টির ন্যায়ই সৃষ্টিকর্তার শক্তি ও ইচ্ছার মুখাপেক্ষী। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সৃষ্টিলোকের পক্ষে এমনকি মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকা সম্ভব নয়।

সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিলোকের সম্পর্ক একজন নির্মাতার সাথে তার নির্মিত ভবনের সম্পর্কের ন্যায় নয় - যেখানে ভবনটি ধু তার অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে এর নির্মাতা ও মিকদের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু অস্তিত্ব লাভের পরে তাদের থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন এবং এমনকি নির্মাতা ও মিকদের বিলয় ঘটলেও ভবনটি তার অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পারে। তেমনি এ সম্পর্ক একজন গ্রন্থকারের সাথে তাঁর রচিত গ্রন্থের সম্পর্কের ন্যায়ও নয়, যেখানে গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রেই ধু গ্রন্থকারের

অস্তিত্বের প্রয়োজন, কিন্তু রচিত হয়ে যাবার পর গ্রন্থটির টিকে থাকা ও অস্তিত্ব অব্যাহত থাকার জন্য গ্রন্থকার, তাঁর হস্তাক্ষর ও তাঁর লিখনকর্মের আদৌ প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সৃষ্টিজগতের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক যদিও সমস্ত রকমের উপমার উর্ধে তথাপি অনুধাবনের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে : সৃষ্টিজগতের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক বদ্যুতিক বাতির আলোর সাথে বিদ্যুতকেন্দ্রের সম্পর্কের ন্যায়। বদ্যুতিক বাতি ঠিক ততোক্ষণই আলো বিতরণ করতে পারে যতক্ষণ তারের মাধ্যমে বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে বিদ্যুত এসে বাতিতে পৌঁছে। বস্তুতঃ বাতি তার আলোর জন্য প্রতিটি মুহূর্তেই বিদ্যুতকেন্দ্রের মুখাপেক্ষী; যে মুহূর্তে বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হবে, ঠিক সে মুহূর্তেই বাতি নিভে যাবে এবং আলোর স্থানে অন্ধকার আধিপত্য বিস্তার করবে।

ঠিক এভাবেই সমগ্র সৃষ্টিজগত স্বীয় অস্তিত্বলাভ, স্থিতি ও অব্যাহত থাকার জন্য তার মহান উৎসের মুখাপেক্ষী এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তার মহান উৎসের মনোযোগ (توجه) ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। প্রতিটি সৃষ্টিই প্রতিটি মুহূর্তেই সে মহান উৎসের সীমাহীন দয়া ও করুণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আছে; মুহূর্তের জন্যও যদি এ দয়া ও করুণার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সমগ্র সৃষ্টিনিচয় সাথে সাথেই অনস্তিত্বে পর্যবসিত হবে এবং সৃষ্টিলোকের আলো হারিয়ে যাবে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বান্দাহদের কাজ ‘জাবর্’ ও এখতিয়ারের মধ্যবর্তী একটি অবস্থার অধিকারী এবং মানুষ এ দুই দিকেরই সুবিধা পাচ্ছে। কারণ, মানুষ কোনো কাজ সম্পাদন করা বা না করার ক্ষেত্রে স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহারে পুরোপুরি স্বাধীন। কিন্তু তার এ শক্তি ও ক্ষমতা এবং কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের পটভূমি ও পূর্বশর্ত (مقدمات) তার নিজের নয়, বরং এগুলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাকে দেয়া হয়েছে। এ সব কিছুর অস্তিত্বলাভের ব্যাপারে যেমন মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি মুখাপেক্ষী, তেমনি এ সবের স্থিতি ও অব্যাহত থাকার ব্যাপারেও সে প্রতি মুহূর্তেই তাঁরই দয়া- অনুগ্রহ ও মনোযোগের মুখাপেক্ষী। সুতরাং মানুষ যে

কাজই সম্পাদন করছে এক হিসেবে তা তার নিজের প্রতি আরোপযোগ্য, আরেক হিসেবে তা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরোপযোগ্য।

[جبر মানে 'বাধ্য করা'। এটি কালাম্ শাস্ত্রের একটি বিশেষ পরিভাষা। যারা جبر - এ বিশ্বাসী তারা সৃষ্টিকুলের সমস্ত কাজ স্রষ্টার প্রতি আরোপ করে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান মত হচ্ছে : (১) সৃষ্টির রুতে বা সৃষ্টিপরিকল্পনার মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা ভবিষ্যতের সব কিছু খুটিনাটি সহ নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তদনুযায়ী সব কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে চলেছে। (২) প্রতি মুহূর্তে স্রষ্টা যা চান তার দ্বারা তা- ই করিয়ে নেন। (৩) প্রতিটি মানুষ (এবং অন্যান্য প্রাণীও) মাতৃগর্ভে আসার পর সৃষ্টিকর্তা তার ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করে দেন। (৪) প্রতি বছর একবার সৃষ্টিকর্তা গোটা সৃষ্টিকুলের, বিশেষতঃ মানুষের পরবর্তী এক বছরের ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করে দেন। এ সব বিষয় নিয়ে অত্র লেখকের অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম গ্রন্থে বিচারবুদ্ধি ও কোরআন মজীদের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

কোরআন মজীদের উক্ত আয়াত সমূহেও এ সত্যই তুলে ধরা হয়েছে। এ সব আয়াতে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, স্বীয় কাজকর্মের ওপরে মানুষের শক্তি- ক্ষমতা ও এখতিয়ারের নিয়ন্ত্রণ তার কাজকর্মের ওপর খোদায়ী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, তিনি মানুষের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং মানুষের কাজকর্মে তাঁরও ভূমিকা রয়েছে।

বস্তুতঃ একেই বলা হয় امر بين الامرين (দু'টি অবস্থার মাঝামাঝি একটি অবস্থা)। আর মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে চন্তিক দিক থেকে বিভিন্ন মত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতের একটি সংমি ত রূপ বিরাজ করলেও বিশেষ করে আমলের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তারা মানুষের কাজকর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে অবচেতনভাবে হলেও এ আক্বীদাহ্ই পোষণ করে। পবিত্র আহলে বাইতের ('আঃ) ধারাবাহিকতায় আগত ইমামগণও এ বিষয়টির ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এ তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে 'জাবর্' ও 'তাফভীয্' - এ উভয় তত্ত্বকে বাতিল প্রমাণ করে দিয়েছেন।

[تفويض (অর্পণ) হচ্ছে কালাম্ শাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এর মানে হচ্ছে, মানুষকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে; সৃষ্টিকর্তা তার কাজকর্ম মোটেই নিয়ন্ত্রণ করেন না। একে اختيار (নির্বাচন/ বেছে নেয়া) তত্ত্বও বলা হয়। মু'তাযিলাহ্ ফিরক্বাহ্ এ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলো।]

এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী বিধায় আমরা এখানে একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পাঠক- পাঠিকাদের সামনে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াস পাবো :

এমন এক ব্যক্তির কথা মনে করুন যার হাত দু'টি অকেজো, ফলে সে তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া করতে এবং তা দ্বারা কাজকর্ম করতে পারে না। কিন্তু একজন চিকিৎসক একটি বদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তার হাত দু'টিকে সচল ও সক্ষম করে দিলেন। ডাক্তার যখনই তার হাতে উক্ত যন্ত্র থেকে বিদ্যুত- তরঙ্গ সরবরাহ করেন তখন সে ইচ্ছা করলে তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া ও তা দিয়ে কাজকর্ম করতে পারে এবং না চাইলে কিছু না করেও থাকতে পারে। কিন্তু যখনই ডাক্তার তার হাতের সাথে উক্ত যন্ত্রের সংযোগ ছিন্ন করে দেন বা তাতে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেন তখন সে অক্ষম অবস্থায় ফিরে আসে এবং ইচ্ছা করলেও সে তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া করতে পারে না। এখন পরীক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে ডাক্তার রোগীর হাত দু'টির সাথে উক্ত যন্ত্রটির সংযোগ প্রদান করলেন এবং রোগীও স্বীয় ইচ্ছা ও এখতিয়ার অনুযায়ী তার হাত দু'টি নাড়াচাড়া ও তা ব্যবহার করে কাজকর্ম করতে রু করলো। তার এ কাজকর্ম নির্বাচন ও তার ভা ভ পরিণতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ডাক্তারের কোনো ভূমিকা নেই। কারণ, ডাক্তার তাকে এ সব কাজ করতে বা না করতে বাধ্য করে নি। বরং ডাক্তার যে কাজ করলেন তা হচ্ছে, তিনি রোগীকে কাজ করার শক্তি সরবরাহ করলেন এবং রোগীর পসন্দ মতো যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করলেন।

এখন এ ব্যক্তির হাত নাড়াচাড়া করা ও তা দ্বারা কাজকর্ম করাকে আমরা امر بين الامرين - এর দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করতে পারি। কারণ, তার এভাবে হাত নাড়াচাড়া ও কাজকর্ম করার বিষয়টি উক্ত যন্ত্র থেকে বিদ্যুত- তরঙ্গ সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল, আর এ বিদ্যুত- তরঙ্গ সরবরাহের

বিষয়টি পুরোপুরি ডাক্তারের এখতিয়ারাধীন। অন্যদিকে ঐ ব্যক্তির হাত নাড়াচাড়া ও কাজকর্ম করাকে পুরাপুরিভাবে ডাক্তারের প্রতিও আরোপ করা চলে না। কারণ, ডাক্তার তাকে ধু শক্তি সরবরাহ করেছেন, কিন্তু হাত নাড়াচাড়া ও তা দিয়ে কাজকর্ম রোগী স্বেচ্ছায় সম্পাদন করেছে; রোগী চাইলে হাত নাড়াচাড়া ও তা দিয়ে কাজকর্ম করা থেকে বিরতও থাকতে পারতো।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে কাজকর্মের কর্তা রোগী একদিকে যেমন স্বীয় এখতিয়ারের বলে কাজকর্ম সম্পাদন করেছে এবং জাবর্ বা যান্ত্রিকতার শিকার হয় নি, তেমনি তার কাজকর্মের পুরো এখতিয়ারও তাকে প্রদান করা হয় নি, বরং সর্বক্ষণই তাকে অন্যত্র থেকে শক্তি ও সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।

এটাই হচ্ছে لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين - "না জাবর্, না তাফভীয্, বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা।" মানুষের সমস্ত কাজকর্ম এ অবস্থার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়ে থাকে। একদিকে যেমন মানুষ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে, অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা যার পটভূমি বা পূবশর্তাবলী তরী করে দেন তথা তিনি যা ইচ্ছা করেন তার বাইরে সে কোনোকিছু করতে বা করার ইচ্ছা করতে পারে না।

এতদসংক্রান্ত সমস্ত আয়াতের এটাই লক্ষ্য। অর্থাৎ কোরআন মজীদ একদিকে মানুষের জন্য এখতিয়ার প্রমাণ করে জাবর্- এ বিশ্বাসীদের চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করেছে, অন্যদিকে মানুষের কাজকর্মকে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তাফভীয্- এর প্রবক্তাদের অভিমতকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে।

জাবর্ ও তাফভীয্- এর মধ্যবর্তী যে মধ্যম পন্থা রয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পবিত্র আহলে বাইত্ - যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত রকমের অপকৃষ্টতা থেকে মুক্ত রেখেছেন (সূরাহ্ আল্- আহযাাব্ : ৩৩) - আমাদের জন্য তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এবারে আমরা এ প্রসঙ্গে তাঁদের পথনির্দেশ থেকে দু'টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি :

(১) এক ব্যক্তি হযরত ইমাম জা'ফার ছ্বাদেক্ ('আঃ)- এর কাছে প্রশ্ন করলো : "আল্লাহ্ তা'আলা কি মানুষকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেন?"

ইমাম : “না।”

“আল্লাহ্ কি সমস্ত কাজই তাঁর বান্দাহ্দের ওপর ন্যস্ত করেছেন?”

“না।”

“তাহলে প্রকৃত অবস্থাটা কী?”

“আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাহদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে এবং জাবর্ ও তাফভীযের মধ্যবর্তী একটি পথ অনুসৃত হচ্ছে।”

(২) হযরত ইমাম জা‘ফার্ ছ্বাদেক (‘আঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়াইয়াতে বলা হয়েছে : “না জাবর্, না তাফভীয্, বরং প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এতদুভয়ের মাঝামাঝি।” (প্রাগুক্ত)

বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে এ জাতীয় রেওয়াইয়াতের সংখ্যা অনেক।

সে যা-ই হোক, কোরআন মজীদে যারা স্ববিরোধিতা কল্পনা করেছে তারা যে বিষয়টির গভীরতা ও প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অবাক হতে হয় এ কারণে যে, কোরআন মজীদে উক্ত দুই ধরনের আয়াত একটি-দু’টি নয়, বরং অনেক থাকা সত্ত্বেও কোরআন নাযিলের যুগের আরবের মোশরেক ও ইয়াহূদী-খৃস্টান যাজক-পণ্ডিতগণ এ সব আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারার কারণে এগুলোকে স্ববিরোধী বলে দাবী করেন নি, অথচ এ যুগের তথাকথিত আলোকদীপ্ত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ এগুলোকে স্ববিরোধিতার নিদর্শন বলে দেখাবার ভণ্ডামিমূলক অপচেষ্টা চালাচ্ছেন!

ছয় : মু‘জিযাহ্র নিয়মের লঙ্ঘন

কোরআন মজীদের অলৌকিকতা অস্বীকারকারীরা বলে : যে গ্রন্থের বিকল্প কেউ রচনা করতে পারে না তা-ই যদি মু‘জিযাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয় তাহলে ‘ইউক্লিড’ ও ‘আল্-ম্যাজেস্ট্’ গ্রন্থদ্বয়ও মু‘জিযাহ্ রূপে গণ্য হওয়া উচিত, অথচ এ দু’টি গ্রন্থ মু‘জিযাহ্ নয়।

[Euclid - اقليدس খৃস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ। তাঁর জ্যামিতিক তত্ত্বগুলোর সংকলনও এ নামেই পরিচিত। আর الكتاب المجسطى (The Almagest) মিসরের

আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞানী টলেমী কর্তৃক খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত গণিতশাস্ত্র ও নক্ষত্র বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ।[

জবাব : প্রথমতঃ মানুষ উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের বিকল্প রচনায় অক্ষম নয়। এমনকি এ দু'টি গ্রন্থ এমন পর্যায়ের নয় যে, মানুষ এতদুভয়ের সামনে অক্ষমতায় নতজানু হবে; এমন সম্ভাবনাও কল্পনা করা যায় না। কারণ, সাম্প্রতিক যুগের জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতিবিদদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যারা নক্ষত্রবিজ্ঞান ও জ্যামিতির ওপরে লিখিত এ দু'টি গ্রন্থের তুলনায় উন্নততর, সহজতর ও উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ এ উভয় বিষয়ে রচনা করেছেন। বরং পূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পায় নি এমন অনেক বিষয়ে পরবর্তীকালীন বিভিন্ন গ্রন্থ সমৃদ্ধতর। ফলতঃ পরবর্তীকালীন অনেক গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থ দু'টির তুলনায় ে ষ্ঠতর ও পূর্ণতর।

স্মর্তব্য, উপরোক্ত গ্রন্থ দু'টির প্রণেতাদ্বয় সুদীর্ঘকালীন অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও অধ্যবসায়ের পর তাঁদের গ্রন্থ দু'টি রচনা করেছিলেন যা প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী কোনো অসাধ্য কাজ ছিলো না, কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) নিরক্ষর হয়েও এবং কোনো মানুষের কাছে জ্ঞানার্জন না করেও কোরআন মজীদের মতো মহাজ্ঞানময় গ্রন্থ উপস্থাপন করেন - যা প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত না হলে এ মহাগ্রন্থ উপস্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

দ্বিতীয়তঃ মু'জিযাহর জন্য আমরা যে সব শর্তের উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে, মু'জিযাহ্ চ্যালেঞ্জ সহকারে প্রদর্শিত হতে হবে এবং মু'জিযাহ্ প্রদর্শনকারীর নবুওয়াত্ বা অন্য কোনো খোদা- প্রদত্ত বিশেষ পদ লাভের দাবীর সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ হতে হবে।

মু'জিযাহর আরেকটি শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি প্রাকৃতিক বিধিবিধানের ব্যতিক্রমে সংঘটিত হতে হবে। (অলৌকিকতা সংক্রান্ত আলোচনার রুতে আমরা এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।) আর উল্লিখিত গ্রন্থ দু'টিতে এ সব শর্তের একটিও বিদ্যমান নেই।

সাত : কোরআনের চ্যালে   গ্রহণ না করার পক্ষে যুক্তি

কোরআন মজীদের বিরোধীরা বলে : আরবরা যে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ হয় নি এবং কোরআনের বিকল্প গ্রন্থ্ রচনা করে নি তা এ জন্য নয় যে, কোরআনের বিকল্প গ্রন্থ্ রচনায় তারা অক্ষম ছিলো। বরং কোরআনের বিরুদ্ধে আরবদের চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ না হওয়ার পিছনে অন্যবিধ কারণ ছিলো।

এ সব কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা তাদের রাসূলের যুগে ও খলীফাদের যুগে প্রভুত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলো। মুসলমানদের এ শক্তি ও ক্ষমতার ভয়ই মূর্তিপূজক আরবদেরকে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান ও অন্য যে কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন থেকে বিরত রেখেছিলো। কারণ, তারা জানতো যে, তারা যদি কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ হয় এবং কোরআনের বিকল্প গ্রন্থ্ রচনার প্রয়াস পায় তাহলে তাদের ওপরে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অপূরণীয় ক্ষতি ও বিপদ চেপে বসবে এবং তাদের জান ও মাল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অন্যদিকে চার খলীফাহর যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের শক্তি ও প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বানী উমাইয়ার হাতে চলে যায়। কিন্তু তখন একদিকে যেমন উমাইয়াহ্ খলীফাহরা ইসলামের দাও'আত বিস্তার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতো না, অন্যদিকে সাধারণ জনমনে কোরআনের শব্দাবলীর সৌন্দর্য এবং এর বলিষ্ঠতা ও অর্থপূর্ণ বক্তব্য দারুণ প্রভাব বিস্তার করে বসেছিলো, ফলে সকলেই কোরআন- প্রেমিকে পরিণত হয়েছিলো। কোরআনের শাব্দিক ও তাৎপর্যগত সৌন্দর্য মানুষের হৃদয়ে বিশেষভাবে স্থান করে নেয়। ফলে মানুষ কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং কোরআনের বিকল্প রচনার জন্য আর কেউ অগ্রসর হয় নি।

জবাব : এ আপত্তি কয়েক দিক থেকে দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য :

(১) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) এমন এক সময় মানুষকে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের ও তার বিকল্প রচনার আহবান জানান যখন তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং ঐ সময় ইসলামের শক্তি- ক্ষমতা ও শৌর্যবীর্যের কোনো নামগন্ধও ছিলো না। ইসলাম তখন কোনো ধরনের শক্তিরই অধিকারী ছিলো না। অন্যদিকে কোরআনের দুশমনরা শক্তি ও ক্ষমতার পুরোপুরি অধিকারী ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের অধিকারী আরবদের মধ্য থেকে একজন লোকও কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও তার অনুরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য অগ্রসর হয় নি।

(২) আপত্তিকারীরা যে ভয়- ভীতির কথা উল্লেখ করেছে, ইতিহাস সাক্ষী, এ ধরনের ভয়- ভীতির অস্তিত্ব কখনো ছিলো না। কাফের ও কোরআনে অবিশ্বাসী ব্যক্তি কোরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে তার কুফর্ ও শত্রুতা প্রকাশ করবে এবং কোরআনের অস্বীকৃতি ও স্বীয় ‘আক্বীদাহ্- বিশ্বাস প্রকাশ করবে - এর পথে আদৌ কোনো বাধা ছিলো না। কারণ, আরব উপদ্বীপে ও ইসলামী হুকুমতের অন্যান্য এলাকায় আহলে কিতাবরা মুসলমানদের মাঝে অত্যন্ত আরাম- আয়েশ ও নিরুদ্বেগ- নির্বিঘ্নতার মাঝে বসবাস করতো। তারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী ছিলো। বিশেষ করে আমীরুল মু‘মিনীন হযরত আলী (‘আঃ)- এর যুগে ন্যায়বিচার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং তাঁর ন্যায়বিচার, তাঁর মর্যাদা ও তাঁর জ্ঞানের বিষয় বন্ধু ও দুশমন নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করে থাকে।

উল্লিখিত যুগ সমূহে অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ও চার খলীফাহর যুগে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ সময় সামান্যতম ভয়ভীতিরও অস্তিত্ব ছিলো না। এ সময় কেউ যদি কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান ও এর বিকল্প উপস্থাপনে সক্ষম হতো তাহলে অবশ্যই সে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতো এবং তার প্রচেষ্টার ফসল লোকদেরকে প্রদর্শন করতো।

(৩) যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেই যে, ইসলামের বিরোধীদের জন্য ভয়ভীতির অস্তিত্ব ছিলো যা তাদেরকে প্রকাশ্যে কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা থেকে বিরত রেখেছিলো, সে

ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সময় গোপনে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ও এর বিকল্প রচনার পথে আহলে কিতাবদের সামনে কী বাধা বিদ্যমান ছিলো? তারা তো নিজেদের ঘরে এবং নিজস্ব বিশেষ বঠকে- সমাবেশে গোপনে হলেও কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ও এর বিকল্প রচনা করতে পারতো।

এরূপ ক্ষেত্রে স্বয়ং আহলে কিতাবের পণ্ডিত লোকেরা সে চ্যালেঞ্জ ও কোরআনের বিকল্পের হেফাযত করতে পারতো এবং পরবর্তীকালে কথিত 'বাধাবিঘ্ন' দূরীভূত হওয়া ও 'ভয়ভীতির যুগ' শেষ হয়ে যাবার পর তা প্রকাশ করতে পারতো। তারা যখন তাওরাত্ ও ইনজীল্ বলে দাবীকৃত পুস্তকগুলোর উদ্ভট ও গাঁজাখুরী কল্পকাহিনীগুলো হেফাযত করতে ও পরে তা প্রকাশ করতে পেরেছে, তখন সম্ভব হলে গোপনে কোরআনের বিকল্প রচনা, সংরক্ষণ ও পরে তা প্রকাশের পথে কোনোই বাধা ছিলো না। কিন্তু এরূপ কোনো পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে নি।

(৪) মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, পুনরাবৃত্তি যে কোনো জিনিসকেই তার কাছে বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর করে তোলে। কোনো বক্তব্য - তা বালাগ্বাতের বিচারে যতোই উচ্চতর মানের হোক না কেন, বার বার নলে ধীরে ধীরে তার সৌন্দর্য ও মিষ্টতার মাত্রা ে াতার কাছে কমে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছে তা একটি সাধারণ, বরং বাজে ও ক্লান্তিকর বক্তব্য বলে মনে হতে থাকে।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, মানুষ যদি কোনো সুন্দর- সুমধুর কবিতা বার বার শোনে তাহলে তার কাছে তা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, এমনকি অনেক সময় অতি পুনরাবৃত্তির ফলে তা কষ্টদায়ক ও ক্রোধ উদ্রেককারী হয়ে ওঠে। এ সময় যদি তার সামনে অন্য কোনো কবিতা পাঠ করা হয় তাহলে তা তার কাছে প্রথমোক্ত কবিতার তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়। কিন্তু বার বার পুনরাবৃত্তি করা হতে থাকলে এ দ্বিতীয়োক্ত কবিতাটিও শেষ পর্যন্ত প্রথমটির ন্যায় মনে হতে থাকে। এরপর ে াতার কাছে দু'টি কবিতার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

বস্তুতঃ মানুষের এ বচিত্র্যপিয়াসিতা ধু তার বর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের সমস্ত রকমের স্বাদ- আস্বাদন ও ভোগ- আনন্দের ক্ষেত্রেই, যেমন : খাদ্য, পোশাক ও অন্য সমস্ত কিছুতেই এ বিধি কার্যকর। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদ যদি মু'জিযাহ্ না হতো, তাহলে মানুষের বচিত্র্যপ্রিয়তা ও নতুনত্বপ্রিয়তার বিধি কোরআন মজীদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হতো এবং কালের প্রবাহে ও অতি পুনরাবৃত্তির ফলে ে াতার কাছে তা স্বীয় মিষ্টতা ও মাধুর্য হারিয়ে ফেলতো, বরং তা ে াতার কাছে বিরক্তিকর ও কষ্টকর বলে মনে হতো। আর তাহলে কোরআনকে মোকাবিলার জন্য তা- ই হতো সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, কোরআন মজীদের যতো বেশী পুনরাবৃত্তি করা হয় ততোই ে াতার কাছে তার সৌন্দর্য ও নতুনত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তেমনি কোরআন মজীদ যতো বেশী তেলাওয়াত্ করা হয় ততোই তেলাওয়াতকারীর আত্মা উর্ধতর জগতসমূহে আরোহণ করে এবং তার ঈমান- 'আক্বীদাহ্ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও মযবূত হয়।

অন্য সমস্ত রকমের কালামের বিপরীতে কোরআন মজীদের এই যে একান্ত নিজস্ব বশিষ্ট্য, তা কোরআনের অলৌকিকত্বকে ক্ষুণ্ন তো করেই না, বরং এ বশিষ্ট্যটি কোরআন মজীদের অলৌকিকত্বেরই অন্যতম অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শন।

(৫) যুক্তির খাতিরে যদি বিরোধীদের এ কথাকে মেনে নেই যে, কালের প্রবাহে ও পুনরাবৃত্তির ফলে মানুষ কোরআনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও তাদের এ অবস্থাই তাদেরকে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ থেকে বিরত রেখেছে, তাহলে এ কথা কেবল মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য হতে পারে যারা কোরআন মজীদকে আল্লাহর কালাম্ বলে বিশ্বাস করে - যে কারণে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তারা আগ্রহ সহকারে কোরআন বণ করবে, কিন্তু বালাগ্বাত্ ও ফাছাহাতের অধিকারী অমুসলিম আরবদের মধ্যেও পুনরাবৃত্তির ফলে কোরআনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে - এরূপ দাবী নেহায়েতই উদ্ভট ও অর্থহীন দাবী। এমতাবস্থায় তারা কেন কোরআনের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা থেকে বিরত থেকেছে এবং কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদানে ও এর বিকল্প রচনায় এগিয়ে

আসে নি? অথচ কোরআন মজীদের এ চ্যালেঞ্জ কোনো অমুসলিম লেখকের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করা হলেও তা গ্রহণযোগ্য হতো নিঃসন্দেহে।

আট : কোরআন মু'জিযাহ্ হলে সাক্ষ্যের প্রয়োজন হতো না

আপত্তিকারীরা আরো বলে : ইতিহাসে আছে, খলীফাহ্ হযরত আবূ বকর যখন কোরআন সংকলিত করতে চাইলেন, তখন হযরত ওমর বিন্ খাত্ত্বাব্ ও হযরত যায়েদ বিন্ ছাবেত্ আনছ্বারীকে এ মর্মে আদেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন মসজিদের দরযার পাশে বসেন এবং যে কোনো বক্তব্য কোরআনের আয়াত বলে দু'জন লোক সাক্ষ্য প্রদান করবে তা- ই লিপিবদ্ধ করে নেন। এভাবেই কোরআন সংকলিত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন কোনো মু'জিযাহ্ বা অসাধারণ বক্তব্য নয়। কারণ কোরআন যদি মু'জিযাহ্ হতো তাহলে তার এ অসাধারণত্বই তার অলৌকিকতা প্রমাণ করতো এবং তা সংকলনের ক্ষেত্রে এটাই ভিত্তিস্বরূপ হতো। সে ক্ষেত্রে অন্যদের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হতো না।

জবাব : এ আপত্তি বিভিন্ন দিক থেকে দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন। তা হচ্ছে :

(১) কোরআন মজীদের অলৌকিকতা তার বালাগ্বাত্- ফাছ্বাহাত্ ও সাহিত্যিক সৌন্দর্যে, আলাদা আলাদাভাবে একেকটি শব্দের মধ্যে নয় (যেহেতু এ শব্দগুলো তো মানুষের ভাষারই শব্দ এবং অন্যদেরও আয়ত্তযোগ্য)। এমতাবস্থায়, যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, দু'জন লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই কোরআন মজীদের আয়াত সমূহ সংগ্রহের কথা সত্য, তাহলে বলতে হয় যে, কোরআন সংকলনের সময় কিছু শব্দের কমবেশী হবার সম্ভাবনা থাকতো, ফলে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হতো; কমপক্ষে দু'জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের ফলে এ আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

(২) এছাড়া, মানুষ কোরআন মজীদের কোনো সূরাহর সমতুল্য সূরাহ্ রচনায় অক্ষম - এ কথার মানে এ নয় যে, কোরআন মজীদের কোনো বাক্যের সমতুল্য বাক্য বা কোনো আয়াতের বিকল্প আয়াত রচনায়ও অক্ষম হবে। বরং কোরআন মজীদের বাক্য বা আয়াতের সমতুল্য বাক্য বা আয়াত রচনা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং মুসলমানরাও একে অসম্ভব বলে দাবী করে নি।

তেমনি কোরআন মজীদও একটি আয়াত রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে নি, বরং কমপক্ষে একটি সূরাহ্ রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। অতএব, (দু'- দু'জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা যুক্তির খাতিরে সত্য ধরে নিলে) বিচ্ছিন্নভাবে জাল আয়াত তরী ও তা কোরআনের নামে চালিয়ে দেয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দু'- দু'জন লোকের সাক্ষ্য প্রয়োজন ছিলো।

(৩) কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, দু'- দু'জন ছ্বাহাবীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আয়াত লিপিবদ্ধ করে কোরআনের সংকলন করা হয়েছে বলে যে সব হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে সে সব হাদীছ মুতাওয়াতির্ নয়, বরং খবরে ওয়াহেদ। আর এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো মতেই খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা চলে না।

(৪) উক্ত হাদীছগুলো অপর কতগুলো হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক যাতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর জীবদ্দশায়ই সংকলিত হয়েছে, প্রথম খলীফাহ্ হযরত আবূ বকরের যুগে নয়। (অত্র গ্রন্থকারের কোরআনের পরিচয় গ্রন্থে এ বিষয়ে মোটামুটি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে অত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর জন্য এ বিষয়ে এখানে প্রদত্ত আভাসটুকুই যথেষ্ট বলে মনে হয়।)

অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর বহু সংখ্যক ছ্বাহাবী কোরআন মজীদ পুরোপুরি মুখস্ত করেছিলেন এবং কত লোক যে আংশিক মুখস্থ করেছিলেন তার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানে না। এমতাবস্থায় এবং কোরআন মজীদের এতো বিপুল সংখ্যক হাফেয্ (মুখস্তকারী)- এর বর্তমানে কোরআনের আয়াত প্রমাণের জন্য দু'- দু'জন করে লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে - এ কথা কোনো মতেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

এছাড়া বিচারবুদ্ধির দলীলের দ্বারাও, বিরোধীদের হাতের হাতিয়ার স্বরূপ উক্ত হাদীছ সমূহের অসত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ, কোরআন মজীদ হচ্ছে মুসলমানদের হেদায়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম যা তাদেরকে মূর্খতা ও দুর্ভাগ্যের অন্ধকার থেকে জ্ঞান, সৌভাগ্য ও সঠিক পথের আলোয় নিয়ে এসেছে। এ কারণে মুসলমানরা কোরআন মজীদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে অনুরাগী ছিলেন এবং একে সব কিছুর ওপরে গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা দিনরাত কোরআন অধ্যয়নে

মশগুল থাকতেন এবং কোরআনের আয়াতকে গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক মনে করতেন। তাঁরা কোরআনের আয়াত ও সূরাহর মাধ্যমে কল্যাণ হাসিলের চেষ্টা করতেন। আর এ সব ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)ও তাঁদেরকে পুরোপুরি উৎসাহিত করতেন।

এমতাবস্থায় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষ ধারণা করতে পারে কি যে, মুসলমানরা কোরআন মজীদের আয়াত সম্পর্কে সন্দেহ- সংশয়ে ভুগছিলেন - যা নিরসনের জন্য দু'জন দু'জন করে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো?

কোরআন মজীদের খোদায়ী ওয়াহী হওয়ার বিষয়টিকে কেউ স্বীকার করতে পারে, আবার কেউ স্বীকার না- ও করতে পারে। কিন্তু কোরআন মজীদ যে বর্তমানে যেভাবে প্রচলিত আছে ঠিক সেভাবেই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে - ইসলাম ও কোরআনের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল কোনো ব্যক্তির পক্ষেই তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দিহান হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখার বিষয় এই যে, কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগ থেকেই তিনি নিজে যেভাবে বিন্যস্তরূপে পড়েছেন ঠিক সে বিন্যাস সহকারে লিপিবদ্ধভাবে ও কণ্ঠস্থভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁর মুখের অন্যান্য বাণী - যা হাদীছ রূপে পরিগণিত - এভাবে সুবিন্যস্ত ও পুরোপুরি লিপিবদ্ধভাবে তাঁর যুগ থেকে চলে আসে নি। বরং বর্তমানে প্রচলিত হাদীছ গ্রন্থাবলী হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে রু করে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে। এভাবে রু থেকেই কোরআন ও হাদীছের মধ্যে গুরুত্ব প্রদানের দিক থেকে আসমান- যমীন পার্থক্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের সন্দেহাতীত অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। তা হচ্ছে :

প্রথমতঃ অসংখ্য হাদীছের সত্যাসত্য বা বক্তব্যের হুবহু অবস্থা সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও কোরআন মজীদের একটি শব্দের ব্যাপারেও মাযহাব্ ও ফিরক্বাহ্ নির্বিশেষে সামান্যতম মতপার্থক্যও নেই। এমনকি কোরআন মজীদের প্রতিটি সূরাহর রুতে 'বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম্' থাকা সত্ত্বেও সূরাহ্ আত্- তাওবাহর রুতে তা নেই এবং এ ব্যাপারে কোনো

মতপার্থক্য হয় নি। কারণ, যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ঐ সূরাহটি ‘বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম্’ সহযোগে রু করেন নি, সেহেতু কেউ বলে নি যে, এর রুতে ‘বিসমিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম্’ পড়া উচিত। তেমনি কতোগুলো সূরাহর রুতে কিছু বিচ্ছিন্ন হরফ (হুরূফে মুক্বাত্বত্বা‘আত) রয়েছে আরবী ভাষার অভিধান থেকে যার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব নয়। তথাপি কেউ এ বর্ণসমষ্টি বাদ দিয়ে ঐ সব সূরাহ্ পড়েন নি। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যখন ঐ বর্ণসমষ্টি সহকারে সংশ্লিষ্ট সূরাহগুলো পড়েছেন তখন তা বাদ দিয়ে পড়ার চিন্তা কেউ করেন নি।

কোরআন মজীদে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে ছ্বাহাবীগণের এ ধরনের সতর্কতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন মজীদকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যেভাবে পেশ করেছেন ঠিক সেভাবেই চলে আসছে; এতে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো লোক সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় দুইশ’ বছর পরে সংকলিত হাদীছ সমূহে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা কোরআন মজীদের প্রামাণ্যতাকে দুর্বলরূপে তুলে ধরে বা স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগে ও প্রথম খলীফাহর যুগে কোরআন মজীদ খুবই কম প্রচলিত ছিলো বলে প্রতিপন্ন করে (দু’জন দু’জন লোকের সাক্ষ্য দ্বারা কোরআনের আয়াত প্রমাণের দাবীর এ ছাড়া আর কী অর্থ হতে পারে?) , তাহলে সে সব হাদীছ যে ইসলামের দুশমনদের দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে রচিত ও মুসলিম সমাজে প্রক্ষিপ্ত তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকতে পারে না।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদের চেয়ে বহু গুণে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো মুতাওয়াতির্ হাদীছ যেখানে শত শত ছ্বাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কোরআন দু’জন দু’জন লোকের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল হবে এরূপ দাবী ধু উদ্ভটই নয়, বরং পাগলামির শামিল।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের সকল মাযহাব্ ও ফিরক্বাহর সূত্রে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছের ভিত্তিতে তাদের অভিন্ন মত এই যে, কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করার জন্য হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কয়েক জন ছ্বাহাবীকে লিপিকার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের কেউ না কেউ সব সময়ই তাঁর কাছে থাকতেন এবং কোনো আয়াত বা সূরাহ্ নাযিল্ হওয়ার সাথে সাথেই তা লিপিবদ্ধ করতেন।

নবী করীম (ছ্বাঃ) স্বয়ং কোরআন মজীদের তখন পর্যন্ত নাযিল্ হওয়া অংশের মধ্যে ঐ সময় নাযিল্ হওয়া আয়াত বা সূরাহ্টির অবস্থান জানিয়ে দিতেন এবং তিনি ও ছ্বাহাবীগণ এ বিন্যাসেই কোরআন তেলাওয়াত্ করতেন এবং সে বিন্যাসেই রামাযান মাসে নামাযে তা ধারাবাহিকভাবে পড়তেন। এভাবে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের আগেই পুরো কোরআন মজীদের লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলন সমাপ্ত হয়।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের মোটামুটি তিন মাস আগে বিখ্যাত বিদায় হজ্বের সময় কোরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত সমূহ নাযিল্ হয় এবং কোরআন নাযিল্ সমাপ্ত হয়। এ সময় তাঁর ছ্বাহাবীর সংখ্যা ছিলো লক্ষাধিক। এদের মধ্যে অনেকের কোরআন মজীদ পুরোপুরি মুখস্ত ছিলো এবং কারো কারো কাছে কোরআনের নিজস্ব কপি ছিলো।

এ পরিস্থিতিতে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর রেখে যাওয়া লিখিত কোরআন মজীদের উপস্থিতিতে হযরত আবূ বকরের পক্ষ থেকে নতুন করে কোরআন সংকলন করার এবং বহু সংখ্যক ছ্বাহাবীর কোরআন মজীদ মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও মাত্র দু'জন লোকের সাক্ষ্যকে কোরআনের আয়াত প্রমাণের জন্য মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তারপরও যদি তিনি এরূপ পদক্ষেপ নিতেন তাহলে অবশ্যই তিনি ছ্বাহাবীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতেন।

তৃতীয়তঃ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর রেখে যাওয়া কোরআন মজীদের সংকলন বিভিন্ন ধরনের ও আকৃতির বস্তুর ওপর লিখিত হয়েছিলো - এ কারণে হযরত আবুবকর যদি ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক একটি কপি তরী করতে চাইতেন তো হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর রেখে যাওয়া সংকলন থেকে হাল্কা ও অভিন্ন সাইজের তৎকালে প্রাপ্ত কাগজে কপি করাতেন - হযরত 'উছমান্ যেরূপ করিয়েছিলেন - এবং অন্যদের দ্বারা তা যাচাই করিয়ে নিতেন, নতুন সংকলন করার কাজে হাত দিতেন না; দিলেও প্রতিবাদের সম্মুখীন হতেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবুবকরের নির্দেশে কোরআন মজীদ সংকলিত হয় বলে যে সব হাদীছে উল্লিখিত রয়েছে সে সব হাদীছ পরবর্তীকালে রচিত মিথ্যা হাদীছ সমূহের অন্যতম।

নয় : কোরআন বালাগ্বাতে ভিন্ন রীতির অনুসারী

কোরআন মজীদের অলৌকিতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনকারীরা আরো বলে : কোরআন এক বিশেষ ও নিজস্ব সাহিত্যরীতির অনুসারী - যা আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্- এর নায়কগণ ও বাগ্মীদের অনুসৃত ও তাঁদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত রীতিসমূহ থেকে ভিন্নতর, বরং তার বিপরীত। কারণ, কোরআন বহু বিষয়কে একত্রে মি ত করেছে এবং যে কোনো সুযোগেই যে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। যেখানে ইতিহাস নিয়ে কথা বলেছে সেখানে সহসাই সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ককরণে প্রবৃত্ত হয়েছে অথবা জ্ঞানমূলক কথা বলেছে বা জ্ঞানমূলক উপমা প্রদান করেছে। কোরআন যদি বিভিন্ন সুবিন্যস্ত অধ্যায় ও বিভাগে বিভক্ত থাকতো এবং প্রতিটি অধ্যায়ে একেক ধরনের আয়াত সংকলিত হতো তাহলে তা অধিকতর উপকারী প্রমাণিত হতো এবং তা থেকে কল্যাণ হাছ্বিল্ সহজতর হতো।

জবাব : কোরআন মজীদ হেদায়াতের গ্রন্থ। মানুষকে পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের দিকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে এ গ্রন্থ নাযিল্ করা হয়েছে। কোরআন মজীদ ফিক্বহী, ঐতিহাসিক, আখলাক্বী বা এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ নয় যে, প্রতিটি বিষয় একেকটি অধ্যায়ে বর্ণিত হবে এবং বিষয়বস্তুকে এ নিয়মে বিন্যস্ত করা হবে।

এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই যে, কোরআন মজীদে যে সাহিত্যরীতি ও বিষয়বস্তু বিন্যাস অনুসৃত হয়েছে কেবল তা- ই এর লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম। কারণ, কেউ যদি কোরআন মজীদের মাত্র অল্প কয়েকটি সূরাহ্ও অধ্যয়ন করে, তাহলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এবং বলতে গেলে অনায়াসেই কোরআন মজীদের অনেক লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হতে পারে। একটি সূরাহ্ অধ্যয়ন করেই সে সৃষ্টির উৎস ও সূচনা এবং পরকাল ও পুনরুত্থানের প্রতি মনোসংযোগ করতে পারে, তেমনি অতীতের লোকদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে সে কাম্য ও উত্তম চরিত্র ও আচরণ এবং সমুন্নত জীবনধারা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে সৌভাগ্যবান হতে পারে। সাথে সাথে সেই একই সূরাহ্ থেকে সে তার করণীয় দায়িত্ব- কর্তব্য

এবং ‘ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে কোরআন মজীদের আদেশ-নিষেধের অংশবিশেষ জানতে পারে।

হ্যা, এতো সব বিষয় কেবল একটি সূরাহ্ থেকেই হাছ্বিল্ করা যেতে পারে। অথচ এ সত্ত্বেও কালামের বিন্যাসে কোনোরূপ দুর্বলতা সঞ্চারিত হয় নি, বরং সূরাহটির প্রতিটি অংশে ও স্তরেই বক্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য এবং গতিশীলতা ও বক্তব্যের ধাঁচের দাবী রক্ষিত হয়েছে, আর সমুন্নততম প্রাঞ্জল বাচনভঙ্গির দাবীও পূরণ হয়েছে।

এর পরিবর্তে কোরআন মজীদ যদি বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক অধ্যায়ে বিন্যস্ত হতো তাহলে তা থেকে এতো সব কল্যাণ হাছ্বিল্ সম্ভব হতো না এবং তা এতোখানি ফলপ্রসু হতো না। সে অবস্থায় পাঠক-পাঠিকারা কেবল পুরো কোরআন মজীদ অধ্যয়ন সাপেক্ষেই এর মহান ও সমুন্নত লক্ষ্যসমূহের সাথে পরিচিত হতে পারতো। কিন্তু এমনও হতে পারতো যে, পুরো কোরআন অধ্যয়নের পথে কেউ হয়তো কোনো বাধা বা সমস্যার সম্মুখীন হতো, ফলে পুরো কোরআন অধ্যয়ন করতে না পারায় সে কোরআন থেকে খুব সামান্যই কল্যাণ হাছ্বিল্ করতে পারতো।

সত্যি কথা বলতে কি, কোরআন মজীদের অনুসৃত বক্তব্য উপস্থাপন রীতির অন্যতম ৫ষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য এখানেই নিহিত - যা কোরআনকে বিশেষভাবে মাধুর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় করেছে। কোরআন মজীদ পরস্পরবিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিষয়কে পাশাপাশি বর্ণনা করা সত্ত্বেও তাকে এমনভাবে পেশ করেছে যে, এ সব বিষয়ের মধ্যে পুরোপুরিভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কোরআন মজীদের বাক্যসমূহ মহামূল্য মুক্তানিচয়ের ন্যায় বিশেষ বিন্যাস সহকারে পরস্পর পাশাপাশি গ্রথিত হয়েছে এবং এক বিস্ময়কর বিন্যাসপদ্ধতি অনুসরণে পরস্পর সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়েছে।

কিন্তু কী-ই বা করার আছে! ইসলামের অন্ধ দুশমনদের কাছে এটাও একটা আপত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে! অন্ধ দুশমনী তাদের চোখকে অন্ধ এবং তাদের কানকে বধির করে ফেলেছে। তাই সৌন্দর্য তাদের কাছে কুৎসিতরূপে প্রতিভাত হচ্ছে এবং পূর্ণতা তাদের কাছে ত্রুটি ও দুর্বলতা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও, কোরআন মজীদকে যদি বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হতো, তাহলে সে ক্ষেত্রে একটি সমস্যার সৃষ্টি হতো। তা হচ্ছে, কোরআন মজীদে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বিভিন্ন কারণে বিশেষ সামঞ্জস্য সহকারেই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু যে সব ঘটনা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তা যদি একটিমাত্র অধ্যায়ে সংকলিত হতো, সে ক্ষেত্রে যে সব উপলক্ষ্য নিয়ে এগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে তা অর্থহীন হয়ে পড়তো, বরং পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর বলে পরিগণিত হতো।

দশ : কোনো গ্রন্থেরই বিকল্প রচনা সম্ভব নয়

কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারকারীদের অনেকে "কোরআন মজীদের অনুরূপ অর্থাৎ সম মানের বিকল্প গ্রন্থ বা এর কোনো সূরাহর সম মানের বা বিকল্প কোনো সূরাহ্ রচনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়" - এ দাবীর জবাবে বলে : ধু কোরআনই নয়, বরং কোনো গ্রন্থেরই সম মান সম্পন্ন বা বিকল্প গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। যদি উপস্থাপিত গ্রন্থের কিছু শব্দের রদবদল করে বিকল্প গ্রন্থ রচনা করা হয় তাহলে তা কোনো মৌলিক গ্রন্থ হবে না, বরং তা হবে উপস্থাপিত গ্রন্থের অনুসৃতি মাত্র এবং অনুসৃতি হবার কারণেই তা দুর্বল মানের বলে প্রতিপন্ন হবে। অন্যথায় তা হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ - যাকে উপস্থাপিত প্রথমোক্ত গ্রন্থের সাথে তুলনা করে তার মান বিচার করা যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে না। উদাহরণস্বরূপ : কেউ যদি গীতাঞ্জলির বিকল্প রচনা করতে চায় তাহলে তা হবে অনেকটা গীতাঞ্জলির প্যারোডির ন্যায় - যা কোনো মৌলিক কাব্যগ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে না এবং গীতাঞ্জলির অনুসৃতির কারণেই মানের দিক থেকে দুর্বল বলে পরিগণিত হবে। নয়তো তা গীতাঞ্জলি থেকে এমনই পার্থক্যের অধিকারী হবে যে, দু'টি গ্রন্থের মধ্যে তুলনা ও বিচার করা চলবে না। কারণ, তা গীতাঞ্জলির তুলনায় উন্নততর মানেরই হোক বা নিম্নতর মানেরই হোক, তা গীতাঞ্জলির বিকল্পরূপে পরিগণিত হবে না।

জবাব : কোনো গ্রন্থের বিকল্প রচনার মানে এ নয় যে, ঐ গ্রন্থের বাক্যগঠন প্রণালী, ব্যবহৃত শব্দাবলী, রচনারীতি, (কবিতার ক্ষেত্রে) ছন্দ ও মাত্রা ইত্যাদি হুবহু অনুসৃত হতে হবে। বরং ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বলিত গ্রন্থ নিজস্ব ধাঁচে বাক্যগঠন, শব্দ চয়ন ও প্রয়োগ, (কবিতার ক্ষেত্রে) ছন্দ ও মাত্রা এবং ভিন্ন ধরনের রচনারীতি ব্যবহারের মাধ্যমে রচনা করা যায়। সে ক্ষেত্রে সাহিত্যরসিকগণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞগণ বিচার করে বলতে পারবেন একই বিষয়বস্তুর ওপরে রচিত দু'টি গ্রন্থের মধ্যে কোনটি বিষয়বস্তুর উন্নততর উপস্থাপনে অধিকতর সফল এবং বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ উপমা ইত্যাদির ক্ষেত্রে (ভিন্নতা সত্ত্বেও) কোনটি অধিকতর শক্তিশালী। এটা যেমন একই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'টি গ্রন্থের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি দু'টি প্রবন্ধ বা দু'টি কবিতার ক্ষেত্রেও সত্য।

এ প্রসঙ্গে বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাগণ পরিচিত এমন দু'টি বাংলা কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই। ক্ষুধার প্রভাব সম্পর্কে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছেন :

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

একই বিষয়ে কবি রফিক আজাদ লিখেছেন :

"ভাত দে হারামজাদা
নইলে মানচিত্র খাবো।"

ক্ষুধা সম্পর্কে এ দু'টি উদ্ধৃতি বাংলা কবিতার জগতে নিঃসন্দেহে ে ষ্ঠতম উদ্ধৃতি। দু'টি উদ্ধৃতির বিষয়বস্তু অভিন্ন, তা হচ্ছে "ক্ষুধা"। কিন্তু দু'টি উদ্ধৃতিতে একটি শব্দেরও মিল নেই, ছন্দেরও মিল নেই। তা সত্ত্বেও উভয় উদ্ধৃতিতেই ক্ষুধার তীব্রতা ও প্রভাব অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ দু'টি কবিতাংশের মধ্যে এতো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের বিচারকদের পক্ষে উভয় উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে রায় দেয়া সম্ভব যে, ক্ষুধার যন্ত্রণার তীব্রতা, গভীরতা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিস্ফূটনের দিক থেকে এবং সেই সাথে সাহিত্যিক মানের বিচারে কোন্ কবিতাংশটি অধিকতর সফল।

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতাও এর অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখার মধ্যে মান বিচার করে ে ষ্ঠতম রচনা নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অন্যতম পূর্বশর্ত থাকে এই যে, একই বিষয়ে পূর্ব থেকে বিদ্যমান কোনো রচনার নকল বা অনুসরণ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও পূর্ব থেকে বিদ্যমান রচনা অধ্যয়ন করে তা থেকে সাহায্য নেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সুদক্ষ লেখক পূর্ব থেকে বিদ্যমান ে ষ্ঠ রচনাবলীর তুলনায়ও উন্নততর রচনা উপস্থাপনে সক্ষম হন। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী রচনাবলী অধ্যয়ন করে তার দুর্বল দিকগুলো উদঘাটন করার এবং স্বীয় রচনাকে তা থেকে মুক্ত রাখার সুযোগ পান।

এভাবে একই বিষয়ের ওপরে কয়েক জন কবি, সাহিত্যিক বা লেখকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি কবিতা, বা প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব যা বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং ভাষাগত ও সাহিত্যিক মানের দিক থেকে পরস্পরের সাথে তুলনাযোগ্য হবে। এমনকি এ ধরনের লেখা বিভিন্ন ভাষায় লেখা হলেও পরস্পর তুলনাযোগ্য হতে পারে এবং এ ধরনের তুলনা প্রচলিত আছে। সুতরাং কোরআনের বিরোধীদের উত্থাপিত ট যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাপক বিষয়বস্তুর ওপরে আলোচনা করেছে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, সংজ্ঞা, পরিচয় ও শক্তি- ক্ষমতা, পরকালীন জীবন ও বেহেশত- দোযখ, নবুওয়াত, নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) দাও‘আত ও আন্দোলনের ইতিহাস, চরিত্র ও নতিকতা, ‘ইবাদত- বন্দেগী, আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল, বিচার, আইন, যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধি, অঙ্গীকার ও চুক্তি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রচারপদ্ধতি ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। সেই সাথে শব্দচয়ন, শব্দপ্রয়োগ, বাক্যগঠন, বাক্যসমূহের পারস্পরিক বিন্যাস, সুর ও ঝঙ্কার ইত্যাদি সব মিলিয়ে কোরআন মজীদ এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী।

বলা বাহুল্য যে, এতোগুলো দিক বজায় রেখে কোনো গ্রন্থ রচনা করা বা মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদের কোনো সূরাহর অনুরূপ সূরাহ্ রচনা করা মানবীয় শক্তি- প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলাম- বিরোধী আরব কবি- সাহিত্যিক, বাগ্মী ও বাচনশিল্পীরা কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হন নি। বস্তুতঃ কোরআন মজীদ কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ হলে তার বশিষ্ট্য এহেন সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী হতো না, ফলে কোরআন- বিরোধীদের পক্ষে এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও এ গ্রন্থের বিকল্প রচনা করা সম্ভব হতো।

আর এই সাথে এ কথাটি আবারো স্মরণ করা প্রয়োজন যে, এহেন বশিষ্ট্যের অধিকারী কোরআন মজীদ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে সম্মিলিত সাধনায় যার একটি সূরাহর বিকল্প উপস্থাপন করা সম্ভব নয় সে মহাগ্রন্থ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষ থেকে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় কি?

কোরআনের চ্যালে   গ্রহণ (!)

হুসনুল্ ঈজা়ায্ (حسن الايجاز) নামক পুস্তিকার লেখক বলেন : "কোরআনের প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং কোরআনের অনুরূপ বা বিকল্প গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।" [জনৈক খৃস্টান লেখক কর্তৃক লিখিত এ পুস্তিকাটি ১৯১২ খৃস্টাব্দে মিসরের বুলাক্ (নীল নদের তীরবর্তী কায়রোর বন্দর) থেকে প্রকাশিত হয়।]

পুস্তিকার লেখক তাঁর দাবীর সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ স্বয়ং কোরআন মজীদেরই কিছু বাক্য গ্রহণ করে তার কিছু শব্দ রদবদল করে উপস্থাপন করেছেন। আসলে এভাবে তিনি তাঁর জ্ঞানের দৌড়কেই তুলে ধরেছেন এবং আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ সম্পর্কে তাঁর কতোখানি ধারণা আছে তা- ও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

লেখক কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও এ মহাগ্রন্থের বিকল্প উপস্থাপনের নামে যা পেশ করেছেন আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করবো,   অতঃপর তাঁর লেখার দুর্বলতা সমূহ অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরবো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে,   মরহূম্ 'আল্লামাহ্ খূয়ী লিখিত নুফহাতুল্ ঈজা়ায্"(نفحات الايجاز)   নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করছি। [হুসনুল্ ঈজা়ায্ (حسن الايجاز) পুস্তিকার জবাবে 'আল্লামাহ্ খূয়ী (রহ্ঃ)- এর লেখা এ পুস্তকখানি ইরাকের নাজাফ শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।]

সূরাহ্ ফাতেহার বিকল্প !

কল্পনাবিলাসী উক্ত লেখক সূরাহ্ ফাতেহার বিকল্প রচনার নামে লিখেছেন :

الحمد للرحمان. رب الاكوان. الملک الديان. لک العبادة و بک المستعان. اهدنا صراط الايمان.

“সমস্ত প্রশংসা পরম দয়াবানের যিনি সৃষ্টিসমূহের প্রভু ও প্রতিদান প্রদানকারী বাদশাহ। উপাসনা ও দাসত্ব তোমার জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনা তোমার কাছে। আমাদেরকে ঈমানের পথে পরিচালিত করো।”

লেখক স্বীয় কল্পনাবিলাসিতার কারণে ধারণা করেছেন যে, তাঁর উপস্থাপিত এ বাক্যগুলোতে সূরাহ্ ফাতেহার সমস্ত দিক ও সমগ্র তাৎপর্য শামিল রয়েছে, অথচ সূরাহ্ আল্- ফাতেহাহ্ থেকে তা সংক্ষিপ্ততর।

যে লেখক দুর্বল ও নিম্ন মানের লেখা এবং তাৎপর্যপূর্ণ ও ভারী উঁচু মানের লেখার মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এমনই সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ বিচারশক্তির অধিকারী তাঁর সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে! তাঁর জন্য তো এটাই উত্তম ছিলো যে, প্রকাশের পূর্বে তিনি তাঁর লেখাটি আরবী ভাষার সাহিত্যরীতি ও বালাগ্বাত্- ফাছ্বাহাতের সাথে পরিচিত খৃস্টান পণ্ডিতদেরকে দেখাতেন এবং নিজেকে এভাবে খেলো প্রমাণ না করতেন।

তিনি এ ন্যূনতম বিষয়টিও লক্ষ্য করেন নি যে, কোনো কবি বা কোনো লেখক যদি অন্য কারো কোনো লেখার বিকল্প উপস্থাপন করতে চান, সে ক্ষেত্রে তাঁকে এমন লেখা উপস্থাপন করতে হয় যা শব্দচয়ন, বাক্যগঠন ও সাহিত্যের আঙ্গিকতার দিক থেকে হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিজস্ব; দু’টি লেখার মধ্যে কেবল একটি দিক থেকে মিল ও অভিন্নতা থাকবে। তা হচ্ছে, উভয় লেখার লক্ষ্য বা মূল আবেদন তথা বিষয়বস্তু হবে অভিন্ন।

কোনো লেখককে চ্যালেঞ্জ করা বা তাঁর লেখার বিকল্প উপস্থাপনের মানে এ নয় যে, বিকল্প উপস্থাপনকারী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের লেখার বাক্যগঠন ও সাহিত্যরীতির অনুসরণ করবেন এবং প্রতিপক্ষের লেখার কিছু শব্দ পরিবর্তন করে একটি নতুন (?!) লেখা তরী করবেন, আর এ কাজকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ বা বিকল্প উপস্থাপন হিসেবে নামকরণ করবেন।

এটাই যদি হয় চ্যালেঞ্জ বা বিকল্প উপস্থাপন তাহলে যে কোনো কালামকেই চ্যালেঞ্জ করা ও তার বিকল্প উপস্থাপন করা সম্ভব। আর তাহলে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সমসাময়িক যে কোনো আরবের পক্ষেই কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও বিকল্প উপস্থাপন করা সম্ভব

ছিলো। কিন্তু যেহেতু তারা কোনো কালামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও বিকল্প উপস্থাপনের তাৎপর্য ভালোভাবেই অবগত ছিলো এবং কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের রহস্যাবলী প্রত্যক্ষ করছিলো, এ কারণেই তারা কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অগ্রসর হয় নি এবং এর সামনে তাদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে একদল কোরআন মজীদের ওপর ঈমান আনয়ন করে ও অপর একদল একে জাদু বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে:

(ان هذا الا سحر يوثر.)

"(তারা বলে :) এ তো জাদু ছাড়া কিছু নয় - যা তাকে শিক্ষা দেয়া হয়।" (সূরাহ্ আল্-মুদ্দাছছির্ : ২৪)

এছাড়া, আলোচ্য লেখকের উদ্ধৃত বাক্যগুলোতে যেখানে নকল ও কৃত্রিমতা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ছে, সেখানে কী করে একে সূরাহ্ ফাতেহার সাথে তুলনাযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে? পুস্তিকাটির লেখক যে আরবী ভাষার বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ তা কি তিনি সূরাহ্ ফাতেহার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও বিকল্প রচনার দাবী করে ও উক্ত বাক্যসমূহ সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন নি?

এবারে লেখকের লেখার দুর্বল দিকসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক :

(১) লেখকের রচিত বাক্য الحمد للرحمان. (সমস্ত প্রশংসা পরম দয়াবানের) এবং সূরাহ্ ফাতেহার বাক্য الحمد لله (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) - এ দু'টি বাক্যকে অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে কী করে অভিন্ন পর্যায়ের বলা যেতে পারে? কারণ, "আল্লাহ্" হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার পরম প্রমুক্ত সত্তার সত্তাগত নাম যাতে তাঁর সমস্ত রকমের গুণ- বশিষ্ট্য ও পূর্ণতা শামিল রয়েছে; "রাহ্মান্" (পরম দয়াবান) তাঁর এ সব গুণ- বশিষ্ট্যের অন্যতম "রহমত" (দয়া)- এর পরিচায়ক গুণবাচক নাম মাত্র। অতএব, الحمد لله (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বাক্যটিতে প্রশংসার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত রকমের পূর্ণতাবাচক গুণ- বশিষ্ট্য। কিন্তু الحمد للرحمان. (সমস্ত প্রশংসা পরম

দয়াবানের) বাক্যটিতে প্রশংসার লক্ষ্য হচ্ছে ধু তাঁর "রহমত" বা দয়া। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য গুণ- বশিষ্ট্য প্রশংসার মধ্যে শামিল নেই।

(২) সূরাহ্ ফাতেহার رب العالمين. الرحمان الرحيم. (যিনি জগতসমূহের প্রভু - যে প্রভু পরম দয়াবান ও মেহেরবান) কথাটির মোকাবিলায় رب الاكوان. (যিনি সৃষ্টি সমূহের প্রভু) বাক্যটি খুবই দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ ও অসংহত। সূরাহ্ ফাতেহার বাক্যটির তাৎপর্য ও লক্ষ্য কোনোটিই এতে প্রতিফলিত হয় নি। কারণ, সূরাহ্ ফাতেহার উক্ত বাক্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, জগত মাত্র একটি নয়, বরং বহু সংখ্যক জগত রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত জগতের প্রভু ও পরিচালক। তেমনি তাঁর রহমত (দয়া) সব সময়ের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সমস্ত জগতকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। কী করে رب الاكوان. (যিনি সৃষ্টিসমূহের প্রভু) বাক্যটিকে সূরাহ্ ফাতেহার উক্ত বাক্যের সাথে তুলনা করা যেতে পারে? কারণ, كون শব্দের (যার বহুবচন হচ্ছে اكوان) মানে হচ্ছে حدوث (ঘটনা) ও وقوع (সংঘটিত হওয়া)। (এছাড়াও كون শব্দটির আরো অর্থ আছে, যেমন : প্রত্যাবর্তন, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, স্থিতি ইত্যাদি।)

তাছাড়া اكوان হচ্ছে كون - এর বহু বচন যা একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (مصدر) যার প্রকৃত অর্থ 'হওয়া' বা 'থাকা' (স্থিতিবাচক ক্রিয়ানাম - ইংরেজীতে যাকে Be Verb বলা হয়।) একে رب শব্দের সাথে যুক্তকরণ আরবী সাহিত্যের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য رب- এর পরিবর্তে যদি خالق শব্দটি ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ خالق الاكوان বলা হতো, তাহলে আরবী সাহিত্যরীতি অনুযায়ী তা সিদ্ধ হতো, কিন্তু লেখক তা করেন নি; হয়তোবা লেখকের এটা জানাও ছিলো না। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও স্বয়ং اكوان শব্দের দুর্বলতা থেকেই যেতো। কারণ, اكوان শব্দ দ্বারা জগতের বহুত্বও যেমন বুঝানো যায় না, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত যে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত তা- ও বুঝানো সম্ভব নয়।

(৩) সূরাহ্ ফাতেহাহর مالک يوم الدين (প্রতিফল দিবসের অধিকর্তা) কথাটিকে الملک الديان (প্রতিদান প্রদানকারী বাদশাহ)- তে পরিবর্তিত করায় তাতে সূরাহ্ ফাতেহার কথাটির তাৎপর্য ও লক্ষ্য- উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সূরাহ্ ফাতেহার কথাটির মানে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিফল দিবসের একমাত্র অধিকর্তা ও বাদশাহ্। কিন্তু লেখকের বাক্যটিতে আল্লাহ্ হচ্ছেন প্রতিদান বা প্রতিফল প্রদানকারী বাদশাহ্। এতে তাঁকে একমাত্র প্রতিফলদাতা বলা হয় নি।

তাছাড়া সূরাহ্ ফাতেহার আয়াতে যেখানে প্রতিফল দানের জন্য অপর একটি জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে লেখকের কথাটিতে তার প্রতি বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও নেই। ফলে পুনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের একমাত্র অধিকর্তা, বাদশাহ্ ও বিচারক যে আল্লাহ্ তা'আলা এবং ঐ দিন যে অন্য কারো বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা বা এখতিয়ার থাকবে না তা- ও তাঁর কথা থেকে বোঝার উপায় নেই।

সূরাহ্ ফাতেহার আয়াতে এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, প্রতিফল দিবসের একমাত্র ও একক অধিকর্তা, হুকুমদাতা, বিচারক ও পরিচালক আল্লাহ্ তা'আলা; তিনি একাই প্রতিটি ব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণকারী থাকবেন, আর তাঁর বিচারের পরিণতিতে কিছু লোক বেহেশতে যাবে ও কিছু লোক দোযখে যাবে। কিন্তু লেখকের বাক্যে 'প্রতিফল দিবস' উল্লেখ না থাকায় এবং বাক্যগঠনের পার্থক্যের কারণে, আল্লাহ্ তা'আলা 'একমাত্র প্রতিফলদাতা বাদশাহ্' রূপে প্রতিভাত না হওয়ায় উল্লিখিত তাৎপর্য সমূহও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

বস্তুতঃ الملک الديان কথাটিতে مالک يوم الدين আয়াতের এ ব্যাপক তাৎপর্যের একটিও অন্তর্ভুক্ত হয় নি। উল্লিখিত কথাটিতে একমাত্র যে তাৎপর্যটি প্রতিফলিত হয়েছে তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিফলদানকারী মালিক ও বাদশাহ্ - যিনি মানুষের কাজের প্রতিফল প্রদান করে থাকেন। আর এ তাৎপর্য ও সূরাহ্ ফাতেহার উক্ত আয়াতের তাৎপর্যের মধ্যে আকাশ- পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান।

এছাড়া সূরাহ্ ফাতেহার আয়াতটিতে مالک یوم الدین কথাটি সম্বন্ধবাচক। যেমন, যদি বলা হয় : 'অমুক ব্যক্তি এই বাড়ীর মালিক', তাহলে এর মধ্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে, অন্য কেউ এ বাড়ীর মালিকানায় অংশীদার নয়। কিন্তু হুসনুল্ ঈজায্ (حسن الایجاز) পুস্তিকার লেখকের الملک الدیان কথাটি গুণবাচক। যেমন, যদি বলা হয় : 'অমুক ব্যক্তি বাড়ীওয়ালা', তাহলে এর মানে এ নয় যে, সে ছাড়া আর কোনো বাড়ীওয়ালা নেই। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলাকে مالک یوم الدین (প্রতিফল দিবসের অধিকর্তা) বলার মানে হচ্ছে 'প্রতিফল দিবসের ওপর আর কোনো অধিকর্তা ও বাদশাহ্ নেই।' কিন্তু আল্লাহকে الملک الدیان (প্রতিদান প্রদানকারী বাদশাহ) বলার মানে হচ্ছে, 'আল্লাহ্ প্রতিফলদাতা মালিক ও বাদশাহ্, তবে প্রতিদানকারী মালিক ও বাদশাহ্ আরো থাকতে পারেন।'

(৪) সূরাহ্ ফাতেহার আয়াত ایاک نعبد و ایاک نستعین. (আমরা কেবল তোমারই উপাসনা ও দাসত্ব- আনুগত্য করি এবং আমরা কেবল তোমার কাছেই সাহায্য চাই) থেকে লেখক ধু বুঝেছেন যে, উপাসনা ও দাসত্ব ধু আল্লাহরই হওয়া উচিত এবং সাহায্যপ্রার্থনাও কেবল আল্লাহর কাছেই হওয়া উচিত। এ কারণেই তিনি উক্ত আয়াতকে সামান্য রদবদল করে লিখেছেন : لک العبادة و بک المستعان. (উপাসনা ও দাসত্ব তোমার জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনা তোমার কাছে)।

কিন্তু এ সত্যের পাশাপাশি উক্ত আয়াতে আরো যে সত্য নিহিত রয়েছে লেখক তা বুঝতে পারেন নি। তা হচ্ছে, এ আয়াত আল্লাহর বান্দাহদেরকে এ শিক্ষা প্রদান করছে যে, তারা যেন তাদের 'ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্য দিয়ে তাওহীদকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা ধু আল্লাহরই 'ইবাদত ও দাসত্ব- আনুগত্য করে থাকে এবং ইবাদত- উপাসনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা ধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

এ আয়াতের দাবী হচ্ছে এই যে, মু'মিন বান্দাহ্ এ সত্যটি স্বীকার করুক যে, সে এবং অন্য সমস্ত মু'মিন বান্দাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো 'ইবাদত- উপাসনা ও আনুগত্য করে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে না, বরং ধু আল্লাহরই 'ইবাদত ও আনুগত্য করে এবং ধু আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু উক্ত লেখকের বক্তব্য لک العبادة و بک المستعان. (উপাসনা ও দাসত্ব তোমার জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনা তোমার কাছে) বাক্যে কি এ ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে?

অধিকন্তু লেখকের বাক্যটিতে কেবল এ ঘোষণা আছে যে, 'ইবাদত ও দাসত্ব- আনুগত্য এবং সাহায্য প্রার্থনা পাওয়ার একমাত্র হক্বদার আল্লাহ তা'আলা, কিন্তু বান্দাহ্ নিজে একমাত্র তাঁর 'ইবাদত ও দাসত্ব- আনুগত্য করে কিনা এবং একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চায় কিনা সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য নেই যা সূরাহ্ ফাতেহার আয়াতে রয়েছে। তাছাড়া কোরআন মজীদের আয়াতটিতে বান্দাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে ভবিষ্যতে একমাত্র তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব- আনুগত্য করার এবং একমাত্র তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার যে অঙ্গীকার বা আশাবাদ নিহিত আছে উক্ত লেখকের বাক্যটিতে তা নেই।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেকে এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো ধরনের সাহায্য চাওয়া বুঝি আদৌ বধ নয়। বরং এ আয়াতে 'ইবাদত বলতে যা বুঝানো হয়েছে তার মধ্যে উপাসনা কেবল আল্লাহরই জন্য - এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু 'দাসত্ব' ও 'আনুগত্য' আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম- আহকামের আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে অন্যের জন্যও অবৈধ নয়। এ কারণেই কোরআন মজীদে দাস- দাসীদের সাথে মনিবের সম্পর্ক এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ছ্বাঃ) আনুগত্যের অধীনে "উলীল্ আমর্" (কর্মদায়িত্বশীল)- এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, সূরাহ্ ফাতেহার এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মনিব ও কর্মদায়িত্বশীলদের

আনুগত্যের ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ছ্বাঃ) আনুগত্যের লঙ্ঘন হলে মনিব ও কর্মদায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা যাবে না, তাতে যে কোনো পরিণতিই আসুক না কেন।

অন্যদিকে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ এ নয় যে, স্বাভাবিকভাবে মানুষ একে অন্যের কাছে বা পরস্পর যে সাহায্য চায় তা বৈধ নয়। কারণ, কোরআন মজীদেও নেক আমল ও তাক্ওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরাহ্ আল্-মাঃএদাহ্ : ২) কিন্তু বান্দাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কখনোই এমন মানসিকতা পোষণ করা বৈধ নয় যে, যে ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সে নিরঙ্কুশভাবে ও অনন্যমুখাপেক্ষী হিসেবে সাহায্য করতে সক্ষম এবং এরূপ মনে করাও বৈধ নয় যে, ঐ ব্যক্তি সাহায্য না করলে তার সমস্যা সমাধানের বা বিপদমুক্তির আর কোনো পথই ছিলো না বা থাকবে না। বরং স্মরণ রাখতে হবে যে, বান্দাহর জন্য বান্দাহর সাহায্যও আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট কার্যকারণ বিধি ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনুগ্রহের অংশবিশেষ এবং আল্লাহ্ না চাইলে ঐ ব্যক্তি তাকে সাহায্য করতে পারতো না বা করতো না অথবা সে সাহায্য না করলেও আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তার সাহায্য ও বিপদমুক্তির জন্য অন্য কোনো পথ বের করে দিতেন।

এ হচ্ছে এ আয়াত থেকে মুসলমানদের জন্য সাধারণ কর্মনির্দেশনা। মুসলমানদেরকে আমলের ক্ষেত্রে এ আয়াতের এ কর্মনির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ এটা হবে সর্বোচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু আল্লাহর খাছ্ব বান্দাহগণ ছাড়া সাধারণতঃ কেউ এ কর্মনির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে না, বরং কখনো কখনো এ থেকে বিচ্যুত হয়, বিশেষ করে প্রবৃত্তির আনুগত্য করে ছোট- বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা যতোই না পরে তা থেকে তাওবাহ্ ও ইস্তিগ্বফার্ করুক। তাছাড়া অনেক সময় আমরা অন্যের সাহায্য চাইতে গিয়ে মনে করি যে, ঐ ব্যক্তি সাহায্য না করলে আমাদের এ সমস্যা সমাধানের কোনোই পথ নেই। এরূপ মনে করা প্রচ্ছন্ন শিরক্।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের বিচ্যুতির অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে এ সাক্ষ্য দেয়া উচিত কিনা যে, "আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব ও আনুগত্য করি এবং আমরা কেবল তোমার

কাছেই সাহায্য চাই।”? কারণ, এরূপ সাক্ষ্য সুস্পষ্টতঃই মিথ্যা। আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দান অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। অথচ নামাযে সূরাহ্ ফাতেহাহ্ পাঠ করা অপরিহার্য; সূরাহ্ ফাতেহাহ্ পাঠ ছাড়া নামায ছ্বহীহ্ হয় না। এমতাবস্থায় কী করণীয়? কোনো কোনো ‘আারেফ মুফাসসিরের অভিমত হচ্ছে এই যে, পুরো সূরাহ্ ফাতেহাহ্, বা অন্ততঃ উক্ত আয়াতটিকে নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে সাক্ষ্য হিসেবে উচ্চারণ করা ঠিক হবে না, বরং কোরআন মজীদের আয়াত পাঠ করার নিয়তে পড়তে হবে, যতোদিন না নিজেকে উক্ত আয়াতের দিকনির্দেশনার বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করা যায়। আল্লাহর খাছ্ব বান্দাহগণ - যাদের আমল উক্ত আয়াতের দিকনির্দেশনার বিচ্যুতি থেকে মুক্ত তাঁরা পুরো সূরাহ্ ফাতেহাকে আল্লাহর সামনে নিজের বক্তব্য হিসেবে পাঠ করে থাকেন। আর নিজেকে এ স্তরে উপনীত করাই হওয়া উচিত বান্দাহ্র সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

আলোচ্য আয়াত কেবল বান্দাহর নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্যই নির্দেশ করে না, বরং ভবিষ্যত সম্পর্কে অঙ্গীকারও নির্দেশ করে। কারণ, এখানে مضارع ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে যা বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয়কেই বুঝায়। আর ব্যক্তি যখন নিজে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করবে বলে ঘোষণা করে তখন তা কেবল সম্ভাবনাকে বুঝায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গীকারকেও বুঝায় এবং এ আয়াতে অঙ্গীকার অর্থই প্রযোজ্য; তবে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এটিকে আশাবাদ অর্থেও গণ্য করা চলে।

(৫) সূরাহ্ ফাতেহার اهدنا الصراط المستقيم (আমাদেরকে সহজ- সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও মধ্যম পথে পরিচালিত করো) আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, বান্দাহ্ তার ‘ইবাদত- উপাসনার মাধ্যমে স্বীয় উপাস্যের নিকট এ মর্মে প্রার্থনা জানাবে যে, তিনি যেন স্বীয় বান্দাহকে সংক্ষিপ্ততম ও সহজতম পথে লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। তেমনি এতে এ- ও শামিল রয়েছে যে, তিনি যেন তাকে সৎকর্মসমূহ, সদগুণাবলী ও সঠিক ‘আক্বেএদের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। এ আয়াত ধু

ঈমানের পথে পরিচালিত করার আবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। কিন্তু اهدنا صراط الايمان.

(আমাদেরকে ঈমানের পথে পরিচালিত করো) বাক্যে এ তাৎপর্য অন্তর্ভুক্ত নেই।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। তা হচ্ছে, সূরাহ্ ফাতেহাহ্ পড়লে এটা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ সূরাহটি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সপ্রশংস দো'আ স্বরূপ। অতএব, ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষ থেকে 'ঈমানের পথে' পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করা খুব বেশী খাপ খায় না।

অবশ্য 'ঈমানের পথ' বলতে যদি ঈমানের সাথে সঙ্গতিশীল পথ বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তাতে কোনো অসঙ্গতি নেই - এটা স্বীকার করতে হবে। তবে 'ঈমানের পথ' কথাটির এ অর্থ কথাটির পরোক্ষ ও আরোপিত অর্থ, স্বতঃপ্রকাশিত অর্থ নয়। অর্থাৎ কথাটি শোনার সাথে সাথেই ে াতার মনে বিষয়টি এভাবে রেখাপাত করবে না, বরং প্রথমেই মনে হবে যে, ঈমানে উপনীত হবার পথের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে; তদনুযায়ী চলার পথ প্রার্থনার বিষয়টি প্রথমেই ে াতার মনে রেখাপাত করবে না। এর পরিবর্তে ঈমানদার ব্যক্তি তাকে 'ছ্বিরাতুল্ মুস্তাক্বীম্' বা সহজ-সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও মধ্যম পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করবে এটাই অধিকতর সঙ্গত। অন্যদিকে 'ছ্বিরাতুল্ মুস্তাক্বীম্'-এর তাৎপর্যে পার্থিব মোবাহ্ কাজের বেলায় অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য কোনোটিরই সংশ্লিষ্টতা নেই এমন কাজেও সহজতম ও কম আয়াসসাধ্য কষ্টহীন পথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা 'ঈমানের পথ'-এর মধ্যে শামিল নেই।

দ্বিতীয়তঃ সূরাহ্ ফাতেহার আয়াতে 'পথ'কে 'বিশেষ্য-বিশেষণ' রূপে (الصراط المستقيم) উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে ال দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বান্দাহ্ বহুবিধ পথের মধ্য থেকে কেবল সেই একমাত্র পথটিকে চাচ্ছে যা 'সহজ-সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও মধ্যম পথ'। আর বলা বাহুল্য যে, এরূপ পথ কেবল একটিই হতে পারে। অন্যদিকে তথাকথিত বিকল্প বাক্যটিতে 'পথ'কে সম্বন্ধ পদ রূপে (صراط الايمان) উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে এ অর্থ

গ্রহণ করার উপায় নেই যে, 'ঈমানের পথ' একাধিক হতে পারে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, 'ঈমানের পথ' সমূহের মধ্য থেকে যে কোনো একটি পথ দেখাবার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে।

এছাড়া উক্ত বাক্যের তাৎপর্য এদিক থেকেও অসম্পূর্ণ যে, এতে ধু ঈমানের পথ প্রদর্শন বা তাতে পরিচালনার কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু ঈমানের পথ যে, সহজ-সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও মধ্যম পথ - যে পথের পথিক কখনো পথভ্রষ্ট হবে না - সেদিকে কোনোরূপ ইঙ্গিত করা হয় নি।

অন্যদিকে সূরাহ্ ফাতেহার صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين. (তাদের পথ যাদেরকে তুমি নে'আমত দিয়েছো - যারা গযবের শিকার নন বা পথভ্রষ্টও নন।) আয়াত ব্যক্ত করে যে, এমন এক সহজ-সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও মধ্যম পথ রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন। এ পথ নবী-রাসূলগণ ('আঃ) এবং সত্যের সাক্ষ্যের মূর্ত প্রতীক ব্যক্তিদের পথ।

এছাড়া এ আয়াত এটাও প্রমাণ করে যে, সহজ-সরল, সঠিক, সুদৃঢ় ও মধ্যম পথের পাশাপাশি বিভিন্ন বক্র পথেরও অস্তিত্ব রয়েছে; আল্লাহ্ তা'আলার গযব ও অসন্তুষ্টিতে নিপতিত লোকেরা সে ধরনের পথসমূহ অবলম্বন করেছে। সে ধরনের পথ হচ্ছে তাদের পথ যারা জিদ, গোয়ার্তুমি ও গোঁড়ামি বশতঃ সত্যের বিরোধিতা করে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যারা অজ্ঞতাবশতঃ হেদায়াতের পথ থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং পথভ্রষ্টতার সীমাহীন প্রান্তরে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এ লোকেরা সত্য ও হেদায়াতের পথের সন্ধান করে নি, বরং তাদের পূর্বপুরুষদের পথকেই বেছে নিয়েছে এবং তাদের অন্ধ অনুসরণ করছে। তারা এমন পথ অবলম্বন করেছে যে পথ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত হয় নি।

যে কেউ এ আয়াতটি পড়বে ও আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করবে, সে-ই এ বিষয়টি বুঝতে পারবে এবং তার চিন্তায় এ সমুন্নত বিষয়টি ও চারিত্রিক রহস্যটি ধরা পড়বে যে, মানুষের উচিত

আল্লাহর অলীগণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁদের চরিত্র, আচার- আচরণ ও ‘আক্বীদাহর অনুসরণ করা, অন্যদিকে যারা খোদাদ্রোহিতার পথ অবলম্বন করেছে এবং স্বীয় কৃতকর্মের কারণে খোদায়ী আযাবের উপযুক্ত হয়েছে তাদের পথ থেকে দূরে থাকা।

সূরাহ্ ফাতেহার উক্ত আয়াতে নিহিত এ চারিত্রিক ও মানবিক সঞ্জীবনী শক্তির অধিকারী সত্যটি থেকে কি দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা সম্ভব, নাকি একে গুরুত্বহীন মনে করা ও উপেক্ষা করা সম্ভব? অথচ আলোচ্য কল্পনাবিলাসী লেখক ধারণা করেছেন যে, বিষয়টি নেহায়েতই গুরুত্বহীন, অতএব, উপেক্ষাযোগ্য।

সূরাহ্ কাওছারের বিকল্প !

একই লেখক সূরাহ্ কাওছারের বিকল্প রচনার নামে লিখেছেন :

(انا اعطيناک الجواهر. فصل لربک و جاهر. و لا تعتمد قول ساحر).

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জাওয়াহের দিয়েছি। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর জন্য উচ্চৈঃস্বরে নামায আদায় করো, আর জাদুকরদের কথার ওপরে আস্থা স্থাপন করো না।"

উল্লেখ্য, جواهر হচ্ছে جوهر - এর বহুবচন। جوهر - এর দু'টি অর্থ : (১) কোনো কিছুর মূল বস্তু (Essence), (২) মূল্যবান মণিমুক্তা। বলা বাহুল্য যে, এখানে দ্বিতীয় অর্থই লক্ষ্য।

লেখক তাঁর ধারণা অনুযায়ী কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কোরআনের সূরাহ্ আল্- কাওছার্- এর যে তথাকথিত বিকল্প রচনা করেছেন তা কয়েকটি দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত ও বাত্বিল। তা হচ্ছে :

(১) পাঠক- পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লেখক তাঁর তথাকথিত বিকল্প সূরায় কোরআন মজীদের সূরাহ্ কাওছারের বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দ সংযোজন পদ্ধতির অনুকরণ করেছেন; তিনি শুধু এর কয়েকটি শব্দের পরিবর্তন করেছেন মাত্র। আর এ করেই তিনি কল্পনা করেছেন যে, তিনি কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন এবং সূরাহ্ কাওছারের বিকল্প রচনা করেছেন।

(২) আর এই তথাকথিত বিকল্পটিও তাঁর নিজের নয়, বরং তিনি এটি মুসাইলামাহ্ কাযযাব্ থেকে চুরি করেছেন এবং সামান্য রদবদল করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ, মুসাইলামাহ্ সূরাহ্ কাওছারের মোকাবিলায় লিখেছিলো :

انا اعطيناک الجماهر. فصل لربک و هاجر. و ان مبغضک رجل کافر.

"অবশ্য আমি তোমাকে অনেকগুলো জনসমষ্টি দিয়েছি। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামায আদায় করো ও হিজরত করো। আর নিশ্চয়ই তোমার শত্রু ব্যক্তি কাফের।"

(৩) এর চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে এই যে, লেখক ধরে নিয়েছেন যে, দু'টি কালামের বাক্যসমূহের অন্ত্যমিল ও ঝঙ্কার যদি অভিন্ন হয় তাহলেই বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মানদণ্ডে তা সমপর্যায়ের হবে। অথচ আসলে তা নয়। বরং কোনো কালামের ফাছ্বাহাতের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, কালামের বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় থাকতে হবে যা লেখকের বক্তব্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত।

বস্তুতঃ জাওয়াহের দান করার অনিবার্য দাবী এ নয় যে, এ জন্য নামায আদায় করতে হবে এবং তা- ও উচ্চৈঃস্বরে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদেরকে অসংখ্য নে'আমত দান করেছেন। এর মধ্যে ধনসম্পদের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বহু নে'আমত রয়েছে, যেমন : জীবনের নে'আমত, বিচারবুদ্ধি (عقل)- এর নে'আমত, ঈমানের নে'আমত ইত্যাদি। এমতাবস্থায় উক্ত লেখক কী করে ধনসম্পদের নে'আমতের জন্য নামায আদায় অপরিহার্য মনে করছেন?

তবে হ্যা, যে ব্যক্তি ধনসম্পদ শোষণের মাধ্যমে সমাজের শীর্ষে আরোহণ করেছে এবং ধনসম্পদকেই নিজের জন্য ক্বিবলাহ্, খোদা ও জীবন- লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে - যার সমস্ত আশা- আকাঙ্ক্ষা ধনসম্পদেই কেন্দ্রীভূত এবং পার্থিব ধনসম্পদ সংগ্রহ ও পুঞ্জীভূতকরণই যার একমাত্র লক্ষ্য, এ কারণে যে চার হাত- পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ধনসম্পদের দিকে এগিয়ে চলে, ধনসম্পদ অর্জনের পিছনে সমস্ত রকমের চেষ্টা ও ম কেন্দ্রীভূত করে এবং অন্য সমস্ত লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের ওপর একে অগ্রাধিকার প্রদান করে, তার ব্যাপারই আলাদা। আর, কথায় বলে, "পাত্রের গা চুঁইয়ে তা- ই বের হয় যা আছে তার অভ্যন্তরে।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সূরাহ্ কাওছারে যে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে তা (উক্ত লেখক তাঁর তথাকথিত বিকল্পেও যা বহাল রেখেছেন) তা সাধারণভাবে বাধ্যতামূলক নামায নয়, বরং বিশেষ ও অসাধারণ নে'আমতের জন্যে নামায অর্থাৎ শোকরানা নামায। কারণ, সূরাহ্ কাওছারে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে 'কাওছার' নামক নে'আমত দানের কথা বলা

হয়েছে। এই ‘কাওছার’- এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘আধিক্য বা প্রাচুর্যের অধিকারী যে কোনো কিছু’ এবং ‘প্রচুর কল্যাণের উৎস ব্যক্তি’। অত্র সূরায় হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে প্রদত্ত ‘কাওছার’- এর দু’টি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে, তা হচ্ছে : (১) বেহেশতের ‘কাওছার’ নামক হাউয যা থেকে তিনি হাশরের দিনে তাঁর অনুসারীদেরকে পানি পান করাবেন। (২) তাঁর সন্তান হযরত ফাত্বেমাহ্ (‘আঃ) - যার বংশধরদের মধ্য থেকে মা‘ছূম ইমামগণ (‘আঃ) ছাড়াও কারবালার নেত্রী হযরত যায়নাব (সালামুল্লাহি ‘আলাইহা) এবং অসংখ্য মুজতাহিদ, ফকীহ্, আলেম, দার্শনিক, মুজাহিদ ইত্যাদি বিশিষ্ট ও যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে। তাঁদের সকলের পরিচিতি তুলে ধরতে হলে বিরাট এক বিশ্বকোষ রচনা করতে হবে। বলা বাহুল্য যে, তাঁরা মানবতার জন্য, বিশেষ করে জ্ঞান, শিক্ষা ও নতিকতার বিস্তারের ক্ষেত্রে ধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য অফুরন্ত কল্যাণের উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত হযরত ফাত্বেমাহ্ (সাঃ‘আঃ)- এর বংশে এ ধরনের ব্যক্তিত্ববর্গের আগমন অব্যাহত থাকবে।

অনেক মুফাসসিরের মতে, অত্র সূরায় ‘কাওছার’ পরিভাষাটি উপরোক্ত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। তবে এ সূরাহ্ একটি ভবিষ্যদ্বাণীও বটে। এ কারণে এর উপরোক্ত দু’টি বাহ্যিক তাৎপর্যের মধ্যে দ্বিতীয়োক্তটিই হচ্ছে সর্বপ্রধান বাহ্যিক তাৎপর্য। কারণ, তা মুসলিম- অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সামনে এ দুনিয়ার বুকেই বাস্তবায়িত হয়েছে। অত্র সূরায় ‘কাওছার’ পরিভাষাটি হাউযে কাওছার ও হযরত ফাত্বেমাহ্ (সাঃ‘আঃ) - এ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাক বা এর যে কোনো একটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাক, তা যে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে প্রদত্ত এক ব্যতিক্রমধর্মী মহা নে‘আমত তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অন্যদিকে ধনসম্পদ কমবেশী সবাইকেই দেয়া হয়েছে এবং প্রভূত ধনসম্পদের মালিকের সংখ্যাও কোনো যুগেই খুব একটা কম ছিলো না। তাছাড়া প্রভূত ধনসম্পদ জোর- যুলুম সহ বিভিন্ন ধরনের অবৈধ পন্থায়ও হস্তগত করা যায়। অন্যদিকে বধ ধনসম্পদও অবৈধ কাজে

ব্যবহার করলে বা তা থেকে দরিদ্র জনদের ও সমাজের হক্ আদায় না করলে সে সম্পদ কার্যতঃ নে'আমত নয়, বরং আযাব ও চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কারণ।

(৪) লেখকের কাছে প্রশ্ন করা যেতে পারে : তিনি যে جواهر- এর পূর্বে নির্দিষ্টকরণ মূলক ال যোগ করে الجواهر বলেছেন তার উদ্দেশ্য কী?

উক্ত বাক্যে লেখকের লক্ষ্য যদি কোনো সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ جواهر হয়ে থাকে তাহলে বলবো, তাঁর রচিত বাক্যসমূহের মধ্যে এমন কোনো নিদর্শন নেই যা থেকে বোঝা যেতে পারে যে, তিনি কোন্ সুনির্দিষ্ট جواهر বুঝাতে চেয়েছেন। আর جواهر শব্দের আগে ال যোগ করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ বুঝানো (যেহেতু বহুবচনের আগে ال যোগ করলে সমগ্র বুঝায়), তাহলে তাঁর এ ভাষণ যে মিথ্যা তা বলাই বাহুল্য। কারণ, বিশ্বের সমস্ত ধনসম্পদ যে কখনোই কোনো এক ব্যক্তিকে দেয়া হয় নি তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

(৫) লেখককে আরো প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তাঁর রচিত কালামের প্রথম দুই বাক্য এবং শেষ বাক্য (و لا تعتمد قول ساحر)- এর মধ্যে সম্পর্ক কী? আর এখানে ساحر (জাদুকর)- এর লক্ষ্যই বা কে? আর ساحر - এর কোন্ কথার ওপর আস্থা রাখা ঠিক হবে না?

এখানে লেখকের লক্ষ্য যদি কোনো সুনির্দিষ্ট জাদুকর এবং তার কথার কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ হয়ে থাকে তাহলে এমন কোনো নিদর্শন উল্লেখ করা উচিত ছিলো যাতে সেই সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও তার বক্তব্যের সুনির্দিষ্ট অংশটি সম্বন্ধে জানা যেতো। কিন্তু লেখকের এ বাক্যে এরূপ কোনো নিদর্শন বিদ্যমান নেই।

আর তাঁর লক্ষ্য যদি হয় যে কোনো জাদুকরের যে কোনো কথাই (যেমন : লেখকের বাক্যে قول ও ساحر উভয় শব্দই অনির্দিষ্টবাচক এবং তা নিষেধাজ্ঞাবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে - যা সাধারণ ও সর্বজনীন অর্থ জ্ঞাপন করে), তাহলে এ বাক্যের অর্থ হবে : "কোনো জাদুকরের কোনো কথার

ওপরই আস্থা স্থাপন করো না বা নির্ভর করো না।" তাহলে লেখকের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, বিচারবুদ্ধি বলে না যে, জাদুকরের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যাবে না, তা সে কথা সাধারণ কাজকর্মের ব্যাপারে হোক না কেন বা অন্যদের কথার প্রতি সমর্থনসূচক কথা হোক না কেন।

আর লেখকের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, জাদুকরদের জাদু সংশ্লিষ্ট কথাবার্তায় বিশ্বাস করো না, তাহলে তা- ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, জাদুকর ব্যক্তি জাদুকর হিসেবে কোনো বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয় না, আর জাদু কোনো কথা বা বক্তব্য নয়। বরং জাদুকরের জাদু হচ্ছে কতোগুলো কৌশল ও প্রতারণামূললক কাজ, কোনো কথা বা ভাষণ নয়।

তাছাড়া জাদুকর তার কাজকে জাদু হিসেবেই পরিচিত করে। সে আগেই জানিয়ে দেয় যে, সে এমন কৌশলের অধিকারী যার ফলে যা বাস্তবে নেই তাকেই আছে বলে লোকদেরকে দেখিয়ে দিতে পারে। জাদুকর তার জাদুর এ পরিচয় দানের কথায় সত্যবাদী। অতএব, তাতে আস্থা স্থাপন না করার কারণ নেই। মোদ্দা কথা, সূরাহ্ কাওছারের তথাকথিত বিকল্প রচনাকারীর সংশ্লিষ্ট বাক্যটি একটি অর্থহীন বাহুল্য বাক্য।

(৬) সূরাহ্ কাওছার এমন লোকদের কথার জবাবে নাযিল্ হয় যারা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে বিদ্রূপ করতো এবং বলতো : এ ব্যক্তি একজন ابتر (নির্বংশ) এবং খুব শীঘ্রই সে যখন মারা যাবে তখন তার নাম ও তার আদর্শ হারিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

(ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.)

"তারা কি বলে : 'সে একজন কবি; আমরা তার মৃত্যু- দুর্ঘটনার জন্য অপেক্ষা করবো।'?" (সূরাহ্ আত্- তূর্ : ৩০)

বিরোধীদের এ জাতীয় বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সূরাহ্ কাওছার নাযিল্ করেন এবং এরশাদ করেন :

(انا اعطيناک الکوثر.)

“(হে রাসূল!) অবশ্যই আমি আপনাকে প্রভূত কল্যাণের উৎস (কাওছার) দান করেছি।”

হ্যা, সকল দিক থেকেই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়। এ দুনিয়ার বুকে তিনি রিসালাত- নবুওয়াত, মানুষের হেদায়াত ও মুসলমানদের নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত হন, অন্যদিকে স্বীয় জীবদ্দশায়ই তিনি অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য ও দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয়ের অধিকারী হন। তেমনি তাঁর কন্যা হযরত ফাত্বেমাহর (সাঃ‘আঃ) মাধ্যমে তাঁর বংশধারা বিস্তার লাভ করে এবং সংখ্যার দিক থেকেও তাঁরা আধিক্যের অধিকারী। আর পরকালেও তিনি সবচেয়ে বড় শাফা‘আতকারীর মর্যাদা লাভ করবেন, প্রশংসিত ধামে হবে তাঁর অবস্থান, বেহেশতে তিনি পাবেন সমগ্র মানবকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তিনি হবেন হাউযে কাওছারের অধিকারী - যেখান থেকে কেবল তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা পিপাসা নিবৃত্তি করে পরিতৃপ্ত হতে সক্ষম হবেন। এ ছাড়াও আরো বহু নে‘আমতের অধিকারী হবেন তিনি।

এরপর আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন :

(فصل لربک و انحر.)

“অতএব, (এসব নে‘আমতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) নামায আদায় করুন এবং প যবেহ্ করুন।”

অবশ্য نحر শব্দের কয়েকটি মানে হতে পারে। যেমন : মানত হিসেবে বা ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে উষ্ট্র যবেহ্ করা, তাকবীর বলার সময় দুই হাত গলা পর্যন্ত উঠানো, শরীরের সমস্ত অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ সহকারে ক্বিবলাহমুখী হওয়া। তেমনি নামাযের ক্বিয়াম অবস্থায় যথাযথ ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে দাঁড়ানোও نحر শব্দের অন্যতম অর্থ।

ওপরে نحر শব্দের যতোগুলো অর্থ উল্লেখ করা হলো তার সবগুলোই এ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। কারণ, এর যে কোনো অর্থই গ্রহণ করি না কেন, তা- ই এক ধরনের শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে যে সীমাহীন নে‘আমত প্রদান করেন তার জবাবে এভাবে আল্লাহর প্রতি করিয়া জ্ঞাপনের জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়।

আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমাহীন নে'আমতের জন্যে করিয়া জ্ঞাপনের জন্য নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(انا شانئک هو الابتر.)

"নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই - আপনাকে উপহাসকারীই - নির্বংশ।"

বস্তুতঃ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে যারা বিদ্রূপ ও উপহাস করেছে তাদের পরিণতি তা- ই হয়েছে যা কোরআন মজীদ তার উক্ত আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। অর্থাৎ তাদের জন্য কোনো সুনাম- সুখ্যাতি যেমন বজায় থাকে নি, তেমনি তাদের বংশধারার পরিচয় বহনকারী লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ও অপমান- লাঞ্ছনা- গঞ্জনার সম্মুখীন হবে।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে সূরাহ্ কাওছারের লক্ষ্য ও তাৎপর্য। এমন উঁচু মানের ও বালাগ্বাতের বিচারে পূর্ণতা বিশিষ্ট সূরাহর সাথে উক্ত লেখকের পরস্পর সম্পর্করহিত বাক্য তিনটির আদৌ কোনো তুলনা চলে কি?

কী আশ্চর্য! উক্ত লেখক বহু কসরত করে যে বাক্যগুলো উপস্থাপন করেছেন তাতে কোরআন মজীদেরই বাক্যগঠন রীতি ও শব্দসংযোজন পদ্ধতির অনুকরণ করেছেন, আর রদবদলকৃত শব্দাবলীর অংশবিশেষ মুসাইলামাহ্ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং অন্ধ দুশমনী, গোঁড়ামি ও অজ্ঞতা বশতঃ এগুলোকে পরস্পর গ্রথিত করে বাক্য রচনা করেছেন, অথচ এরই সাহায্যে তিনি কোরআন মজীদের বালাগ্বাত, ফাছ্বাহাত ও অলৌকিকতার মোকাবিলা করতে চাচ্ছেন এবং কোরআন মজীদের ে ষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে খাটো করার চেষ্টা করছেন!!

কোরআন মজীদ রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) শ্রেষ্ঠতম মুজিযাহ্

কোরআন রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) একমাত্র মু‘জিযাহ্ নয়

যে কোনো ওয়াকেফহাল ব্যক্তিই জানেন যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ে শ্রষ্ঠতম মু‘জিযাহ্ এবং একই সাথে সমস্ত নবী- রাসূলের (‘আঃ) প্রদর্শিত সকল মু‘জিযাহর মধ্যে ে শ্রষ্ঠতম। বিশেষ করে মানবেতিহাসের সমস্ত মু‘জিযাহর মধ্যে এই একটিমাত্র মু‘জিযাহ্ই এখনো বহাল রয়েছে এবং ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা সমূহে কোরআনে করীমের অলৌকিকতার বিভিন্ন দিকের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছি এবং সেই সাথে অন্য সমস্ত মু‘জিযাহর ওপর কোরআন মজীদের ে শ্রষ্ঠত্বের কারণও উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখানে আমরা যে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তা হচ্ছে কোরআন মজীদ হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ে শ্রষ্ঠতম মু‘জিযাহ্, কিন্তু একমাত্র মু‘জিযাহ্ নয়। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) বহু মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন। অতীতের নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) যে সব মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)ও সেই একই ধরনের মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন। বরং তিনি পূর্ণতর রূপে এ সব মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসের ে শ্রষ্ঠতম ও একমাত্র চিরস্থায়ী মু‘জিযাহ্ কোরআন মজীদ হচ্ছে বিশেষভাবে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক আনীত মু‘জিযাহ্ - যা অন্য কোনো নবী- রাসূলকে (‘আঃ) দেয়া হয় নি এবং এ দিক থেকে তিনি যে অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী তা- ও অন্য কোনো নবী- রাসূলকে (‘আঃ) দেয়া হয় নি।

রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) মু‘জিযাহ্ সমূহ পূর্ণতর

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, বিভিন্ন নবী- রাসূলকে (‘আঃ) প্রদত্ত মু‘জিযাহ্ দুই ধরনের। এক ধরনের মু‘জিযাহ্ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী- রাসূলগণকে (‘আঃ) দেয়া হয়েছিলো তাঁদের নবুওয়াত প্রমাণের জন্য। সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য নবীর

নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যয় উৎপাদনে তা- ই যথেষ্ট। কিন্তু এ জাতীয় মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পরেও যারা ঈমান আনে নি তাদেরকে পরকালীন শাস্তির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) প্রদত্ত দ্বিতীয় ধরনের মু'জিযাহ্ হচ্ছে এমন যা কাফেরদের দাবীর জবাবে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তা দেখার পরেও ঈমান না আনা ইহকালেই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যেমন : ছামূদ্ জাতির নিকট প্রেরিত হযরত ছ্বালেহ্ ('আঃ) মু'জিযাহ্ স্বরূপ যে উষ্ট্রী আনয়ন করেন তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করায় ছামূদ জাতি ধ্বংস হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণ ('আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহও যে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে পূর্ণতর রূপে প্রদান করা হয়েছিলো তার সপক্ষে দু'টি অকাট্য প্রমাণ রয়েছে :

(১) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন মু'জিযাহ্ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির্ হাদীছ রয়েছে। এছাড়া এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিন্তা ও মতের অনুসারী গ্রন্থকারগণের প্রণীত বহু গ্রন্থ রয়েছে।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন মু'জিযাহ্ সম্পর্কিত এ মুতাওয়াতির্ হাদীছ সমূহ দুই দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী; অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহ সম্পর্কে আহলে কিতাব্ সূত্রে যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় সে সব বর্ণনা এ দু'টি বিশিষ্ট মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তা হচ্ছে :

এক সময়ের নকট্য :

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহ সময়ের দিক থেকে আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী। আর বলা বাহুল্য যে, যে ঘটনাই সময়ের দিক থেকে পাঠক বা ে াতার নিকটতর হয় এবং ঘটনাটির সংঘটনকালের ব্যবধান সংক্ষিপ্ততর হয় তা অধিকতর প্রত্যয় উৎপাদক হয়ে থাকে, আর তা থেকে প্রত্যয় হাছ্বিল্ করা সহজতরও বটে।

দুই তাওয়াতোর্ ও বর্ণনার আধিক্য :

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক বেশী। কারণ, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ছ্বাহাবীদের সংখ্যা বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত

মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর সঙ্গীসাথীদের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো। বস্তুতঃ যতো লোক হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু‘জিযাহ্ সমূহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী লোক হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু‘জিযাহ্ সমূহ প্রত্যক্ষ করেন ও বর্ণনা করেন। বিশেষ করে হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর যুগে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম - আঙ্গুলে গণনা করার মতো। ফলে তাঁর মু‘জিযাহ্ বর্ণনাকারীর সংখ্যাও ছিলো আঙ্গুলে গণনা করার মতো (যা তাওয়াতোর্ পর্যায়ের বলে গণ্য হতে পারে না)।

এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের (‘আঃ) মু‘জিযাহ্ সমূহ বর্ণনাকারীদের তালিকা পরম্পরা সূত্রে পাওয়া যায় না অর্থাৎ মু‘জিযাহর সকল প্রত্যক্ষদর্শী ও তাঁদের কাছ থেকে বণকারীদের তালিকা সংরক্ষিত হয় নি। অন্যদিকে ছিটেফোঁটা যাদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না অর্থাৎ তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। ফলে এ সব বর্ণনা আদৌ নির্ভরযোগ্য ও প্রত্যয়উৎপাদক হতে পারে না। তবে মুসলমানরা যে, ঐ সব মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে ঈমান পোষণ করে, তা করে সে সম্পর্কে কোরআন মজীদ ও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, আহলে কিতাবের বর্ণনার কারণে নয়।

অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু‘জিযাহ্ সমূহ প্রত্যক্ষ দর্শক ও পরবর্তী পর্যায়ে তথা প্রতিটি স্তরে শত শত বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং সংশ্লষ্ট প্রতিটি বর্ণনাকারীর জীবনকাহিনী ‘ইলমে রিজাাল্- এ বর্ণিত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)- এর মু‘জিযাহ্ সমূহ সম্পর্কে তাওয়াতোর্ ও উদ্ধৃতির আধিক্যের দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে (যদিও এ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা তা- ই যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে), তাহলে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর মু‘জিযাহ্ সমূহ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর তাওয়াতোর্ সমস্ত রকমের সন্দেহ- সংশয়ের উর্ধে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাহ্র সংখ্যা অনেক। যেমন : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ, মৃতকে জীবিতকরণ, কাঠের তরী মিম্বারের ক্রন্দন ও তাঁর সাথে কথা বলা, তাঁর সাথে সাপের কথা বলা, সীমিত খাদ্যে বিস্ময়কর পরিমাণে বৃদ্ধি (বরকত) হওয়া ইত্যাদি। আমরা এখানে এ সব মু'জিযাহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ, এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কোরআন মজীদ - যা চিরস্থায়ী মু'জিযাহ। কোরআন মজীদকে জানতে পারলে এবং তার অলৌকিকত্ব সম্পর্কে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হলে অন্য কোনো মু'জিযাহ সম্পর্কে অবগত না থাকলেও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত সম্পর্কে প্রত্যয় সৃষ্টির পথে কোনো বাধা থাকে না। [বস্তুতঃ অত্র অধ্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য ধু তাদের ভ্রান্তি নিরসন যারা মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর অন্য কোনো মু'জিযাহ ছিলো না।]

(২) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) যে অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) সমস্ত মু'জিযাহ্র অধিকারী ছিলেন তার সপক্ষে দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) প্রদর্শিত বহু মু'জিযাহ্র কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে এ সব মু'জিযাহ্ প্রদর্শিত হওয়ার কথা সত্যায়িত করেছেন। অতঃপর তিনি অন্য সমস্ত নবী- রাসূলের ('আঃ) ওপর তাঁর মর্যাদা ও ে ষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং নিজেকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে ঘোষণা করেছেন।

এমতাবস্থায় হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ে ষ্ঠত্ব ও উচ্চতর মর্যাদার দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ সমূহের পূর্ণতর রূপের অধিকারী হবেন, ঠিক যেভাবে অতীতের নবী- রাসূলগণকে ('আঃ) খোদায়ী আয়াত ও কিতাব্ দেয়া হলেও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে খোদায়ী কিতাবের পূর্ণতম সংস্করণ দেয়া হয়েছে।

এটা কী করে হতে পারে যে, যিনি অন্যদের চেয়ে ে ষ্ঠতর তাঁর মধ্যে অন্যদের পূর্ণতাবাচক গুণাবলীর মধ্য থেকে কতক গুণ কম বা অপূর্ণ মাত্রায় থাকবে? এটা কি চিন্তা করা যায় যে, উদাহরণস্বরূপ, যে ডাক্তার দাবী করেন যে, তাঁর জ্ঞান অন্য সমস্ত ডাক্তারের জ্ঞানের তুলনায়

বেশী অথচ এমন কোনো কোনো ডাক্তার পাওয়া যাবে যারা কোনো কোনো বিশেষ ব্যধির চিকিৎসায় সক্ষম যার চিকিৎসায় তিনি সক্ষম নন? এহেন অবস্থা বিচারবুদ্ধির বিচারে একেবারেই অসম্ভব।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে তারা স্বয়ং মু'জিযাহ্ নামক বিষয়টির অস্তিত্বই অস্বীকার করে। তারা সমস্ত নবী- রাসূলের ('আঃ) সমস্ত মু'জিযাহকেই অস্বীকার করে এবং এতদসংক্রান্ত আয়াত সমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য ছিলো, কেউ যেন এ সব ভণ্ড নবীর কাছে মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের জন্য দাবী করে না বসে - যা প্রদর্শনে তারা পুরোপুরি অক্ষম। এভাবে তারা তাদের মিথ্যা দাবীর স্বরূপ লুক্কায়িত রাখার চেষ্টা করে।

মু'জিযাহর দাবী প্রত্যাখ্যানের দলীল ১ -

কিছু অজ্ঞ লোক ও কিছু গণপ্রতারক অজ্ঞতাবশতঃ অথবা অসদুদ্দেশ্যবশতঃ লিখেছে যে, কোরআন মজীদের কতক আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু'জিযাহর অধিকারী ছিলেন না। উক্ত আয়াত সমূহ অনুযায়ী, তাঁর একমাত্র মু'জিযাহ্ এবং তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কোরআন মজীদ; অন্য কোনো মু'জিযাহ্ বা প্রমাণই তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে ছিলো না।

এ লোকেরা তাদের বক্তব্যের সপক্ষে দলীল স্বরূপ যে সব আয়াত উদ্ধৃত করে থাকে আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করবো এবং তাদের উপস্থাপিত যুক্তিও তুলে ধরবো। এরপর আমরা তাদের দাবীর অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করবো।

প্রথম আয়াত :

(و ما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون. و اتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. و ما نرسل بالآيات الا تخويفاً).

"মু'জিযাহ্ পাঠানো থেকে আমাকে এ বিষয়টি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই বিরত রাখে নি যে, প্রথম যুগের লোকেরা (অতীতের লোকেরা) মু'জিযাহকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। (উদাহরণস্বরূপ,) আমি ছামুদ জাতির নিকট পরীক্ষাস্বরূপ একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তার ওপর যুলুম করেছিলো। আর আমি তো চরমপত্র স্বরূপ (বা চূড়ান্ত সতর্ককরণের লক্ষ্যে ভীতিপ্রদর্শনস্বরূপ) ব্যতীত মু'জিযাহ্ পাঠাই না।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল্ : ৫৯)

এরা বলে : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু'জিযাহর অধিকারী ছিলেন না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে তাঁকে অন্য কোনো মু'জিযাহ্ প্রদান করেন নি তার কারণ এই যে, অতীতের জাতিসমূহ তাদের নিকট প্রেরিত মু'জিযাহ্ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং মু'জিযাহ্ দেখে সত্যের নিকট নতি স্বীকারে প্রস্তুত হয় নি।

জবাব : এ আয়াত হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক যে কোনো ধরনের মু'জিযাহ্ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা প্রমাণ করে না। কারণ, এ আয়াতে বলা হয় নি যে, তিনি কোনো ধরনের মু'জিযাহ্ই দেখাবেন না। বরং এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মোশরেকরা মু'জিযাহ্ দেখানোর যে দাবী জানায় হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) তাতে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেন নি এবং তারা যে ধরনের মু'জিযাহ্ দেখানোর দাবী জানিয়েছিলো তা প্রদর্শনে তিনি রাযী হন নি ও তা প্রদর্শন করেন নি।

অন্য কথায়, এ আয়াতে কেবল সেই ধরনের মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে যা মোশরেকরা নিজ নিজ খেয়ালখুশী মতো দাবী করেছিলো এবং যার পিছনে তাদের প্রবৃত্তির প্রতারণা ব কোনোরূপ আন্তরিকতা ছিলো না। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে অক্ষম প্রতিপন্ন করে ঠাট্টা- বিদ্রুপ করা; তাদের দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করা হলেই তারা তা গ্রহণ করবে এ ধরনের মানসিক প্রস্তুতি তাদের ছিলো না। অত্র আয়াতে কেবল এ ধরনের মু'জিযাহ্ প্রদর্শনেই অস্বীকৃতি জানানো হয়, সমস্ত বা যে কোনো ধরনের মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানানো হয় নি।

স্বয়ং উক্ত আয়াতেই আমাদের এ দাবীর সত্যতা নিহিত রয়েছে :

(১) آيات শব্দটি হচ্ছে آية শব্দের বহুবচন। آية মানে চিহ্ন বা নিদর্শন। আলোচ্য আয়াতে آيات শব্দটির পূর্বে ال যুক্ত হয়েছে। এর ফলে এর তিনটি অর্থ হতে পারে :

(ক) প্রথমতঃ এ আয়াতে ব্যবহৃত ال হতে পারে الف و لام جنسى (জাতিবাচক ال)। সে ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য কোনো নিদর্শন (মু'জিযাহ্)ই তাঁকে প্রদান করেন নি। সে ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী (খ) ক্ষেত্রে, কোরআন মজীদকেও আর মু'জিযাহ্ রূপে গণ্য করা চলে না।

কিন্তু এ সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিলে বলতে হবে যে, তাহলে নবী পাঠানোই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, যে নবী তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য আদৌ কোনো নিদর্শন বা

প্রমাণ নিয়ে আসতে সক্ষম নন, বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে তাঁর নবুওয়াত- দাবী সত্যতা প্রতিপাদনের (تصديق) উপযুক্ত নয়।

(খ) অথবা এখানে ال হচ্ছে الف و لام جمعى (বহুবচন বাচক ال)। সে ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হবে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী সমস্ত রকমের নিদর্শন (মু'জিযাহ্) প্রদানেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্ভাবনাটিও প্রথম সম্ভাবনাটির অনুরূপ এবং একই কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ) এমতাবস্থায় আমাদের জন্য তৃতীয় সম্ভাবনাটি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা হচ্ছে, এ আয়াতে آيات শব্দটির পূর্বে যে ال ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে الف و لام عهدى (ইঙ্গিতবাচক ال)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী الف و لام عهدى - এর কাজ কাজ হচ্ছে নির্দিষ্টকরণ বা ে াতা পূর্ব থেকে অবগত এমন কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিতকরণ। যেমন : কেউ তার বন্ধুকে বলল : اشتريت عبداً - "আমি একটি দাস ক্রয় করেছি।" দু'দিন পরে সেই বন্ধুর সাথে আবার দেখা হলো, তখন সে বললো : بعت العبداً - "দাসটিকে বিক্রি করে দিয়েছি।" দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে عبد শব্দের পূর্বে ال যোগ করায় বন্ধু বুঝতে পারলো যে, দু'দিন আগে যে দাসটি ক্রয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছিলো তাকেই বিক্রি করা হয়েছে, অন্য কোনো দাসকে নয়। আর ে াতার যখন জানা আছে তখন বক্তার জন্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, "দু'দিন আগে যে দাসটি ক্রয়ের কথা তুমি জানো তাকে বিক্রি করে দিয়েছি।"

অতএব, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, কোরআন মজীদ সেই সব বিশেষ নিদর্শন (মু'জিযাহ্) প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মোশরেকরা অন্যায় জিদ ও বিকৃত মানসিকতা বশতঃ যা প্রদর্শনের জন্য দাবী জানিয়েছিলো।

(২) মোশরেকরা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে ধু এ কারণেই যদি হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) অন্য সমস্ত মু'জিযাহ্ আনয়নে বিরত থাকবেন, তাহলে তাঁর আনীত সবচেয়ে বড়

মু'জিযাহ্ কোরআন মজীদও নাযিল্ হতো না। কারণ, উল্লিখিত আয়াতে آيات শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত ال যদি সাধারণ (জাতিবাচক) বা সামগ্রিক (বহুবচন বাচক) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে তাতে ব্যতিক্রমের কোনো অবকাশ থাকে না। অতএব, অত্র আয়াতে সুনির্দিষ্ট কতক মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, সমস্ত মু'জিযাহ্ নয়।

(৩) আলোচ্য আয়াতে মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতির পিছনে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, অতীতের জাতিসমূহ তাদের নবীগণ ('আঃ) কর্তৃক আনীত মু'জিযাহ্র সামনে নতি স্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। আর এ-ও কেবল দাবীকৃত মু'জিযাহ্ সম্পর্কে - যা প্রদর্শন করা হয়েছে, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অন্যথায় উত্থাপিত যুক্তির সত্যতা থাকে না। অর্থাৎ মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পরেই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, আগুনের সংস্পর্শে না এনে কাষ্ঠ অগ্নিদগ্ধ না হওয়ার পিছনে 'কাষ্ঠ ভিজা ছিলো বলে পুড়ে নি' - এ যুক্তি প্রদর্শন করা চলে না।

বস্তুতঃ মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পিছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে : হয় খোদায়ী পরম জ্ঞানের ফয়ছালা, নয়তো মানুষের পক্ষ থেকে মু'জিযাহ্ দাবী। এছাড়া তৃতীয় কোনো কারণ থাকতে পারে না।

খোদায়ী পরম জ্ঞানের দাবী যদি এই হয় যে, মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে কোনো মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করবেন, সে ক্ষেত্রে অতীতের জাতিসমূহ কর্তৃক মু'জিযাহ্ প্রত্যাখ্যানের যুক্তিতে তা প্রদর্শন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা বিরত থাকতে পারেন না। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁর পরম জ্ঞানের বিপরীত আচরণ করবেন এটা সুস্থ বিচারবুদ্ধি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রত্যাখ্যান যদি নবীকে মু'জিযাহ্ প্রদানের পথে বাধাস্বরূপ হতো তাহলে তা নবী-রাসূল পাঠানোর পথেও বাধাস্বরূপ হতো।

অতএব, মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পথে মানুষের প্রত্যাখ্যান কেবল দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রেই অর্থাৎ মানুষের দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের ক্ষেত্রেই বাধা হতে পারে। অর্থাৎ মু'জিযাহ্ দর্শন ও হুজ্জাত্ পূর্ণ হওয়ার পরেও কেবল খেয়ালখুশীবশতঃ ও সত্যকে নিয়ে ছেলেখেলা করার উদ্দেশ্যে পুনরায় এবং তাদের পসন্দ অনুযায়ী মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের জন্য লোকেরা দাবী জানালে আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে বিরত থাকতে পারেন।

এ আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য যে, নবী- রাসূলগণ ('আঃ) তাঁদের নবুওয়াত প্রমাণের জন্যে যে সব প্রাথমিক পর্যায়ের মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করেন আলোচ্য আয়াতে সে ধরনের মু'জিযাহ্ সম্পর্কে কথা বলা হয় নি। বরং প্রাথমিক পর্যায়ের মু'জিযাহ্ প্রদর্শন ও হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ হবার পরেও, প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ প্রত্যাখ্যান পূর্বক মোশরেকরা তাদের খেয়ালখুশী মোতাবেক যে সব মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী জানায়, অত্র আয়াতে কেবল সেই সব মু'জিযাহ্ প্রদর্শনেই অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে।

একটি আপত্তি ও তার জবাব

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, তা হচ্ছে : অতীতের বিভিন্ন জাতি কর্তৃক, তাদের দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শিত হবার পরেও তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি কী করে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সময়কার আরব জাতির সামনে তাদের দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পথে বাধা হতে পারে?

এর জবাব হচ্ছে : দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পর তা প্রত্যাখ্যান করা হলে আযাব নাযিল্ হওয়া অপরিহার্য। এটা আল্লাহ্ তা'আলার এক স্থায়ী নীতি। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদের দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করতেন এবং তারা তা অস্বীকার করতো তাহলে অবশ্যই তাদের ওপর আযাব নাযিল্ হতো। কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তাঁর বর্তমানে আল্লাহ্ ঐ জাতির ওপর আযাব নাযিল্ করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

(و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم.)

“(হে রাসূল!) আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি (আযাব) প্রদান করবেন না।” (সূরাহ্ আল্- আনফাাল্ : ৩৩)

এ কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের দাবী অনুযায়ী মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকার করেন। কারণ, আল্লাহ্ জানেন যে, মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করা হলেও তারা তা মেনে নেবে না এবং এর ফলে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তাদের ওপর আযাব নাযিল্ করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

বস্তুতঃ লোকদের দাবী ব্যতিরেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত প্রাথমিক পর্যায়ের মু‘জিযাহ্ সমূহ - যা নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা প্রতিপাদন ও মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রদর্শন করা হয়, তাকে মু‘জিযাহ্ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি এবং স্বয়ং নবীকে নবীরূপে মেনে নিতে অস্বীকৃতি - এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ফলে এ জাতীয় মু‘জিযাহ্ প্রত্যাখ্যানের পরিণতিও নবীকে প্রত্যাখ্যানের পরিণতির অনুরূপ। আর তা হচ্ছে পরকালীন শাস্তি, অন্য কিছু নয়।

কিন্তু মু‘জিযাহর দাবীদাররা যদি তাদের নিজেদের দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ই প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তা সংশ্লিষ্ট লোকদের জিদ, গোয়ার্তুমি ও অন্ধত্বই প্রমাণ করে। কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি সত্যান্বেষী হয় তাহলে সে প্রাথমিক পর্যায়ের মু‘জিযাহ্ দর্শনেই নবীর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করবে। কারণ, নবী প্রদর্শিত প্রাথমিক পর্যায়ের মু‘জিযাহ্ই তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

এছাড়া, লোকদের পক্ষ থেকে মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী জানানোর মানেই এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে যে, দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করা হলে তারা নবীর নবুওয়াতকে মেনে নেবে। অতঃপর তারা যদি দাবীকৃত মু‘জিযাহ প্রদর্শিত হবার পরেও তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্যের সামনে নতি স্বীকারে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে কার্যতঃ তারা নবীকে ঠাট্টা- বিদ্রুপ করলো, বরং নিজেদের দাবীকৃত মু‘জিযাহকেই বিদ্রুপ করলো।

আর যেহেতু দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রদর্শিত হবার পরে প্রত্যাখ্যান করা হলে তার পরিণতিতে আযাব অনিবার্য সেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াতের শেষে এ জাতীয় মু‘জিযাহকে آيات تخويفى

(চরমপত্রমূলক বা চূড়ান্ত হুশিয়ারী মূলক মু'জিযাহ্) রূপে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায়, এরূপ বিপদসঙ্কেতস্বরূপ নয় এমন অন্য যে কোনো মু'জিযাহ্ই (যাকে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের মু'জিযাহ্ বলে উল্লেখ করেছি) বান্দাহদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও হেদায়াত এবং সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার মাধ্যম ব নয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা অবস্থায় সে জনগোষ্ঠীর ওপর আযাব নাযিল না করার ওয়াদা কি কেবল নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর শারীরিক উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি আত্মিক উপস্থিতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকর্মের সূচনাকাল থেকে রু করে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিলোকের জন্য সর্বজনীন রহমত (সূরাহ্ আল্- আম্বিয়া' : ১০৭), তবে তাঁর উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ রহমতের কারণ (সূরাহ্ আল্- আনফাল্ : ৩৩)। তাঁর এ বিশেষ রহমত হবার কারণে তৎকালীন আরবের কাফেররাও আযাব থেকে রেহাই পেয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তীকালীন মুসলমানরা তাঁর এ বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন এমনটি মনে করা কঠিন।

কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে, যুগে যুগে বিভিন্ন মুসলিম জনপদ আযাবের শিকার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে; এর কারণ কী? এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর আত্মিক উপস্থিতি বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ তাঁর সঠিক পরিচয় তথা তাঁর প্রচারিত তাওহীদ ও আখেরাত, তাঁর নবুওয়াত ও কোরআন মজীদ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও তার ওপর অকাট্য ঈমান এবং পরিপূর্ণভাবে তদনুযায়ী আমল, অন্য কথায়, কোরআন মজীদের যথাযথ অনুসরণ বেশীর ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীতে ও জনপদেই অনুপস্থিত; এমনকি একেকটি জনপদে এর যথাযথ অনুসরণকারী স্বলপসংখ্যক লোকও পাওয়া যাবে না। তাই আমরা দাবী করতে পারি না যে, তিনি সকল মুসলিম জনপদে ও সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আত্মিকভাবে উপস্থিত আছেন। কোনো জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোকের

দ্বারা যথার্থভাবেই তাঁর আত্মিক উপস্থিতি নিশ্চিত হলে অবশ্যই সে জনপদ ও জনগোষ্ঠী আযাব থেকে বেঁচে থাকবে।

(৪) আলোচ্য আয়াতের বাচনভঙ্গিও প্রমাণ করে যে, এতে নির্বিশেষে সমস্ত মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানানো হয় নি, বরং এখানে দাবীকৃত মু'জিযাহ্ই লক্ষ্য - যা বিপদসঙ্কেতস্বরূপ প্রদর্শন করা হয় এবং যা দেখানোর পর প্রত্যাখ্যাত হলে তার পরিণাম হচ্ছে আযাব ও ধ্বংস। কারণ, এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটি হচ্ছে আযাব ও ধ্বংস সংক্রান্ত।

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতটিতে এরশাদ হয়েছে :

(و ان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذاباً شديداً.)

"এমন কোনো জনপদ নেই ক্বিয়ামতের পূর্বে আমি যাকে ধ্বংস না করবো বা যার (যার অধিবাসীদের) ওপর আযাব নাযিল্ না করবো।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল্ : ৫৮)

অন্যদিকে আমাদের আলোচ্য আয়াতে ছামূদ্ জাতিকে প্রদত্ত মু'জিযাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে - যা প্রদর্শনের পরেও তারা নবীর ওপর ঈমান আনে নি এবং এ কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

এছাড়া এই একই আয়াতে এ জাতীয় মু'জিযাহকে চরমপত্র বা বিপদসঙ্কেত মূলক মু'জিযাহ্ রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ আয়াতটি و ما نرسل بالآيات الا تخويفاً বলে শেষ করা হয়েছে যার মানে হচ্ছে : "আর আমি তো চরমপত্রস্বরূপ (বা চূড়ান্ত সতর্ককরণের লক্ষ্যে ভীতিপ্রদর্শনস্বরূপ) ব্যতীত মু'জিযাহ্ পাঠাই না।"

এ সব নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতির লক্ষ্য হচ্ছে সেই দাবীকৃত মু'জিযাহ্ যা প্রদর্শিত হবার পর প্রত্যাখ্যানের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আযাব নাযিল।

কোরআন মজীদের আরো অনেক আয়াত থেকেও আলোচ্য আয়াতের এ তাৎপর্যেরই সমর্থন মিলে। কারণ, কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের পর্যালোচনা থেকে এটা অকাট্যভাবে

প্রমাণিত হয় যে, মোশরেকরা আযাব নাযিলের দাবী জানিয়েছিলো বা এমন সব মু'জিযাহ্ দাবী করেছিলো যা প্রত্যাখ্যানের অপরাধে অতীতের বিভিন্ন জাতির ওপর আযাব নাযিল্ হয়েছিলো।

আযাব সংক্রান্ত আয়াত সমূহ

কোরআন মজীদে কাফেরদের মু'জিযাহ্ দাবী প্রসঙ্গে যে সব আয়াত নাযিল্ হয়েছে সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) আযাব নাযিলের প্রস্তাব সংক্রান্ত আয়াত, (২) মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী ও তা প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত আয়াত এবং (৩) দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রত্যাখ্যানের পরিণতিতে আযাব নাযিল্ সংক্রান্ত আয়াত। আমরা এখানে এ তিন ধরনের আয়াত তিন ভাগে উল্লেখ করবো :

(১) আযাব নাযিলের প্রস্তাব সংক্রান্ত আয়াত :

(و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون.)

"আর তারা (মোশরেকরা) যখন বললো : "হে আল্লাহ্! এটা (কোরআন) যদি তোমার পক্ষ থেকে (নাযিলকৃত) সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওপর আসমান থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা আমাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল্ করো।" কিন্তু (হে রাসূল!) আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি (আযাব) প্রদান করবেন না, তেমনি তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদের ওপর আযাব নাযিল্ করবেন না।" (সূরাহ্ আল্- আনফাল্ : ৩২- ৩৩)

(قل أ رأيتم ان اتكم عذاباً به بياتاً او نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون.)

"(হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন : তোমরা কি এ অবস্থাটা দেখেছো যে, অপরাধীরা তাঁর কাছ থেকে যার আগমনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে সেই আযাব যদি তাদের গৃহে অবস্থান কালে (রাতের বেলা) অথবা দিনের বেলা এসে যায় (তখন কেমন হবে)?" (সূরাহ্ ইউনুস : ৫০)

(و لئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه.)

“আমি যদি তাদের শাস্তিকে কয়েক দিনের জন্য পিছিয়ে দেই তাহলে তারা অবশ্যই বলবে : কিসে তা রোধ করলো?” (সূরাহ্ হূদ : ৮)

(و يستعجلونک بالعذاب. و لو لا اجل مسمى لجائهم العذاب. و ليأتينهم بغتة و هم لا يشعرون.)

“আর (হে রাসূল!) তারা আপনার কাছে তাড়াহুড়া করে আযাব প্রার্থনা করছে, কিন্তু (ক্বিয়ামতের জন্য) যদি একটি নির্ধারিত সময়সীমা না থাকতো তাহলে অবশ্যই তাদের ওপর আযাব এসে যেতো এবং তা এসে যেতো এমন আকস্মিকভাবে যে, তারা তা বুঝতেও পারতো না (বা ‘তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারছে না)।” (সূরাহ্ আল্- ‘আনকাবূত্ : ৫৩)

(২) মু‘জিযাহ্ দাবী করা সংক্রান্ত আয়াত :

(و اذا جائتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نُؤتى مثل ما اوتى رسل الله. الله اعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله و عذاب شديد بما كانوا يمكرون.)

“আর যখনই তাদের কাছে মু‘জিযাহ্ এসে যাবে তখনই তারা বলবে : “আল্লাহর রাসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না তা আমাদেরকেও দেয়া হবে ততোক্ষণ আমরা ঈমান আনবো না।” আল্লাহ্ই অধিকতর অবগত যে, তাঁর রিসালাত কা’কে দেবেন। এই অপরাধীদের ওপর তাদের প্রতারণা ও অপকৌশলের কারণে খুব শীঘ্রই আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা- গঞ্জনা ও কঠিন শাস্তি এসে আপতিত হবে।” (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ১২৪)

এখানে অচিরেই [হযরত রাসূলে আকরামের (ছ্বাঃ) তাদের মাঝে না থাকা অবস্থায় অর্থাৎ তাঁর হিজরতের পরে] মক্কার মোশরেকদের ওপর লাঞ্ছনা- গঞ্জনা চেপে বসার ও তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে - যা বদর যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের কাছে তিন গুণেরও বেশী জনশক্তি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হয়েও তাদের পরাজিত হওয়া ও তাদের অনেকের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়।

(بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هوا شاعر.فاليأتنا بآية كما ارسل الاولون.)

“বরং তারা বলে : এ তো (রাসুলের নবুওয়াত- দাবী ও উপস্থাপিত কোরআন) এক অলীক স্বপ্ন; না, বরং সে নিজেই তা রচনা করেছে; না, বরং সে একজন কবি। তা না হলে সে আমাদের

জন্য মু‘জিযাহ্ নিয়ে আসুক ঠিক যেভাবে পূর্ববর্তীদের জন্য (মু‘জিযাহ্) পাঠানো হয়েছিলো।” (সূরাহ্ আল্- আম্বিয়া’ : ৫)

(فلما جائهم الحق من عندنا قالوا لو لا اوتى مثل ما اوتى موسى. او لم يكفروا بما اوتى موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا و قالوا اِنا بكل كافرون.)

“অতঃপর আমার নিকট থেকে যখন তাদের কাছে সত্য এসে সমুপস্থিত হলো তখন তারা বললো : “কেন আমাদেরকে তা দেয়া হলো না যা মূসাকে দেয়া হয়েছিলো?” ইতিপূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিলো তাকে কি তারা (এদের মতো কাফেররা) প্রত্যাখ্যান করে নি? আর তারা বলেছিলো : “এতদুভয়ই (লাঠি ও উজ্জ্বল হাত) হচ্ছে সুস্পষ্ট জাদু।” তারা আরো বলেছিলো : “আমরা এর পুরো ব্যাপারটাকেই প্রত্যাখান করছি।” (সূরাহ্ আল্- ক্বাছ্বাছ্ব : ৪৮)

(৩) দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রত্যাখ্যানের পরিণতি সংক্রান্ত আয়াত :

(قد مكر الذين من قبلهم. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.)

“তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অপকৌশলের আ য় নিয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের বাড়ীঘরের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিলেন, ফলে তাদের ওপর ছাদ নিপতিত হলো, আর এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আযাব এলো যে সম্পর্কে তারা ধারণা করে নি।” (সূরাহ্ আন্- নাহল্ : ২৬)

(كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.)

“তাদের পূর্ববর্তীরা (আল্লাহর কালামকে) প্রত্যাখ্যান করেছিলো। অতঃপর এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আযাব এলো যে সম্পর্কে তারা ধারণা করে নি।” (সূরাহ্ আয্- যুমার্ : ২৫)

মোট কথা, আমাদের আলোচ্য মু‘জিযাহ্ সংক্রান্ত আয়াতটিতে সেই মু‘জিযাহর কথা বলা হয়েছে হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ হয়ে যাবার পরেও জিদ ও গোঁয়ার্তুমি বশতঃ কিছু লোক যা দাবী করেছিলো এবং যার পিছনে সত্যান্বেষিতা ও বাস্তবদর্শিতার অস্তিত্ব ছিলো না। আলোচ্য আয়াতে এ জাতীয় দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। সব ধরনের মু‘জিযাহ্, এমনকি

প্রাথমিক পর্যায়ের মু‘জিযাহ্ও - যা মানুষের হেদায়াত ও সত্যকে সহজে চিহ্নিতকরণযোগ্য করার লক্ষ্যে প্রদর্শন করা হয়, তা- ও প্রদর্শন করা হবে না - এমন কথা বলা হয় নি।

উক্ত আয়াত থেকে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করেছি তার সপক্ষে উল্লিখিত দলীল- প্রমাণ ছাড়াও কোরআন মজীদে আরো অনেক দলীল- প্রমাণ রয়েছে।

এছাড়া উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসলমানদের সকল ধারার সূত্রে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছ রয়েছে যা থেকে আমাদের গৃহীত অর্থের সমর্থন মেলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে এ ধরনের দু’টি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি :

(১) হযরত ইমাম বাক্বের্ (‘আঃ) এরশাদ করেন : কিছু লোক হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিকট মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী জানায়। তখন জিবরাঈল (‘আঃ) অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেছেন : দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের পথে পূর্ববর্তীদের দ্বারা এ জাতীয় মু‘জিযাহ্ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি ছাড়া আর কোনো বাধাই নেই। অতএব, কুরাইশদের জন্য যদি তাদের দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রেরণ করি এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনয়ন না করে তাহলে পূর্ববর্তীদেরই ন্যায় তাদের ওপরও গযব নাজিল হবে। এ কারণেই এ জাতীয় মু‘জিযাহ্ প্রেরণকে আমি পিছিয়ে দিয়ে থাকি।” (تفسير برهان- ٦٠٧/١.)

(২) ইবনে আব্বাস (‘আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কাহর অধিবাসীরা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে তাদের জন্য ছ্বাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করতে এবং মক্কাহর আশেপাশের পাহাড়গুলোকে অপসারণ করতে বলে - যাতে তা সমভূমিতে পরিণত হয় এবং তারা সেখানে কৃষিকাজ করতে পারে।

ঠিক এ সময় হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ওপর এ মর্মে ওয়াহী নাযিল্ হয় যে, ‘আপনি যদি চান তো আমি তাদের দাবীকে উপেক্ষা করবো (অর্থাৎ তাদের দাবী পূরণ করবো না); হয়তোবা তাদের মধ্যকার কিছু লোক ঈমান আনয়ন করবে। আর আপনি যদি চান তাহলে তাদের

দাবী পূরণ করবো। কিন্তু এ অবস্থায় তারা যদি তাকে (প্রদর্শিত মু'জিযাহকে) প্রত্যাখ্যান করে তাহলে পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেবো।'

তখন হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) দো'আ করলেন : "হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি দয়া করুন এবং তাদেরকে অবকাশ প্রদান করুন।"

অতঃপর এ আয়াত নাযিল্ হলো : "মু'জিযাহ্ পাঠানো থেকে আমাকে এ বিষয়টি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই বিরত রাখে নি যে, প্রথম যুগের লোকেরা (অতীতের লোকেরা) মু'জিযাহকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। (উদাহরণস্বরূপ,) আমি ছামূদ জাতির নিকট পরীক্ষাস্বরূপ একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তার ওপর যুলুম করেছিলো। আর আমি তো চরমপত্রস্বরূপ (বা চূড়ান্ত সতর্ককরণের লক্ষ্যে ভীতিপ্রদর্শন স্বরূপ) ব্যতীত মু'জিযাহ্ পাঠাই না।" (٧٤/١٠-تفسير طبری.)

এ প্রসঙ্গে আরো বহু হাদীছ রয়েছে ; তাফসীর ও হাদীছের গ্রন্থাবলীতে তা দেখা যেতে পারে।

মু‘জিযাহর দাবী প্রত্যাখ্যানের দলীল ২ -

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া আর কোনো মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন না বলে যে সব আয়াতের দলীল পেশ করা হয় তার মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত সমূহ হচ্ছে :

(و قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا. او تکون لک جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجيراً. او تسقط السماء کما زعمت علينا کسفاً او تأتي بالله و الملائکة قبيلاً. او يکون لک بيت من زخرف او ترقی فی السماء و لن نؤمن لرُقيک حتی تنزل علينا کتابا نقرؤه. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا.)

“তারা (মোশরেকরা) বললো : আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার ওপর ঈমান আনবো না যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করো, অথবা তুমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানের অধিকারী হও - যার মধ্য থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে, অথবা আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের মাথার ওপরে আপতিত করো, অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাযির করো, অথবা তুমি স্বর্ণনির্মিত গৃহের আধিকারী হও, অথবা তুমি আকাশে উড্ডয়ন করো, আর এ অবস্থায়ও আমরা কখনোই তোমার ওপরে ঈমান আনয়ন করবো না যদি না তুমি আসমান থেকে আমাদের জন্য একটি লিখিত গ্রন্থ বা পত্র নাযিল্ করাও যা আমরা পড়ে দেখবো। (হে রাসূল! এদেরকে) বলুন : আমার প্রভু পরম প্রমুক্ত। আর আমি একজন মানুষ রাসূল ছাড়া আর কী?” (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল্ : ৯০- ৯৩)

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন না বলে যারা দাবী করে তাদের বক্তব্য : এ আয়াত সমূহ থেকে বোঝা যায়, মোশরেকরা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কাছে মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের জন্য দাবী জানিয়েছিলো। কিন্তু তিনি এ সব মু‘জিযাহ্ আনয়নে অস্বীকৃতি জানান ও তা আনা থেকে বিরত থাকেন এবং মোশরেকদের সামনে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন : “আমি একজন মানুষ ব নই। আর মানুষ এ

জাতীয় কাজ সম্পাদনে একেবারেই অক্ষম।” এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ব্যতীত অন্য কোনো মু‘জিযাহ্‌র অধিকারী ছিলেন না।

জবাব : এ বক্তব্যের অনেকগুলো জবাব দেয়া চলে। এখানে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে এরূপ কয়েকটি জবাবের উল্লেখ করবো :

অত্র আয়াত সমূহের বক্তব্য অনুযায়ী মোশরেকরা বেশ কতোগুলো মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী করেছিলো। আর এগুলো হচ্ছে সেই সব মু‘জিযাহ্‌রই অন্তর্ভুক্ত মোশরেকরা জিদ, গোঁয়ার্তুমি ও অন্ধ বিদ্বেষ বশতঃ যা প্রদর্শনের দাবী করেছিলো। হুজ্জাত্ পরিপূর্ণ হওয়ার ও সত্য অকাট্যভাবে প্রস্ফূটিত হওয়ার পরে একগুঁয়েমিবশতঃ তারা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিকট এ সব মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছিলো। আর দাবীকৃত মু‘জিযাহ্‌র (معجزات اقتراحی) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচিত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি।

অতএব, অত্র আয়াত সমূহও ইতিপূর্বে আলোচিত আয়াতের ন্যায় দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ সম্পর্কিত - যা মোশরেকরা একগুঁয়েমি ও গোঁয়ার্তুমি বশতঃ দাবী করেছিলো। এ আয়াতগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের মু‘জিযাহ্ সংক্রান্ত নয় যা নবুওয়াত প্রমাণ ও মানুষের পথনির্দেশের জন্য আনীত হয়। কারণ,

প্রথমতঃ তারা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য তাদের পসন্দসই উল্লিখিত কয়েকটি মু‘জিযাহ্‌র মধ্য থেকে একটি আনয়নের দাবী জানায় এবং তাঁর নবুওয়াত স্বীকার করার জন্য এ মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের শর্ত আরোপ করে। সত্যি সত্যিই যদি তারা তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে আগ্রহী থাকতো এবং জেনে বুঝে সত্যের বিরুদ্ধে জিদ ও একগুঁয়েমির পরিচয় না দিতো তাহলে নবীর নবুওয়াত প্রমাণে সক্ষম যে কোনো মু‘জিযাহ্‌কেই তারা তাঁর নবুওয়াতকে মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করতো এবং সে পন্থায়ই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নিতো। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মু‘জিযাহ্ নির্দিষ্ট করে দেয়ার ও তা প্রদর্শনের দাবী করার পিছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই।

দ্বিতীয়তঃ তারা বলেছিলো : “ . . . অথবা তুমি আকাশে উড্ডয়ন করো, আর এ অবস্থায়ও আমরা তোমার ওপরে ঈমান আনয়ন করবো না যদি না তুমি আসমান থেকে আমাদের জন্য একটি লিখিত গ্রন্থ্ বা পত্র নাযিল্ করাও যা আমরা পড়ে দেখবো।”

আসলেই তারা যদি সত্যান্বেষী হতো তাহলে এভাবে তাদের অযৌক্তিক শর্তারোপ ও একগুঁয়েমির আ য় গ্রহণের এবং আসমান থেকে গ্রন্থ্ বা পত্র আসার দাবী ও ছুতার আ য় গ্রহণের পিছনে কী কারণ ছিলো? ধু আকাশে উড্ডয়নই কি মু‘জিযাহ্ হিসেবে যথেষ্ট ছিলো না? এবং তা কি তাঁর নবুওয়াত প্রমাণে যথেষ্ট হতো না? তাদের এ ধরনের অর্থহীন ও অযৌক্তিক প্রস্তাব - যা নেহায়েতই তাদের খেয়ালখুশীর ওপর ভিত্তিশীল ছিলো এবং বিচারবুদ্ধির দাবী ছিলো না - এগুলো কি তাদের জিদ ও একগুঁয়েমি এবং সত্যের মোকাবিলায় তাদের অন্ধ গোয়ার্তুমির পরিচায়ক ছিলো না?

“. . . অথবা আকাশে উড্ডয়ন করো” বলার পরই বলা যে, তা করলেও তারা তাঁকে নবী হিসেবে মানবে না, বরং আসমান থেকে গ্রন্থ্ বা পত্র নাযিলের শর্তারোপ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশে উড্ডয়ন ও গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়ন - উভয়টি সম্পাদিত হলেও তারা ঈমান আনতো না, বরং নতুন কোনো ছুতা বের করতো। হয়তো তারা বলে বসতো : “আকাশে উড্ডয়ন ও গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়ন - উভয়ই জাদু।” অতএব, এ মু‘জিযাহ্ দেখিয়ে তাদের হেদায়াতের কোনোই আশা ছিলো না।

(২) আমাদের দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে যে জবাব দানের জন্য আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে তাঁকে মু‘জিযাহ্ আনয়নে অক্ষমতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয় নি, বরং রাসূলের যবানীতে سبحان ربی বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, কোনো অলৌকিক কাজ সম্পাদনে অক্ষমতা থেকে আল্লাহ্ তা‘আলা মুক্ত ও পবিত্র এবং মানবিক বিচারবুদ্ধিতে যা সম্ভব এমন যে কোনো কাজ সম্পাদনেই তিনি সক্ষম। কিন্তু তিনি দৃষ্ট হওয়ার মতো দুর্বল বশিষ্ট্যের উর্ধে, তেমনি শরীরী রূপে মানুষের সামনে আবির্ভূত

হবার মতো সসীমও তিনি নন। আর তিনি এমনই সুমহান যে যে কোনো মানুষের যে কোনো অর্থহীন খেলো প্রস্তাবেই তিনি সাড়া দেন না। তেমনি নবীও মানুষ ব নন যিনি আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ-নিষেধের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান থাকেন। আর সমস্ত বিষয়ই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ আল্লাহ্ তা'আলার হাতে; তিনি যা চান তা-ই সম্পাদন করেন এবং যেভাবে চান সেভাবেই করেন।

মোশরেকরা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর নিকট যে সব মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের জন্য দাবী জানিয়েছিলো - যা উক্ত আয়াত সমূহে উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে কতোগুলো হচ্ছে অসম্ভব ধরনের দাবী। আর বাকীগুলো যদিও অসম্ভব ধরনের নয়, কিন্তু তা নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে দলীল স্বরূপ হতে পারে না। সুতরাং দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শনযোগ্য হলেও এ ধরনের দাবী পূরণ করা অর্থহীন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত সমূহ অনুযায়ী, মোশরেকরা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর সামনে ছয়টি মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের জন্য দাবী জানিয়েছিলো। দাবীকৃত এ ছয়টি মু'জিযাহর মধ্যে তিনটি মু'জিযাহর দাবী বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে নেহায়েতই অসম্ভব ধরনের দাবী, আর বাকী তিনটি মু'জিযাহর দাবী যদিও অসম্ভব ধরনের নয়, কিন্তু তা নবুওয়াত প্রমাণের জন্য দলীল স্বরূপ হতে পারে না।

মোশরেকদের দাবীকৃত তিনটি অসম্ভব মু'জিযাহ্ হচ্ছে :

(১) আসমান ভেঙ্গে পড়া :

নভোমণ্ডলের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ও ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হওয়া একটা অসম্ভব ধরনের দাবী। কারণ, এ কাজের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ধরণীপৃষ্ঠে এক বীভৎস ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী-প্রজাতির বিলুপ্তি। আর এ ধরনের ঘটনা কেবল তখনই সংঘটিত হবে যখন এ বিশ্বের আয়ুষ্কাল সমাপ্ত হয়ে যাবে।

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এবং কোরআন মজীদেও এ সম্পর্কে আভাস দেয়া হয়েছে :

(اذا السماء انشقت.)

“যখন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যাবে।” (সূরাহ্ আল্- ইনশিক্বাাক্ : ১)

(اذا السماء انفطرت.)

“যখন নভোমণ্ডল এলোমেলো- বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।” (সূরাহ্ আল্- ইনফিতার্ : ১)

(ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفاً من السماء.)

“আমি চাইলে তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে ফেলবো অথবা তাদের ওপরে নভোমণ্ডলের টুকরা নিপতিত করবো।” (সূরাহ্ সাবাা’ : ৯)

মোশরেকদের দাবী অনুযায়ী নভোমণ্ডলকে টুকরো টুকরো করে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত করানো এ কারণে অসম্ভব যে, তা করা হলে এ জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কাজটি (ক্বিয়ামত্ সংঘটন) করতে হবে। কিন্তু তা খোদায়ী পরম জ্ঞানের দাবীর পরিপন্থী। কারণ, পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছা এই যে, তিনি এ ভূপৃষ্ঠে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখবেন এবং সকল দিক থেকে তাকে পূর্ণতায় উপনীত হবার সুযোগ দেবেন ও সেদিকে পথপ্রদর্শন করবেন। আর যে কোনো প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব যে, অন্যকে খুশী করার জন্য স্বীয় প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের বরখেলাফ কাজ করবেন। এমতাবস্থায় পরম জ্ঞানময় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষে তাঁর কল্যাণময় সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কাজ সম্পাদন কী করে সম্ভব হতে পারে?

(**২) আল্লাহকে নিয়ে আসা** :

এটা যে অসম্ভব কাজ তা যে কোনো সুস্থ বিবেকের নিকটই সুস্পষ্ট।

কাফেররা বলেছিলো : ‘আল্লাহকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো যাতে আমরা তাঁকে স্বচক্ষে দেখে তাঁর ওপর ঈমান আনতে পারি।’ আর এ হচ্ছে এমন দাবী যা পূরণ করা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা বস্তুগত সত্তা নন এবং দৃষ্টিশক্তি তাঁকে ধারণ করতে পারে

না। অতএব, তাঁকে দেখা সম্ভবপর নয়। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলাকে দর্শনযোগ্য হতে হলে অবশ্যই সসীম হতে হবে, একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং তাঁর রং ও সুনির্দিষ্ট আকৃতি থাকতে হবে। আর এ সব হচ্ছে সসীম ও বস্তুগত সৃষ্টির বশিষ্ট্য; আল্লাহ্ তা‘আলা এ সব বশিষ্ট্য থেকে প্রমুক্ত। সুতরাং দেখার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলাকে নিয়ে এসে হাযির করা সম্ভব নয়।

অবশ্য আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের পক্ষ থেকে ফেরেশতা নিয়ে আসার দাবীও রয়েছে। তবে তারা হয়তো আলাদাভাবে নয়, বরং আল্লাহর সাথে ফেরেশতা আনার কথা বলেছে। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, তারা আলাদাভাবে ফেরেশতা নিয়ে আসার দাবী করেছে, সে ক্ষেত্রে বলতে হয় :

প্রথমতঃ ফেরেশতা অবস্তুগত সত্তা, সুতরাং চর্মচক্ষে ফেরেশতাকে দেখা যেতে পারে না। কেবল নবী-রাসূলগণ (‘আঃ) ও আল্লাহর খাছ্ব বান্দাহগণ তাদেরকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। (এ প্রত্যক্ষকরণের স্বরূপও কেবল তাঁদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব।)

দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতারা বস্তুগত শরীর ধারণ করে হাযির হতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তারা সত্যিই ফেরেশতা কিনা সে সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের সন্দেহ হতে পারে। আর অস্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করে হাযির হলেও সন্দিগ্ধমনা লোকেরা তাদেরকে জ্বিন্, শয়ত্বান বা জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ভিত্তিহীন দৃশ্য মনে করতে পারে।

তৃতীয়তঃ ফেরেশতার মাধ্যমে নবীকে পরিচিত করানো খোদায়ী পরম জ্ঞানের দাবীর পরিপন্থী। কারণ, সে ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য মানুষের বিচারবুদ্ধির আর কোনো ভূমিকা থাকে না, ফলে তার আর কোনো প্রয়োজনও থাকে না। ধু তা-ই নয়, এরূপ হলে মানুষের স্বাধীনতাও থাকতো না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মানুষ ফেরেশতার দ্বারা পরিচয়কৃত ও পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একজন অস্বাভাবিক মানুষ হিসেবে নবীকে ভয়ের কারণে মেনে চলবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়।

চতুর্থতঃ আকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা আগমন করলে সে ক্ষেত্রে কাফেররা তাদেরকে জ্বিন্, শয়ত্বান বা জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ভিত্তিহীন দৃশ্য মনে করে প্রত্যাখ্যান করলে দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শিত হবার পর প্রত্যাখ্যানের অপরাধে খোদায়ী নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বেই ওয়াদা করেছেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তাদেরকে আযাব দেবেন না।

(**৩) আল্লাহর কাছ থেকে গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়ন** :

এ- ও একটি অসম্ভব কাজ। কারণ, তারা আল্লাহর নিকট থেকে গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়নের যে দাবী জানিয়েছিলো তার উদ্দেশ্য "আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্বলাভকৃত কোনো গ্রন্থ্ বা পত্র" ছিলো না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার 'স্বহস্তে' লিখিত গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়ন। কারণ, তাদের মতে, এ ধরনের গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়নের জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর জন্য আসমানে উড্ডয়ন ও আল্লাহর কাছে গমনের প্রয়োজন ছিলো যাতে তাঁর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার 'স্বহস্তে' লিখিত গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়ন করা সম্ভব হয়। অন্যথায় "আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্বলাভকৃত কোনো গ্রন্থ্ বা পত্র" যদি তাদের উদ্দেশ্য হতো তাহলে তারা এ জন্য তাঁর আসমানে উড্ডয়নের শর্ত আরোপ করতো না।

আর আল্লাহর স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ্ বা পত্র আনয়নের দাবী যে পূরণযোগ্য নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ, আল্লাহ্ মানুষের ন্যায় বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের অধিকারী নন যে, কলম হাতে নিয়ে চিঠি লিখবেন। تعالى الله عن ذالک علواً کبیراً - তাদের কল্পিত এহেন দুর্বলতার বহু উর্ধে মহান আল্লাহ্ তা'আলা।

বলা বাহুল্য যে, মোশরেকদের দাবীর উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্ট কোনো গ্রন্থ্ বা পত্রও হতো তাহলেও তা আনয়নে কোনো ফল হতো না। কারণ, উদাহরণস্বরূপ সর্বসমক্ষে যদি আকাশ থেকে কোনো গ্রন্থ্ বা পত্র নেমে আসতো তাহলে তারা একে জ্বিন্ বা শয়ত্বানের কাজ বলে আখ্যায়িত করতো এবং বলতো যে, মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর সাথে জ্বিন বা শয়ত্বানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, এ কারণে জিন্ বা শয়ত্বান তা লিখে আকাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছে। অথবা

তারা যেমন হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)কে জাদুকর বলে অভিহিত করতো, তার ভিত্তিতে তারা দাবী করতো যে, তিনি জাদুর বলে এ ধরনের একটি গন্থ বা পত্র নিজেই তরী করে তা আকাশ থেকে নামিয়ে এনেছেন। আর এভাবে, দাবীকৃত মু'জিযাহ্ প্রদর্শিত হবার পরেও প্রত্যাখ্যান করার অপরাধে তাদের জন্য আযাব নাযিল করা অপরিহার্য হয়ে যেতো। ফলে লাভের কিছুই হতো না। কারণ, তারা তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত মু'জিযাহ্ দেখে বিচারবুদ্ধির রায় থেকে সত্যকে জানতে পেরেও নতুন করে মু'জিযাহ্ দাবী করেছিলো।

আর তারা অপর যে তিনটি মু'জিযাহ্ দাবী করেছিলো তা কার্যকর করা সম্ভব ছিলো বটে, কিন্তু তাদের এ প্রস্তাব ছিলো বিচারবুদ্ধির রায়ের সাথে সাংঘর্ষিক। তাদের দাবীগুলো ছিলো :

(১) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক ঝর্ণাধারা প্রবাহিতকরণ।

(২) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পানির নহর সমৃদ্ধ খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানের অধিকারী হওয়া।

(৩) হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর স্বর্ণগৃহের অধিকারী হওয়া।

যদিও আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক মোশরেকদের এ দাবীগলো পূরণ করা সম্ভবপর ছিলো, কিন্তু নবুওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এ তো অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার যে, হতে পারে কোনো ব্যক্তি এ সবের অধিকারী, কিন্তু নবী- রাসূল হওয়া তো দূরের কথা, সে আল্লাহর ওপর ঈমানের অধিকারীও নয়। অতএব, যেহেতু এ ধরনের বিষয় নবুওয়াতের দাবীর সাথে আদৌ সম্পর্কিত নয় এবং নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণে সক্ষম নয়, সে ক্ষেত্রে নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে এ ধরনের কাজ সম্পাদন করা অর্থহীন ব নয়। আর নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মাধ্যমে অর্থহীন কর্ম সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়।

কেউ হয়তো ধারণা করতে পারে যে, এই শেষোক্ত তিনটি বিষয় স্বাভাবিক পন্থায় হস্তগত হলে তা নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণকারী হতে পারে না বটে, কিন্তু একই বিষয় অস্বাভাবিক

পন্থায় হস্তগত হলে তা নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণকারী হতে পারে। কারণ, এ ক্ষেত্রে তা মু'জিযাহ্ রূপে গণ্য হবে।

কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, যদিও এ তিনটি জিনিস অস্বাভাবিক পন্থায় হস্তগত হলে তা নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণকারী হতে পারে, কিন্তু মোশরেকদের দাবী তা ছিলো না। বরং তাদের অভিমত ছিলো এই যে, নবী করীম (ছ্বাঃ)কে স্বাভাবিক পন্থায়ই প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী থাকা উচিত, অস্বাভাবিক পন্থায় নয়। কারণ, তাদের অভিমত ছিলো এই যে, নবুওয়াতের পদ কিছুতেই দরিদ্র লোকের ওপর অর্পিত হওয়া উচিত নয়।

মোশরেকদের এ অভিমতের কথা কোরআন মজীদেও উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :

(و قالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.)

"মোশরেকরা বললো : এ কোরআন কেন দুই শহরের (মক্কাহ্ ও তায়েফের) কোনো বিরাট (ধনী ও প্রভাবশালী) ব্যক্তির ওপর নাযিল্ হলো না?" (সূরাহ্ আয্- যুখরূফ : ৩১)

এ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই তারা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হতে এবং ধনসম্পদের ক্ষেত্রে অন্যদের ওপর ে ষ্ঠত্বের অধিকারী হতে বলে। আর বলাই বাহুল্য যে, তা নবুওয়াত- দাবীর সত্যতা প্রমাণকারী হতে পারে না।

আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তারা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে বাগান ও স্বর্ণগৃহের অধিকারী হতে বলে এবং আরো অনেক কাজ আঞ্জাম দেয়ার শর্ত আরোপ করে। যদি ধরেও নেই যে, তারা তাঁকে অস্বাভাবিক পন্থায়ই বাগান, ঝর্ণা ও স্বর্ণগৃহের অধিকারী হতে বলেছে, তবুও তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তারা যদি অস্বাভাবিক পন্থায় এসব জিনিসের উদ্ভবকে মু'জিযাহ্ রূপে গণ্য করে তার ভিত্তিতে নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করতে ও সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে ঈমান আনয়নে প্রস্তুত থাকতো তাহলে এতো জটিল ও বহুবিধ শর্তারোপের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিলো না। বরং এ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পন্থায় মাত্র এক গুচ্ছ আঙ্গুর বা এক ভরি স্বর্ণ আনয়নই মু'জিযাহ্ হিসেবে যথেষ্ট হতো

এবং অস্বাভাবিক কাজ হিসেবে তা-ই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত-দাবীর সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট হতো।

আর মোশরেকরা যে বলেছিলো, "যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করো", - এ কথার মানে এ ছিলো না যে, তারা তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ঝর্ণা তরী করতে বলেছিলো, বরং তাদের 'আমাদের জন্য' কথাটির উদ্দেশ্য ছিলো 'আমাদের দাবী অনুযায়ী' বা 'আমাদের কথা মতো' বা 'আমাদের সন্তুষ্টির জন্য' (আর আরবী বাকরীতিতে এরূপ প্রচলন আছে)। তারা বলেছিলো : আমাদের দেখানোর জন্য তুমি একটি ঝর্ণার অধিকারী হও যাতে আমরা তোমাকে নবুওয়াতের উপযুক্ত বলে মনে করতে পারি।

তাছাড়া অস্বাভাবিক পন্থায় (মু'জিযাহর মাধ্যমে) একজন নবীর প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া দ্বীনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থীও বটে। কারণ, সে ক্ষেত্রে একদিকে লোকেরা নবীর কাছে এসে তাদের জন্যও অনুরূপ পন্থায় পার্থিব ধনসম্পদের ব্যবস্থা করার দাবী জানাতো, অন্যদিকে স্থান-কালের ব্যবধান জনিত কারণে নবীর মাধ্যমে বিনা মে সম্পদের মালিক হতে না পারা দরিদ্র জনগণের জন্য নবীর নতিক শিক্ষা অনুসরণ না করার অনু লে তা বাহানা স্বরূপ হতো এবং তারা বলতো যে, নবীর তো কোনো অভাব ছিলো না; তিনি বিনা মে মু'জিযাহর মাধ্যমে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন বিধায় তাঁর জন্য হারাম উপার্জন বর্জন করা ও আল্লাহর 'ইবাদত করা সহজ ছিলো।

মু‘জিযাহর দাবী প্রত্যাখ্যানের দলীল ৩ -

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন না বলে যারা দাবী করে তাদের এ দাবীর সপক্ষে তৃতীয় পর্যায়ের যে আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে তা হচ্ছে :

(و يقولون لو لا انزل عليه آية من ربه. فقل انما الغيب لله فانتظروا. انى معكم من المنتظرين.)

“আর তারা (মোশরেকরা) বলে : কেন তার ওপর মু‘জিযাহ্ নাযিল্ হয় না? (হে রাসূল!) বলে দিন : অদৃশ্য (গ্বায়ব্/ মু‘জিযাহ্) তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। অতএব, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো; আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।” (সূরাহ্ ইউনুস : ২০)

হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর জন্য কোরআন মজীদ ভিন্ন অন্য মু‘জিযাহ্ অস্বীকারকারীদের বক্তব্য : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোশরেকরা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিকট মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী করেছিলো। কিন্তু জবাবে তিনি তাদেরকে বলেন (অবশ্য আল্লাহর নির্দেশে) : ‘মু‘জিযাহ্ আমার এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়, বরং তা আল্লাহ্ তা‘আলারই এখতিয়ারে’। এ জবাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন না।

অবশ্য একই বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো কয়েকটি আয়াত রয়েছে যা তাৎপর্যের দিক থেকে উপরোক্ত আয়াতের সমার্থক বা কাছাকাছি। তা হচ্ছে :

(و يقولون الذين كفروا لو لا انزل عليه آية من ربه. انما انت منذر و لكل قوم هاد.)

“আর যারা কাফের হয়েছে তারা বলে : “কেন তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর মু‘জিযাহ্ নাযিল্ হয় না?” কিন্তু (হে রাসূল!) অবশ্যই আপনি সতর্ককারী; আর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্যই পথপ্রদর্শনকারী রয়েছে।” (সূরাহ্ আর্- রা‘দ্ : ৭)

(و قالوا لو لا نُزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية و لكن اكثرهم لا يعلمون.)

“তারা বলো : “কেন তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর মু‘জিযাহ্ নাযিল্ হয় না?” (হে রাসূল!) বলে দিন : অবশ্যই আল্লাহ্ মু‘জিযাহ্ নাযিল্ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোকই (প্রকৃত ব্যাপার) জানে না।” (সূরাহ্ : আল্- আন্‘আম্ : ৩৭)

জবাব : উপরোক্ত তিনটি আয়াত থেকে যে ধারণা করা হয়, দুইভাবে তার জবাব দেয়া যায় :

প্রথম জবাব : এ আয়াত সমূহে যে মু‘জিযাহর কথা বলা হয়েছে তার লক্ষ্য সমস্ত রকমের মু‘জিযাহ্ নয়, বরং কেবল দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ সমূহ - যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

কারণ, মোশরেকরা এটা দাবী করে নি যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) তাঁর নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা প্রমাণে সক্ষম এমন যে কোনো মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করুন। বরং তাদের দাবী ছিলো, তিনি যেন তাদের দাবী অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ মু‘জিযাহ্ প্রদর্শন করেন - যা তারা জিদ ও একগুঁয়েমি বশতঃ বা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে বিদ্রুপ করার লক্ষ্যে দাবী করেছিলো। কোরআন মজীদ বেশ কয়েক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছে এবং তাদের মু‘জিযাহ্- দাবীর লক্ষ্য- উদ্দেশ্য তুলে ধরেছে। এ জাতীয় কতক আয়াত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এবারে আরো কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করবো :

(و قالوا لو لا انزل عليه ملک.)

“আর তারা বললো : কেন তার ওপর ফেরেশতা নাযিল্ হয় না?” (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ৮)

(و قالوا يا ايها الذى نزل عليه الذکری انک لمجنون. لو ما تأتينا بالملائکة ان کنت من الصادقين.)

“আর তারা বললো : হে ঐ ব্যক্তি যার ওপরে স্মারক (কোরআন) নাযিল্ হয়েছে! নিশ্চয়ই তুমি পাগল। নচেৎ তুমি যদি (তোমার নবুওয়াত- দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদীদের অন্যতম হতে তাহলে কেন তুমি ফেরেশতাদের সহ আমাদের কাছে আসছো না?” (সূরাহ্ আল্- হিজর্ : ৬- ৭)

(و قالوا مال هذا الرسول يأکل الطعام و يمشی فی الاسواق. لو لا انزل اليه ملک فيکون معه نذيرا. او يُلقی اليه کنز او تکون له جنة يأکل منها. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا).

“আর তারা বলে : এ আবার কেমন রাসূল, যে খানা খায় এবং বাজার সমূহের মাঝে পথ চলে? কেন তার প্রতি একজন ফেরেশতা নাযিল্ হয় না যে তার সাথে থেকে (লোকদেরকে) সতর্ক করতো? অথবা তার কাছে বিশাল ধনভাণ্ডার চলে আসে না কেন? অথবা তার জন্য কেন একটি বাগান হচ্ছে না যেখান থেকে সে ভক্ষণ করতো? আর যালেম লোকেরা (ঈমানদারদেরকে) বলে : তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।” (সূরাহ্ আল্- ফুরক্বান্ : ৭- ৮)

এ আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোশরেকেরা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিকট থেকে বিশেষ ধরনের মু‘জিযাহ্ দাবী করেছিলো যা বিচারবুদ্ধির ওপরে ভিত্তিশীল ছিলো না। ইতিপূর্বেও আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে, একজন রাসূলের জন্য এ ধরনের প্রস্তাবে সাড়া দেয়া এবং নেহায়েতই একগুঁয়েমিবশতঃ দাবীকৃত মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনে সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বস্তুতঃ মোশরেকেরা সত্য অনুধাবনের লক্ষ্যে নয়, বরং জিদ ও একগুঁয়েমি বশতঃই হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নিকট তাদের খেয়ালখুশী মতো বিভিন্ন মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছিলো। অন্যথায় তারা যদি হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে তাঁর নবুওয়াত- দাবী প্রমাণে সক্ষম যে কোনো মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাতো এবং তার ভিত্তিতে ঈমান আনয়নে প্রস্তুত থাকতো তাহলে তিনি নেতিবাচক জবাব দিতেন না। বরং অন্ততঃপক্ষে কোরআন মজীদকে - যা বেশ কয়েক জায়গায় বিকল্প বা অনুরূপ মানের গ্রন্থ্ বা সূরাহ্ রচনার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে - তাদের সামনে মু‘জিযাহ্ রূপে উপস্থাপন করতেন।

মোট কথা, উল্লিখিত আয়াত সমূহে মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি সূচক যে কথা রয়েছে তা থেকে আমরা নিম্নোক্ত উপসংহারে উপনীত হতে পারি :

(১) যতো রকমের মু‘জিযাহ্ সম্ভব তার মধ্যে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ধু কোরআন মজীদকেই সমগ মানব জাতির প্রতি চ্যালেঞ্জ সহকারে পেশ করেছেন। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছাড়া অন্য কোনো মু‘জিযাহকে চ্যালেঞ্জ সহকারে উপস্থাপন সম্ভব ছিলো না। কারণ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন নবুওয়াতের অনিবার্য দাবী হচ্ছে চিরন্তন ও বিশ্বজনীন মু‘জিযাহ্।

আর এ জাতীয় মু'জিযাহ্ কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কারণ, অন্যান্য মু'জিযাহর পক্ষে চিরকালীন ও বিশ্বজনীন হওয়া সম্ভবপর নয়।

(২) মু'জিযাহ্ আনয়ন করা কোনো নবী-রাসূলের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। নবী ধু নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত। মু'জিযাহ্ সহ সমস্ত বিষয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও আদেশের অধীন। এমনকি, এ ক্ষেত্রে মানুষ মু'জিযাহ্ দাবী করলেও কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ নবীর এমন কোনো ক্ষমতা থাকে না যে, তিনি চাইলেই মু'জিযাহ্ নিয়ে আসতে পারবেন।

এ অবস্থা ধু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত নবী-রাসূলই ('আঃ) এ বিধির আওতাভুক্ত; আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে ব্যতীত কোনো নবী-রাসূলই ('আঃ) মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে সক্ষম ছিলেন না। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন:

(و ما كان لرسول ان يأتى بآية الا باذن الله. لكل اجل كتاب).

"কোনো রাসূলই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত মু'জিযাহ্ আনয়নে সক্ষম নয়। আর প্রত্যেক নির্ধারিত সময়ের জন্যই নির্ধারিত বিধি রয়েছে।" (সূরাহ্ আর্-রা'দ্ : ৩৮)

(و ما كان لرسول ان يأتى بآية الا باذن الله. فاذا جاء امر الله قضى بالحق و خسر هنالك المبطلون).

"কোনো রাসূলই আল্লাহর অনুমতিক্রমে ব্যতীত মু'জিযাহ্ আনয়নে সক্ষম নয়। অতঃপর যখন আল্লাহর ফরমান এসে যাবে তখন সত্যতা ও ন্যায়নীতি সহকারে ফয়ছালা হয়ে যাবে এবং বাতিলপন্থীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।" (সূরাহ্ আল্-মু'মিন্ : ৭৮)

দ্বিতীয় জবাব : হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু'জিযাহ্ দেয়া হয় নি বলে কোরআন মজীদের কতক আয়াতের ভিত্তিতে যে দাবী করা হয় তার জবাবে স্বয়ং কোরআন মজীদ থেকেই আরো কিছু আয়াত উদ্ধৃত করা সম্ভব - যা প্রমাণ করে যে, তিনি কোরআন মজীদ ছাড়াও আরো অনেক মু'জিযাহর অধিকারী ছিলেন। যেমন :

(اقتربت الساعة و انشق القمر. و ان يروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر).

“নির্ধারিত সময় এসে গেলো আর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হলো। আর তারা যদি কোনো মু‘জিযাহ্ দেখে তাহলে পাশ কাটিয়ে যায় এবং বলে : এ হচ্ছে এক অব্যাহত জাদু।”(সূরাহ্ আল্- ক্বামার্ :১- ২)

(و اذا جائتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتى رسول الله.)

“আর যখনই তাদের কাছে মু‘জিযাহ্ এসে যায় তখন তারা বলে : আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না যতোক্ষণ না আমাদেরকেও তা- ই দেয়া হয় যা দেয়া হয়েছে আল্লাহর রাসূলকে।” (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ১২৪)

উক্ত আয়াত সমূহে উল্লিখিত آية শব্দটি آية تكوينى (খোদায়ী সৃষ্টিক্ষমতার নিদর্শন) এবং মু‘জিযাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কোরআন মজীদের আয়াত অর্থে নয়। কারণ, এখানে কোরআন মজীদের আয়াত অর্থে ব্যবহৃত হলে ‘শোনা’ শব্দ ব্যবহৃত হতো, কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় নি। বরং প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার কথা বলা হয়েছে এবং তার পরবর্তী আয়াতেই দেখার কথা বলা হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতেও আয়াত ‘এসে যাওয়ার’ কথা বলা হয়েছে। এভাবে তিনটি আয়াতেই ‘আয়াত’ শব্দটি মু‘জিযাহ্ এবং آية تكوينى (খোদায়ী সৃষ্টিক্ষমতার নিদর্শন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত আয়াত সমূহের বক্তব্য অনুযায়ী, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়াও আরো অনেক মু‘জিযাহর অধিকারী ছিলেন। বরং سحر مستمر (অব্যাহত জাদু) কথাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) থেকে অনবরত এ জাতীয় মু‘জিযাহ্ প্রকাশ পেতো।

এই শেষোক্ত আয়াত সমূহের তাৎপর্য অনুযায়ী, ইতিপূর্বে উল্লিখিত ‘মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি মূলক আয়াত সমূহ’ থেকে যদি আমরা সমস্ত রকমের মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতির অর্থ গ্রহণ করি (যদিও এ অর্থ ঠিক নয় এবং আমরা প্রমাণ করেছি যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহে ধু দাবীকৃত মু‘জিযাহর কথা বলা হয়েছে - যা প্রদর্শিত হলে তা প্রত্যাখ্যানের অনিবার্য পরিণতি ছিলো আযাব নাযিল), তাহলে এ দুই ধরনের আয়াতের সমন্বয় থেকে আমাদেরকে এ

উপসংহারে উপনীত হতে হয় যে, "যে সব আয়াতে মু'জিযাহ্ প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে তা ধু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট যখন হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর পক্ষ থেকে মু'জিযাহ্ প্রদর্শিত হতো না, আর যে সব আয়াতে মু'জিযাহ্ প্রদর্শিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা পরবর্তী যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট - যখন তিনি মু'জিযাহ্ প্রদর্শন রু করেন।" আর এ ক্ষেত্রেও, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোনো মু'জিযাহর অধিকারী ছিলেন না - এ ধারণার ভিত্তিহীনতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচিত হলো তার সংক্ষিপ্ত উপসংহারে আমরা বলতে পারি :

(১) কোরআন মজীদের আয়াত হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কোরআন মজীদ ছাড়া অন্য মু'জিযাহ্ না থাকার কথা তো প্রমাণ করেই না, বরং কিছু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বহু মু'জিযাহর অধিকারী ছিলেন, যদিও বিরোধীরা তার ভিত্তিতে তাঁর ওপর ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলো না।

(২) মু'জিযাহ্ প্রদর্শন নবী- রাসূলগণের ('আঃ) স্বীয় এখতিয়ারাধীন কোনো বিষয় ছিলো না যা একজন নবী চাইলেই প্রদর্শন করতে পারতেন। বরং মু'জিযাহ্ পুরোপুরিভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অনুমতির ওপর নির্ভরশীল।

(৩) যিনি নবুওয়াত দাবী করেন তিনি তাঁর নবুওয়াতের দাবী প্রমাণের অপরিহার্য প্রয়োজন পরিমাণেই মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করেন এবং এভাবে সকলের জন্য তাঁর নবুওয়াতকে সুস্পষ্টভাবে ও সপ্রমাণিত রূপে তুলে ধরেন। এর চেয়ে বেশী পরিমাণ মু'জিযাহ্ নবীকে প্রদান করা যেমন আল্লাহর জন্য যরূরী নয়, তেমনি নবীর জন্যও যরূরী নয় যে, অপরিহার্য প্রয়োজনের বেশী মু'জিযাহ্ প্রদর্শন করবেন এবং লোকেরা তাদের খেয়ালখুশী মোতাবেক যে কোনো মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী করলেই তিনি তা দেখাবেন।

(৪) যে সব মু‘জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করার পরে প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণতিতে ধ্বংস ও বিপর্যয় অনিবার্য, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে সে ধরনের মু‘জিযাহ্ দেয়া হয় নি, যদিও অনেকে এ ধরনের মু‘জিযাহ্ প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছিলো।

(৫) সমস্ত নবী- রাসূলকে (‘আঃ) প্রদত্ত সমস্ত মু‘জিযাহর মধ্যে একমাত্র অবিনশ্বর মু‘জিযাহ্ - যা ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত মু‘জিযাহ্ রূপে টিকে থাকবে এবং যার সাথে মোকাবিলার জন্যে ক্বিয়ামত্ পর্যন্তকার সমস্ত বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর ওপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদ। আর তাঁকে প্রদত্ত অন্যান্য মু‘জিযাহ্ যদিও সংখ্যার দিক থেকে অনেক, তথাপি তা তাঁর নিজের যুগের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলো এবং এদিক থেকে তাঁর এ জাতীয় মু‘জিযাহ্ সমূহ, অবিনশ্বর না হওয়ার বিচারে অন্যান্য নবী- রাসূলকে (‘আঃ) প্রদত্ত মু‘জিযাহ্ সমূহের সমপর্যায়ভুক্ত।

তাওরাত্ নবুওয়াত্ (ছ্বাঃ) ইনজীলে হযরত মুহাম্মাদের -

কোরআন মজীদ বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে যে, হযরত মূসা (‘আঃ) ও হযরত ‘ঈসা (‘আঃ) রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এবং তাওরাত্ ও ইনজীলে তা উল্লিখিত আছে। উক্ত দুই মহান পয়গাম্বরই (‘আঃ) স্ব স্ব অনুসারীদেরকে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করে গেছেন।

কোরআন মজীদের এ পর্যায়ের আয়াত সমূহ থেকে আমরা এখানে দু’টি আয়াত উদ্ধৃত করছি :

(الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التورة والانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر)

“যারা (মুসলমানরা) সেই রাসূলের - উম্মী নবীর - অনুসরণ করে থাকে যার কথা তারা তাওরাত্ ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ দেখতে পেয়েছে; তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন।” (সূরাহ্ আল্- আ‘রা‌াফ্ : ১৫৭)

(و اذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدي من التورة و مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد.)

“আর যখন মরিয়ম- তনয় ‘ঈসা বললো : হে বনী ইসরাঈল্! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল; আমার পূর্ব থেকে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যতা স্বীকারকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূলের আগমন ঘটবে তাঁর আগমনের সুসংবাদদাতা।” (সূরাহ্ আছ্ব- ছ্বাফ্ : ৬)

উল্লেখ্য, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর এক নাম আহমাদ। জন্মের পরই মাতা ও পিতামহ কর্তৃক তাঁর এ দু’টি নাম রাখা হয়।

এ ছাড়া স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগে এবং তার পরবর্তী যুগেও, বহু ইয়াহূদী ও খৃস্টান হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াত্ স্বীকার করে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো এই যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগে ইয়াহূদী

ও খৃস্টানদের মধ্যে তাওরাত্ ও ইনজীলের যে সব সংস্করণ প্রচলিত ছিলো তাতে তাঁর আগমনের সুসংবাদ ছিলো।

তৎকালে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীলে যদি তাঁর নাম না থাকতো তাহলে তা তাঁর নবুওয়াত-দাবীকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বড় দলীল হিসেবে গণ্য হতো। ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা (এবং তাদের কাছ থেকে নে মোশরেকরাও) বলতে পারতো : ‘এই ব্যক্তি দাবী করছে যে, সে নবী এবং তার নাম তাওরাত্ ও ইনজীলে আছে, অথচ তাওরাত্ ও ইনজীলে তার নাম নেই। অতএব, তার এ দাবী মিথ্যা এবং মিথ্যাবাদী নবী হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।’ এর ভিত্তিতে তারা তাঁর পুরো দাওয়াতী মিশনকেই বানচাল করে দিতে পারতো।

কিন্তু তাওরাত্ ও ইনজীলে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী থাকার বিষয় তৎকালীন আরব ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের দ্বারা অস্বীকৃত না হওয়া, বরং তাদের মধ্য থেকে অনেকের তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ যুগে প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীলে অবশ্যই এ সুসংবাদ বর্তমান ছিলো।

এ থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিত- যাজকরা ঐ সময় প্রচলিত তাওরাত্ ও ইনজীলের কপিগুলো পরবর্তীকালে লুকিয়ে ফেলেন বা নষ্ট করে ফেলেন এবং ঐ সব কপিতে “মুহাম্মাদ্” ও “আহমাদ্” নাম দু’টি হুবহু উচ্চারণ সহ ব্যক্তিবাচক নাম হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও নতুনভাবে লিখিত পরবর্তীকালীন কপিগুলোতে তাঁরা এ নাম দু’টির শব্দগত অনুবাদ করেন এবং ‘পারাক্লিতাস’, ‘শান্তিদাতা’, ‘মুক্তিদাতা’, ‘প্রশংসিত জন’ ইত্যাদি রূপে উল্লেখ করেন। তবে একমাত্র বারনাবাসের ইনজীলে এ নাম দু’টি অনুবাদ করা হয় নি এবং বারনাবাস তা হুবহু উচ্চারণে লিখে গেছেন। এমনকি যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাওরাত্ ও ইনজীলে শব্দ দু’টি ব্যক্তিবাচক নাম হিসেবে নয়, বরং গুণবাচক নাম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছিলো, তাই তার অনুবাদ যথার্থ ছিলো, সে ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরের মধ্যে এ বিশেষণ- বাচক নামগুলো একমাত্র রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ছাড়া আর কারো জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আর বিচারবুদ্ধির কাছে এটাও গ্রহণযোগ্য

নয় যে, মানবজাতি চরম গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা বিগত প্রায় দুই হাজার বছরে কোনো পয়গাম্বরকে পাঠান নি।

[উল্লেখ্য, বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত তাওরাত্ ও ইনজীল্ হিসেবে দাবীকৃত পুস্তকগুলোতে ও এর অন্যান্য পুস্তকে এখনো রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর পরিচিতি বিদ্যমান রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লামা মোহাম্মাদ ছাদেকী লিখিত بشارت عهدين গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি অত্র লেখক কর্তৃক 'বাইবেলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)' নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।]

অতএব, যারা হযরত মূসা ('আঃ) ও হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর ওপর ঈমান এনেছে, তাওরাত্ ও ইনজীলের ওপর ঈমানের অনিবার্য দাবী অনুযায়ী রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ওপর ঈমান আনয়ন তাদের জন্য অপরিহার্য; তাদের জন্য মু'জিযাহর প্রয়োজন নেই।

তবে হ্যা, যারা হযরত মূসা ('আঃ) ও হযরত 'ঈসা ('আঃ)- এর ওপর ঈমান আনে নি এবং তাঁদের আনীত আসমানী কিতাব্ দু'টিকেও খোদায়ী ওয়াহী বলে স্বীকার করে নি, তাদের জন্য রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ওপর ঈমান আনয়নে মু'জিযাহর প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু অতীতের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) সব ধরনের মু'জিযাহরই অধিকারী ছিলেন। তিনি একদিকে অবিনশ্বর ও বিশ্বজনীন মু'জিযাহ্ কোরআন মজীদ নিয়ে আসেন - যা তাঁর নবুওয়াত- দাবীর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ, অন্যদিকে তিনি অন্যান্য মু'জিযাহরও অধিকারী ছিলেন - যা মুতাওয়াতির্ সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আর বলা বাহুল্য যে, মুতাওয়াতির্ বর্ণনা প্রত্যয় উৎপাদক।

আর হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর অন্যান্য মু'জিযাহর মুতাওয়াতির্ বর্ণনা নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে অতীতের নবী- রাসূলগণের ('আঃ) মু'জিযাহ্ সমূহের বর্ণনার তুলনায় বহু গুণে শক্তিশালী ও প্রত্যয় উৎপাদক। হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর মু'জিযাহ্ সমূহ একদিকে যেমন সময়ের ব্যবধানের বিচারে আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী, অন্যদিকে প্রতিটি পর্যায়েই

তা অনেক বেশী সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (তেমনি বর্ণনাকারীদের পরম্পরা, ঐতিহাসিকতা এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতার দলীল-প্রমাণও ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে।)

কিন্তু কোরআন মজীদ হচ্ছে চিরন্তন ও বিশ্বজনীন মু'জিযাহ্ - যা থেকে মু'জিযাহ্ প্রত্যক্ষকরণের কল্যাণ পুরোপুরি লাভ করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট - ১

কোরআনে ফির্‘আউনের উক্তির উদ্ধৃতি কি মু‘জিযাহ্?

কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ প্রসঙ্গে জনৈক বন্ধুর সাথে আলোচনাকালে তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর অন্তরে জাগ্রত একটি প্রশ্নের কথা বলেন যার জবাব তিনি খুঁজে পান নি। তিনি বলেন : কোরআন মজীদে হযরত মূসা (‘আঃ), ফির্‘আউন্ এবং আরো অনেকের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে; এগুলো কী করে মু‘জিযাহর অন্তর্ভুক্ত হয়? বিশেষ করে অনারবদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি মু‘জিযাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কিনা?

এ প্রশ্নটি হয়তো আরো অনেকের মনে জাগ্রত হতে পারে। অবশ্য কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা থেকে এ প্রশ্নের মোটামুটি জবাব মিলে। তা হচ্ছে এই যে, কোরআন মজীদ একটি গ্রন্থ হিসেবে এবং এর একেকটি সূরাহ্ মু‘জিযাহ্, বিচ্ছিন্নভাবে এর আয়াত সমূহ মু‘জিযাহ্ নয়। তথাপি বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে, প্রশ্নকর্তা বন্ধুকে যে জবাব দিয়েছিলাম এখানে মোটামুটি তা- ই উল্লেখ করছি।

কোরআন মজীদ যে মু‘জিযাহ্ তার কারণ এ নয় যে, তার প্রতিটি বাক্যই স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার প্রত্যক্ষ উক্তি। বরং এতে যেমন আল্লাহ্ তা‘আলার নিজের প্রত্যক্ষ উক্তি রয়েছে, তেমনি তিনি অন্যদের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এ ক্ষেত্রে যাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তারা আরব কি অনারব তাতে খুব বেশী পার্থক্য হবার কারণ নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা যখন উদ্ধৃতি দিয়েছেন তখন সংশ্লিষ্ট উক্তিসমূহের ভাব ও তাৎপর্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে সংক্ষেপণ ও পরিমার্জন করেছেন তথা বাহুল্যবর্জিত করেছেন যাতে তা বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মানদণ্ডের বিচারে আল্লাহর কালামের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

এ কাজকে মোটামুটিভাবে একজন সুযোগ্য সম্পাদক কর্তৃক কোনো লেখকের লেখার সম্পাদনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে - যাতে মূল লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় পুরোপুরি ঠিক রেখে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপণ ও পরিমার্জন করা হয়। তেমনি অনেক ক্ষেত্রে লেখক যা বলতে চেয়েছেন বলে বোঝা যায় অথচ সে জন্য যথোপযুক্ত শব্দাবলী ব্যবহার ও বাক্যবিন্যাস সম্ভব হয় নি, সম্পাদক সে ঘাটতি মোটামুটি পূরণ করে দেন ও লেখকের বক্তব্যকে এমনভাবে ত্রুটিমুক্ত ও প্রাঞ্জল করে দেন যে, এ প্রতিপাদ্য বিষয়ে স্বয়ং সম্পাদক লিখলে এমনটিই লিখতেন।

এখানে অবশ্য উদ্ধৃতিতে পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠতে পারে। তার জবাব হচ্ছে এই যে, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগের আরবরা, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী যাযাবর বেদুঈন আরবরা নির্ভুল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতো। এ কারণেই পরবর্তীকালে রচিত আরবী ব্যাকরণে বিভিন্ন ব্যাকরণিক নিয়মের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর যুগের ও জাহেলী যুগের আরবদের, বিশেষ করে বিভিন্ন বেদুঈন যাযাবর আরব গোত্রের বক্তব্য ও এ দুই যুগে রচিত কবিতা সমূহের উদ্ধৃতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে আরবী ভাষার ওপর অনারবদের প্রভাবের আশঙ্কায় তৎকালীন শহুরে আরবদের ও পরবর্তী যুগের আরবদের বক্তব্য বা কবিতাকে দলীল হিসেবে অগ্রহণযোগ্য বলে বা অপরিহার্য ক্ষেত্রে দুর্বল মানের দলীল হিসেবে গণ্য করা হয়।

এমতাবস্থায়, আরবী ভাষা মানব জাতির ভাষাসমূহের মধ্যে প্রাঞ্জলভাবে ও সংক্ষিপ্ততম কথায় সূক্ষ্মতম, গভীরতম ও ব্যাপকতম ভাব প্রকাশের একমাত্র ভাষা বিধায় কোরআন মজীদে যে সব আরবের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে তেমন বেশী একটা সংক্ষেপণ বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য যেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা কোনো মানবীয় ভাষায় কালাম্ নাযিল্ করলে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের মানদণ্ডে তা অনিবার্যভাবেই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত মানের অধিকারী হবে সেহেতু তিনি আরবদের বক্তব্য উদ্ধৃত করলে তাকে পরিমার্জিত করে স্বীয় কালামের সমমানদণ্ডে উন্নীত করবেন এটাই স্বাভাবিক, তা সে পরিমার্জন যতো কমই হয়ে থাক না কেন। এ ধরনের পরিমার্জন মানবীয় সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ,

কোনো পত্রিকার একজন সংবাদদাতা যখন তাঁর কোনো প্রতিবেদনে কোনো লোকের কথা উদ্ধৃত করেন তখন সাধারণতঃ সে ব্যক্তির আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ বা উপভাষিক উচ্চারণ সহ তার উক্তি হুবহু উদ্ধৃত না করে পরিমার্জিত করে স্বীয় ভাষার সমপর্যায়ে উন্নীত করে উদ্ধৃত করেন।

অন্যদিকে ভিন্ন ভাষাভাষী কারো বক্তব্যের উদ্ধৃতি মানেই হচ্ছে তার তরজমা বা অনুবাদের উদ্ধৃতি, মূলের নয়। আর তরজমা বা অনুবাদ সর্বাবস্থায়ই মূল বক্তার বক্তব্যের ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, শব্দ বা ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে না। এ ক্ষেত্রে অনুবাদক উভয় ভাষায় যতো বেশী সুদক্ষ হবেন তিনি ততো বেশী নিখুঁতভাবে বক্তার বক্তব্যের ভাবের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবেন। ফলে মূল বক্তার বক্তব্য সাহিত্যিক মানের বিচারে প্রাঞ্জল, সুন্দর ও বলিষ্ঠ না হলেও অনুবাদ এ সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।

এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আরবদের উক্তি যদি কোরআন মজীদে হুবহু বা প্রায় হুবহু উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাহলে ঐ সব উক্তি গ্বায়রুল্লাহর উক্তি হওয়া সত্ত্বেও মু'জিযাহ্ কিনা?

এ প্রশ্নের জবাবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যে কোনো গ্রন্থের তাৎপর্যের কয়েকটি দিক আছে। প্রথমতঃ প্রতিটি শব্দেরই তাৎপর্য রয়েছে। অবশ্য অনেক শব্দেরই একাধিক তাৎপর্য রয়েছে, তবে শব্দটি তার কোন্ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবল বাক্যমধ্যে তার ভূমিকা দৃষ্টেই নির্ণয় করা সম্ভব।

একটি গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে প্রচলিত থাকে, বা এর মধ্য থেকে কতক শব্দ তেমন একটা প্রচলিত না থাকলেও তা অভিধানগ্রন্থে বিদ্যমান থাকে। এ সব শব্দ শিখে নিয়ে লেখায় বা কথায় প্রয়োগ করা - যারা তা শিখেছে তাদের পক্ষে - অবশ্যই সম্ভবপর, তা তারা কবি- সাহিত্যিকই হোন বা অশিক্ষিত লোকই হোক। তাই কোনো ভাষার কোনো শব্দ কেবল একটি শব্দ হিসেবে দ্ধ, সুন্দর ও প্রাঞ্জল অথবা অ দ্ধ ও অসুন্দর কোনোটাই হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি বাক্যের একটি তাৎপর্য থাকে যা সংশ্লিষ্ট বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের তাৎপর্য থেকে স্বতন্ত্র। এমনকি গেঁয়ো, সেকেলে বা অশ্লীল হিসেবে বিবেচিত শব্দাবলীও বাক্যের মধ্যে

বক্তার উদ্দেশ্যকে সর্বোত্তমভাবে তুলে ধরতে পারে যদি তার যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। কারণ, কথা বা লেখার মধ্যে তথাকথিত সুন্দর সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের শব্দাবলী ব্যবহারের মধ্যে বাহাদুরী নেই, বরং বক্তা যে ভাব প্রকাশ করতে চায় তা কতো সংক্ষেপে কতো নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে পারে তাতেই বক্তা বা লেখকের বাহাদুরী নিহিত।

তৃতীয়তঃ অনেকগুলো বাক্য মিলে একটি কবিতা, ভাষণ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদ তরী হয়। এভাবে বাক্যগুলো মিলে যে একটি বৃহত্তর ও ব্যাপকতর তাৎপর্য সৃষ্টি করে তা সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলোর তাৎপর্য থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ বাক্যগুলোকে সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে বিন্যস্ত না করে এলোমেলোভাবে পাশাপাশি বসালে প্রতিটি বাক্যের তাৎপর্য ঠিক থাকবে বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কবিতা, ভাষণ, নিবন্ধ বা পরিচ্ছেদের তাৎপর্য তা থেকে নিষ্পন্ন হবে না।

চতুর্থতঃ একটি গ্রন্থের সবগুলো পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বা নিবন্ধ সমূহ মিলিয়ে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য পাওয়া যাবে প্রতিটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বা নিবন্ধকে স্বতন্ত্র ও পরস্পর সম্পর্কহীনভাবে অধ্যয়ন করলে তা পাওয়া যাবে না।

কোরআন মজীদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। কোরআন মজীদের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি সূরাহর এবং সমগ্র কোরআন মজীদের তাৎপর্য পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও ক্রমান্বয়ে উচ্চতর স্তরের।

কোরআন মজীদ মানুষের ভাষায় নাযিল্ হয়েছে। এর শব্দাবলী আরবদের ব্যবহৃত শব্দাবলী মাত্র। অতএব, এ শব্দগুলো মু'জিযাহ্ নয়। তেমনি আরব কবি- সাহিত্যিক ও বাক্যবাগীশদের পক্ষে উন্নততম ভাবপ্রকাশক কতগুলো উচ্চাঙ্গের প্রাঞ্জল বাক্য বা কবিতার পঙক্তি রচনা করতে পারাও অসম্ভব কিছু ছিলো না বা নয়। অতএব, কোরআন মজীদের আয়াতের সাথে তুলনীয় সম-মানসম্পন্ন বাক্য রচনা করাও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাণী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একটি বক্তব্য পেশের ক্ষেত্রে কোনো মানুষের পক্ষে, এমনকি সমগ্র মানবমণ্ডলীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেও কোরআন মজীদের সমমানসম্পন্ন রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই কোরআন মজীদ ন্যূনতম যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তা হচ্ছে, কোরআন মজীদকে যারা হযরত রাসূলে

আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর রচিত বলে মনে করে তারা যেন কোরআন মজীদের যে কোনো সূরাহর সমতুল্য (এমনকি ক্ষুদ্রতম সূরাহর সমতুল্য হলেও) একটি সূরাহ্ রচনা করে আনে।

বলা বাহুল্য যে, সম মানের হতে হলে তাকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ততা, প্রাঞ্জলতা ও তাৎপর্য - এ তিনের বিচারে সম মানের হতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মানুষের রচনার পক্ষে এর সর্বোর্ধ দু'টি দিক বজায় রাখা সম্ভব হলেও তিনটি দিকই বজায় রাখতে পারা সম্ভবপর নয়; অন্ততঃ একটি দিক বজায় রাখতে মানুষের রচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব্ কোরআন মজীদে আরব- অনারব নির্বিশেষে যাদের বক্তব্যই উদ্ধৃত করেছেন সে ক্ষেত্রে তাদের বাক্য উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। কোনো একটি পুরো সূরাহ্ কোনো ব্যক্তির উদ্ধৃতি দ্বারা গড়ে ওঠে নি। আর যেহেতু শব্দ বা বাক্য মু'জিযাহ্ নয়, বরং সূরাহ্ হচ্ছে মু'জিযাহ্, সেহেতু তাতে হযরত মূসার ('আঃ), ফির্'আউনের অথবা কোনো আরবের বা কোনো অনারবের বাক্য বা বাক্যাবলী উদ্ধৃত হওয়ায় এ সব বাক্য বা বক্তব্য মু'জিযাহর পর্যায়ভুক্ত হবে না।

পরিশিষ্ট - ২

১৯ সংখ্যার মু'জিযাহর নামে বিভ্রান্তি

খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে মিসরের জনৈক ড. রাশাদ খালীফাহ্ দাবী করেন, তিনি কম্পিউটারের সাহায্যে কোরআন মজীদের বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, এতে ব্যবহৃত বর্ণ ও শব্দ সমূহ এবং এতে উল্লিখিত নাম সমূহ, হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত্ ও আয়াত সমূহ ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে এভাবে ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কোনো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, কোরআন মজীদ যে আল্লাহর কালাম্ - এ থেকে তা- ই প্রমাণিত হয়।

[উল্লেখ্য, হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত্ হচ্ছে কোরআন মজীদের কোনো কোনো সূরাহর রুতে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি যা ঐ সূরাহর প্রথম আয়াত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, যেমন : الم، الر، يس ইত্যাদি। এ সব হরফের তাৎপর্য নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিশ্চয়তার সাথে যা বলা যায় তা হচ্ছে, তৎকালে আরবদের মধ্যে বক্তৃতা- ভাষণের রুতে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি উচ্চারণের(সম্ভবতঃ বক্তব্যের দিকে শ্রোতাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করার জন্য) প্রচলন ছিলো এবং এ কারণেই মুশরিকরা এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি বা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)- এর ছ্বাহাবীগণও এগুলোর তাৎপর্য জানতে চান নি।]

কোরআন অবিনশ্বর মু'জিযাহ্

কোরআন মজীদ যে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম্ তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কোরআন হচ্ছে এক অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ বা অলৌকিক বাস্তবতা যা সব সময়ের জন্য এ প্রমাণ বহন করছে যে, এ গ্রন্থ কোনো মানুষের রচিত নয়, অতএব, তা আল্লাহর কালাম্ এবং এ গ্রন্থ যিনি মানুষের কাছে পেশ করেছেন তিনি অনিবার্যভাবেই আল্লাহর নবী। কোরআন মজীদ তার এ বশিষ্ট্য সহকারে ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

কোরআন মজীদ স্বয়ং তার প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, তারা যদি একে মানুষের রচিত গ্রন্থ বলে মনে করে থাকে তাহলে তারা এর বিকল্প রচনা করুক। তারা যেরূপ দাবী করে থাকে, এক ব্যক্তি [রাসূলে আকরাম্ হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)] যদি এ গ্রন্থ রচনা করে থাকতে পারেন তাহলে তারা সবাই মিলে এর বিকল্প একটি গ্রন্থ পেশ করুক; এমনকি তা যদি না পারে তো এর যে কোনো সূরাহর সমমানসম্পন্ন একটি বিকল্প সূরাহ্ রচনা করে আনুক।

কোরআন মজীদ প্রদত্ত এ চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন দিক হচ্ছে : এ গ্রন্থের উন্নততম ভাষা ও রচনাশৈলী, স্বল্পতম কথায় ব্যাপকতর তাৎপর্য এবং তত্ত্ব, তথ্য, আইন, জ্ঞান ও পথনির্দেশের ব্যাপক সমাহার।

বিগত চৌদ্দশ' বছরে কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ ও আল্লাহর কালাম্ হওয়া সম্পর্কে বহু ইসলামী মনীষী আলোচনা করেছেন। তাঁরা প্রধানতঃ কোরআন মজীদের উপরোক্ত দিকগুলোকে কেন্দ্র করেই আলোচনা করেছেন। এছাড়া এ গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বাস্তবায়িত হওয়া, এতে নিহিত বজ্ঞানিক তথ্যাদি ইত্যাদিকেও অনেকে এর মু'জিযাহ্ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই ১৯ সংখ্যার দ্বারা কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ প্রমাণের চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু হঠাৎ করে ড. রাশাদ খালীফাহ্ ১৯ সংখ্যার দ্বারা কোরআনের মু'জিযাহ্ প্রমাণের দাবী করে বসলেন। আর সাথে সাথে, ইসলাম ও আরবী ভাষার চর্চা যাদের মধ্যে খুবই কম এমন মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেললো। আর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর

এতদসংক্রান্ত পুস্তকের অনুবাদ করা হলো এবং একে ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষায় বহু পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচিত হলো।

তবে ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীদের নিকট বিষয়টি পাত্তা পায় নি। তাঁদের মতে, কোরআন মজীদ স্বীয় মু'জিযাহ্ প্রমাণের জন্য ১৯ বা অন্য কোনো সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়। বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাসে বা হাদীছে কাফের- মুশরিকদেরকে ১৯ সংখ্যা দ্বারা চ্যালেঞ্জ করার কোনো ঘটনা উল্লিখিত নেই। তাঁদের মতে, হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর সময় এ ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জ প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হলে হাদীছ ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তা অবশ্যই উল্লিখিত থাকতো।

দনিক একটির কম আয়াত

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, কোনো গ্রন্থের বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সমূহ ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলেই তাকে ঐশী বাণী বলে মানুষের বিচারবুদ্ধি গ্রহণ করতে বাধ্য কি? মানুষের পক্ষে কি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সম্বলিত রচনা তরী করা অসম্ভব? মানুষ যদি চতুর্দশপদী, অষ্টাদশপদী ইত্যাদি কবিতা রচনা করতে পারে, তো ঊনবিংশপদী কবিতা বা বাক্য সম্বলিত অথবা বর্ণ, শব্দ, নাম ইত্যাদির সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এমন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না কেন? একজনের পক্ষে যদি সম্ভব না- ও হয়, তো অনেকের পক্ষে মিলে রচনা করা অসম্ভব হবার কোনো কারণই নেই। বরং ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য গ্রন্থ মানুষের পক্ষে রচনা করা অসম্ভব বলে দাবী করা একটি হাস্যকর দাবী ব নয়।

কোরআন মজীদকে দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছে, এ কারণে সহজেই একে ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত রূপে বিন্যস্ত করা সহজ হয়েছে - কোরআন- বিরোধীরা এরূপ দাবী করে বসলে তা খণ্ডন করার কোনো উপায় আছে কি?

কোরআন- বিরোধীরা যদি বলে, 'কোরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে অর্থাৎ আট হাজার দিনেরও বেশী সময় ধরে মানুষের কাছে পেশ করা হয়েছে। এর মানে, গড়ে একেকটি আয়াতের জন্য এক দিনের বেশী সময় হাতে পাওয়া গেছে। অতএব, কোরআনের রচয়িতা ধীরে সুস্থে হিসাব করে

এমনভাবে শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস করেছেন যে, সহজেই তার বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সমূহ ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে।' তাদের এ ধরনের দাবী খণ্ডন করার জন্য কোনো উপযুক্ত জবাব আছে কি?

এভাবে কোরআন মজীদকে গ্রহণযোগ্য করানোর জন্য যে ১৯ সংখ্যার আ য় নেয়া হচ্ছে তা- ই কোরআন মজীদের ঐশিতা সম্পর্কে সন্দেহ- সংশয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমতাবস্থায় কোরআন মজীদের অলৌকিকতাকে এহেন একটি কাল্পনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো কোনো মতেই সঙ্গত নয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হয় যে, যদিও দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কোরআন মজীদের আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্রন্থের বর্ণ, শব্দ ও বাক্য ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্যরূপে রচনা করা সম্ভব, তাই বলে কোরআন- বিরোধীরা যদি মনে করে যে, দীর্ঘ ২৩ বছর সময়ের কারণেই অতুলনীয় গ্রন্থ রূপে কোরআনকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তাহলে তারা ২৩ বছর নয়, বরং আরো অনেক বেশী সময় নিয়ে এবং বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির একটি টীম সমগ্র কোরআন মজীদের নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম সূরাহিটির বিকল্প রচনার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আর এ ক্ষেত্রে তা ১৯ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই; এ ক্ষেত্রে ভাষার প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, তাৎপর্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততাই হবে বিকল্প পরীক্ষার মানদণ্ড।

বাহাইদের ষড়যন্ত্র নয় তো?

উল্লেখ্য, বাহাই ধর্মমত কাদীয়ানী ধর্মমতের মতোই ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি ধর্মমত এবং কাদীয়ানী ধর্মমতের মতোই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে এ ধর্মমত অস্তিত্বলাভ করে। অতঃপর ইঙ্গ- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক যায়নবাদী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধর্মটি টিকে আছে এবং মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। বর্তমানে বাহাই ধর্মাবলম্বীদের প্রধান দফতর ইসরাঈলের হাইফা বন্দরে অবস্থিত।

বৃটিশ সামরাজ্যবাদীদের এজেন্ট বাহাাউল্লাহ্ বাাব্ এ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। বাহাাউল্লাহ্ বাাব্ এর আসল নাম মীর্যা আলী মোহাম্মাদ শীরাযী। সে নিজেকে প্রথমে হযরত ইমাম মাহ্দী -এর প্রতিনিধি বলে দাবী করে এবং এ অ -(আল্লাহ্ তাঁর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন)র্থে নিজেকে ইমাম মাহ্দী)'আঃরূপে আখ্যায়িত করে। পরে (باب) ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগের দরযা (

সে নিজেকে নবী বলে দাবী করে এবং সবশেষে খোদা হওয়ার দাবীও পেশ করে। (Baha`ism by Mujtaba Shirazi, Islamic Propagation Organization, Tehran, 1985. Pp. 14- 15)

বাহাই ধর্মের লোকদের নিকট ১৯ একটি পবিত্র সংখ্যা; তারা ১৯ দিনে সপ্তাহ গণনা করে থাকে। মুসলমানরা যেমন সপ্তাহে একদিন জুম্'আ নামায আদায় করে, তার পরিবর্তে বাহাইরা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিটি মহল্লায় প্রতি ১৯তম দিনে সামাজিক ভোজের আয়োজন করে থাকে। এটা তাদের ধর্মের বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান। তেমনি তাদের ধর্মীয় মাস এ ধরনের ১৯ সপ্তাহে এবং তাদের ধর্মীয় বছর এ ধরনের ১৯ মাসে। সুতরাং কোরআনের মু'জিযাহ্ প্রমাণের নামে এভাবে ১৯ সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করার পিছনে বাহাইদের ষড়যন্ত্র নিহিত নেই তো?

যদিও কোরআন মজীদের কিছু কিছু বিষয়, যেমন : সূরাহ্- সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য, তবে এ গ্রন্থের সব কিছু ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। এমতাবস্থায় ১৯ সংখ্যাকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হলে কোরআন মজীদের যা কিছু ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় সে সব বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ এ মর্মে সন্দেহ সৃষ্টি হবে যে, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় নিশ্চয়ই তাতে বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অতএব, এ ১৯- সংখ্যার তত্ত্ব উপস্থাপনের পিছনে বাহাই ষড়যন্ত্র কার্যকর থাকার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত।

'তার ওপরে উনিশ'

১৯ সংখ্যার মু'জিযাহর প্রবক্তাদের পক্ষ থেকে সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছির্- এর ৩০ নং আয়াতকে এ দাবীর ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

عليها تسعة عشر.

"তার ওপরে আছে ঊনিশ।"

এর ভিত্তিতে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন মজীদে ব্যবহৃত বর্ণ, শব্দ, আয়াত, নাম ইত্যাদি সব কিছু ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ আয়াত থেকে তা প্রমাণিত হয় না। উদ্ধৃত আয়াতের পূর্বাপর থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এতে দোযখের ব্যবস্থাপক ১৯ জন ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে; এতে ১৯ সংখ্যা দ্বারা কোরআন মজীদের সব কিছুর নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই উল্লিখিত নেই।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, উক্ত আয়াতে ইসলামের ঘোর দুশমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরকালে তাকে সাক্বার্ (দোযখ)- এ নিক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই সাথে এর শাস্তির ভয়াবহতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। মুফাসসিরদের মতে, এ ব্যক্তির নাম ছিলো ওয়ালীদ বিন্ মুগ্বীরাহ্। সে ছিলো আরবী ভাষার ফাছ্বাহাত্ ও বালাগ্বাতের মহানায়ক এবং এ কারণে সে অকাট্যভাবে বুঝতে পারে যে, কোরআন মজীদ আল্লাহর কালাম, কিন্তু মক্কায় নিজের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে সে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)কে জাদুকর এবং কোরআন মজীদকে (তখন পর্যন্ত যে পরিমাণ নাযিল্ হয়েছিলো) জাদু বলে আখ্যায়িত করেছিলো।

ভুল ব্যাখ্যা

রাশাদ খলীফাহর মূল আরবী লেখাটি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। তবে তাঁর লেখা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। এরূপ একটি পুস্তকে উক্ত আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে "তদুপরি ঊনিশ।"

বাংলাভাষী লেখক যদি এ আয়াতটি সরাসরি আরবী মূল থেকে অনুবাদ করে থাকেন তো বলবো, এ ধরনের অনুবাদ আরবী ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞানের অভাবই প্রমাণ করে থাকে। আর তিনি যদি রাশাদ খলীফাহর বই- এর 'ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে' তাঁর বইটি লিখে থাকেন এবং উক্ত আয়াতের অনুবাদও রাশাদ খলীফাহর বই- এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে নিয়ে থাকেন, তো এ ধরনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়ে আরবী ভাষার যথাযথ জ্ঞান ছাড়া

ইংরেজী জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বই লিখে তিনি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। আর তিনি যদি আরবী ভাষায় যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন, কিন্তু রাশাদ খলীফাহ্ উক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিত্তিতে আয়াতটির এরূপ অনুবাদ করে থাকেন তাহলে বলবো, রাশাদ খলীফাহ্ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনিও এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাশাদ খলীফাহর অন্ধ অনুকরণ করে অন্যায় করেছেন।

[এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলা ভাষায় যারাই ১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহ্ প্রমাণের জন্য পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখেছেন সম্ভবতঃ তাঁদের সকলেই রাশাদ খলীফাহর বই- এর বা অন্য কোনো লেখকের লেখার ইংরেজী অনুবাদ বা ইংরেজীতে লেখা বই বা প্রবন্ধের ওপর নির্ভর করেছেন। ১৯৯২ খৃস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল ইরান থেকে দেশে ফিরে আসার পর আলোচ্য বাংলা পুস্তকটি পাই। ইতিমধ্যে একটি ইসলাম- সমর্থক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ মরহূম আহমাদ দীদাতের (১৯১৮- ২০০৫ খৃ.) একই বিষয়ে লেখা (অবশ্যই ইংরেজী ভাষায়) একটি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মরহূম আহমাদ দীদাত নিঃসন্দেহে ইসলামের একজন বড় খাদেম ছিলেন (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর এ খেদমতের ভ প্রতিদান প্রদান করুন), কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মতোই, ভুলের উর্ধে ছিলেন না। তাই তিনি কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ প্রমাণের জন্য একটি নতুন হাতিয়ার পেয়ে ত্বরিত গতিতে তা ব্যবহার করেন এবং এ ব্যাপারে গভীরভাবে তলিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পান নি। এ বিষয়ে ভুল নির্দেশ করে ও সঠিক বিষয় তুলে ধরে একটি প্রবন্ধ লিখে উক্ত পত্রিকায় দেই এবং পত্রিকাটির সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীল সহকারী সম্পাদক লেখাটি প্রকাশ করার কথা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখাটি ছাপা হয় নি। উক্ত সহকারী সম্পাদক জানান যে, পত্রিকাটির উর্ধতন কর্তাব্যক্তি এটি ছাপাতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : "আমরা বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাই না।" আমি সহকারী সম্পাদক মহোদয়কে বলেছিলাম : "আপনারা ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল জিনিস মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, অথচ তা সংশোধন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করে বলছেন বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান না!" কিন্তু তাঁর কাছে দেয়ার মতো কোনো জবাব ছিলো না।

দুর্ভাগ্যজনক যে, পত্রিকাটির উক্ত সহকারী সম্পাদক মহোদয় ‘ছাপা না হলে লেখাটি ফেরত দেবেন’ বলে কথা দিলেও আমার লেখাটি ফেরত দেয়ার জন্য খুঁজে পান নি! পরে একই বিষয়ে নতুন করে ‘১৯ সংখ্যার মু‘জিযাহর নামে বিভ্রান্তি’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধটি রচনা করি - যা দনিক আল- মুজাদ্দেদ- এ ছাপা হয়েছিলো। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি দনিক আল- মুজাদ্দেদ- এ প্রকাশিত প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত ও পরিমার্জিত রূপ।]

বাংলা ভাষায় ‘তদুপরি’ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে ‘অধিকন্তু’ - আর এ অর্থে ‘তদুপরি’ বলা হয়ে থাকলে তা ১৯ সংখ্যার মু‘জিযাহর দাবীদারদের দাবীর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আভিধানিক অর্থে ‘তদুপরি’ বলা হয়ে থাকলে অনুবাদ সঠিক হয়েছে বটে, তবে তা থেকেই ১৯ সংখ্যার মু‘জিযাহর দাবীদারদের দাবী খণ্ডিত হয়ে যাবে। কারণ, ‘তদুপরি’ মানে যদি ‘তার ওপরে’ করা হয় তাহলে ‘তার’ মানে ব্যক্তি হবে না, হবে বস্তু। কিন্তু ১৯ সংখ্যার মু‘জিযাহর প্রবক্তাদের দাবী হচ্ছে এই যে, কাফেরদেরকে দোযখের ভয় দেখানোর পর বলা হয়েছে, তদুপরি তাদেরকে ১৯ সংখ্যার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ব্যর্থতার লজ্জা বহন করতে হবে।

কিন্তু এখানে আয়াতে (মূল আরবী ভাষায়) না ‘তদুপরি’ (‘অধিকন্তু’ অর্থে) বলা হয়েছে, না এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। বরং এ আয়াতে একটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে যা ‘বাস্তবতার বর্ণনা’ (حکایت واقعیت) পর্যায়ের।

এখানে উদ্ধৃত আয়াতের পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াত থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছির্- এর ৮ থেকে ৩০ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

(فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.)

“অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন দিন; কাফেরদের জন্য খুবই অস্বস্তিকর। (হে রাসূল!) আমার ওপর ছেড়ে দিন ঐ ব্যক্তির বিষয়টি যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে বিপুল ধনসম্পদ দিয়েছি ও তার সঙ্গী হিসেবে পুত্রবর্গ দিয়েছি, আর তার জন্য (প্রয়োজনীয় পার্থিব সব কিছুর) ব্যবস্থা করেছি যথাযথভাবে। এরপরও সে লোভ করে যে, আমি তাকে আরো বাড়িয়ে দেই। কক্ষনোই নয় (সে এ সব পেয়ে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নি, বরং) সন্দেহাতীতভাবেই সে আমার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। অচিরেই আমি তাকে (শাস্তিতে নিক্ষেপের জন্য) পাকড়াও করে উঁচুতে তুলে ধরবো। নিঃসন্দেহে সে চিন্তা- ভাবনা করেছে ও মনস্থির করেছে। অতএব, সে ধ্বংস হোক সে জন্য যেভাবে সে মনস্থির করেছে, অতঃপর সে ধ্বংস হোক সে জন্য যেভাবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অতঃপর দৃষ্টিপাত করেছে, অতঃপর ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, এরপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহঙ্কার করেছে। অতঃপর সে বললো : “এ তো কারো কাছ থেকে পাওয়া জাদু ব কিছু নয়; এটা মানুষের কথা ব নয়।” (কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। তাই) অচিরেই আমি তাকে সাক্বারে (দোযখে) নিক্ষেপ করবো। (হে রাসূল!) আর কোন্ জিনিস আপনাকে বুঝিয়ে দেবে যে, সাক্বার্ কী? তা (তাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে) না অবশিষ্ট রাখে, না রেহাই দেয়। তা মানুষকে দগ্ধকারী। তার ওপরে রয়েছে ঊনিশ।”

[এখানে যে ওয়ালীদ্ বিন্ মুগ্বীরাহর কথা বলা হয়েছে আয়াতে ব্যবহৃত ‘অনন্য’ (وحيداً) শব্দে তার আভাস রয়েছে। কারণ, তৎকালীন আরবদের মধ্যে ওয়ালীদ বিন্ মুগ্বীরাহ্ ছিলো ে ষ্ঠতম বালীগ্ব ও ফাছ্বীহ্, আর সে নিজেই তা সগর্বে ঘোষণা করেছিলো এবং কেউ তার এ দাবীর বিরোধিতা করে নি।]

ব্যাকরণের দৃষ্টিতে

উক্ত সূরাহটি রু থেকে পাঠ করলে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূরাহটির ৮ থেকে ১০ নং আয়াতে কাফেরদের (বহু বচনে) সম্পর্কে এবং ১১ থেকে ২৬ নং আয়াতে তাদের মধ্যকার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এখানে যে ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে সে হচ্ছে

এক ব্যক্তি এবং একজন পুরুষ মানুষ (مذكر مفرد)। উক্ত আয়াত সমূহে বহু বার ব্যবহৃত একবচন নির্দেশক পুরুষবাচক সর্বনাম 'হে' (ه) থেকে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

অন্যদিকে ২৬ নং আয়াতে উল্লিখিত سقر (দোযখ) শব্দটি স্ত্রীবাচক ও একবচন (مفرد مونث)।

[স্মর্তব্য, আরবী ভাষায় অপ্রাণী বাচক বিশেষ্য সমূহও স্ত্রীবাচক বা পুরুষবাচক হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিশেষ্যের জন্য স্ত্রী বা পুরুষ বাচক সর্বনাম ও বিশেষণ ব্যবহৃত হয় এবং কর্তা পদের দৃষ্টিতে ক্রিয়া পদের স্ত্রী বা পুরুষ বাচক সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।]

অতএব, ২৮ নং আয়াতের স্ত্রীবাচক ক্রিয়াপদ تبقى ও تذر এবং ২৯ নং আয়াতের স্ত্রীবাচক ও কর্তাবাচক বিশেষ্য لواحة যে এই দোযখ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে সে ব্যাপারে বিতর্কের কোনোই অবকাশ নেই।

অতঃপর এসেছে ৩০ নং আয়াত عليها تسعة عشر (তার ওপরে রয়েছে ঊনিশ)। এ আয়াতের عليها কথাটির ها সর্বনামটি স্ত্রীবাচক ও একবচন (مؤنث مفرد)। অতএব, নিঃসন্দেহে তা سقر (দোযখ) সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় নি - যে পুরুষ ও এক ব্যক্তি।

এ আয়াতটি প্রথমে উল্লিখিত কাফেরদের সম্পর্কেও বলা হয় নি - যারা এক ব্যক্তি নয়, বরং বহু। আর كافرين শব্দে নারী- পুরুষ উভয়ই শামিল থাকলেও আরবী ব্যাকরণিক রীতি অনুযায়ী শব্দটি পুরুষবাচক এবং তা দ্বারা ধু পুরুষ বা স্ত্রী- পুরুষ একত্রে - যা- ই বুঝানো হোক না কেন, এ শব্দের জন্য কেবল পুরুষবাচক সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া পদ ব্যবহার করতে হবে; স্ত্রীবাচক পদ ব্যবহার করা ছ্বহীহ্ হবে না।

দোযখের ১৯ জন ফেরেশতা

আলোচ্য সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছিরের ৩০ নং আয়াতের পরবর্তী আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে দোযখের ১৯ জন তত্ত্বাবধায়কের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যেন মনে

না করে যে, সে কোনো না কোনোভাবে দোযখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। তা সে পারবে না। কারণ, দোযখ কোনো অরক্ষিত জায়গা নয়। বরং দোযখের তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ১৯ জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রেখেছেন। কিন্তু এই ১৯ জন তত্ত্বাবধায়কের তথ্য কাফেরদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

মুফাসসিরগণের বক্তব্য অনুযায়ী, এতে বরং কাফেররা নবী- করীম (ছ্বাঃ)- এর উদ্দেশে ঠাট্টা- বিদ্রুপ করতে থাকে। কারণ, কোটি কোটি দোযখবাসীর তত্ত্বাবধান মাত্র ১৯ জন তত্ত্বাবধায়ক করবে এটা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। কারণ, তারা এই ১৯ জন তত্ত্বাবধায়ককে তাদের নিজেদের ন্যায় সীমিত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছিলো। তাই ৩১ নং আয়াতে তাদের এ ধারণার ভ্রান্তি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি দীর্ঘ আয়াত যাতে এরশাদ হয়েছে :

(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.)

"আমি ফেরেশতা ছাড়া কাউকে দোযখের তত্ত্বাবধায়ক বানাই নি, আর আমি তাদের সংখ্যাটিকে তো কাফেরদের জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ বানিয়েছি - যাতে কিতাবের অধিকারীরা দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হতে পারে ও ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর যাতে কিতাবধারীরা ও ঈমানদারগণ সন্দেহ- সংশয়ে নিপতিত না হয় এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফেররা বলে : "আল্লাহ্ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন?" বস্তুতঃ এভাবেই (অভিন্ন বিষয় দ্বারা) আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন ও যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর (হে রাসূল!) আপনার রবের বাহিনী সমূহ সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। আর এ (কোরআন) তো মানুষের জন্য (প্রকৃত সত্যকে) স্মরণে করিয়ে দেয়ার মাধ্যম ব নয়।"

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সংখ্যাটিকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার সংখ্যা মাত্র 'ঊনিশ জন' হওয়ার বিষয়টিকে কাফেরদের জন্য ফিতনাহ্ বা পরীক্ষা বানিয়েছেন। এখানে বলা হয় নি যে,

‘১৯’ সংখ্যাটিকে সংখ্যা হিসেবে কোরআন মজীদের সব কিছুর গাণিতিক বিভাজক হিসেবে কাফেরদের জন্য পরীক্ষা বানানো হয়েছে। বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ‘তাদের সংখ্যাটিকে’ (عدة هم) ।

এখানে সুস্পষ্ট যে, কাফেররা দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা ‘মাত্র ১৯ জন’ নে এটাকে অবিশ্বাস করবে। কারণ, তাদের মনে হবে যে, বিশালায়তন দোযখের তত্ত্বাবধান মাত্র ১৯ জন ফেরেশতার পক্ষে অসম্ভব, আর, তাদের ধারণা অনুযায়ী, এরূপ অসম্ভব ও অবাস্তব তথ্য উপস্থাপনকারী ব্যক্তি নবী হতে পারেন না। অন্যদিকে ঈমানদারগণ (ও প্রকৃত আহলে কিতাবগণ) মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা বিশালায়তন দোযখের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবে নে উক্ত ফেরেশতাদের কল্পনাতীত রকমের বেশী শক্তি- ক্ষমতা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে সক্ষম হবে এবং এহেন সৃষ্টির (ফেরেশতার) স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা‘আলার শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে ভক্তি ও বিস্ময়ে তাঁর বরাবরে মাথা নত করে দেবে।

তবে এভাবে ঈমানদারগণ ফেরেশতাদের, বিশেষ করে দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সম্পর্কে যে ধারণার অধিকারী হবে তা একটি মোটামুটি ধারণা; প্রকৃত ধারণা নয়। কারণ, ফেরেশতাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং তাদের প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা ছাড়া আর কেউই পুরোপুরি অবগত নন।

এখানেও ১৯ সংখ্যার মু‘জিযাহর প্রবক্তাদের কেউ কেউ و ما يعلم جنود ربک الا هو - “আর (হে রাসূল!) আপনার রবের বাহিনী সমূহ সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবগত নয়।” - এ আয়াতাংশের অর্থ করতে গিয়ে দাবী করেছেন যে, “আল্লাহর সেনাবাহিনীর সংখ্যাশক্তি সম্পর্কে কেউ অবগত নয়।” এরপর তাঁরা বলেন, অতএব, ৩০ নং আয়াতে উল্লিখিত ১৯ সংখ্যাটি ফেরেশতা সম্পর্কিত নয়।

তাঁদের ভ্রান্তি এখানে যে, “সেনাবাহিনী সমূহকে জানে না” (ما يعلم جنود) বলতে তাঁরা “সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা জানে না” অর্থ গ্রহণ করেছেন। অথচ এ আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ

হচ্ছে : “আর (হে রাসূল!) আপনার রবের বাহিনী সমূহের প্রকৃতি ও শক্তি- ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবগত নয়।” কারণ, যদি বলা হয় : لا يعلم زيد هذا القوم (যায়েদ এ জনগোষ্ঠীটিকে জানে না), তখন কি এর অর্থ হবে “যায়েদ এ জনগোষ্ঠীটির জনসংখ্যা কতো তা জানে না”? নাকি এর অর্থ হবে “যায়েদ এ জনগোষ্ঠীটির পরিচয় (তারা কোত্থেকে এসেছে, কোন্ জাতি বা গোত্রের লোক, তাদের প্রধান চরিত্র- বশিষ্ট্য ইত্যাদি) জানে না”?

আল্লাহ্ তা‘আলার ফেরেশতাদের সংখ্যা যে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না - এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তা বলা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, “আল্লাহর বাহিনীসমূহকে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।” বললে তা শোনামাত্রই যে তাৎপর্য ে াতার মস্তিষ্কে জাগ্রত হবে তা হচ্ছে “আল্লাহর বাহিনীসমূহের স্বরূপ ও প্রকৃতি তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।” এখানে কোনো রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিদর্শন না থাকলে ‘বাহিনীকে জানা’ বলতে ‘বাহিনীর সদস্যসংখ্যা জানা’ অর্থ গ্রহণের সুযোগ নেই। এমনকি যদি এ ক্ষেত্রে ‘সংখ্যা’ শব্দটিকে উহ্য হিসেবে ধরা হয় সে ক্ষেত্রে এ আয়াতাংশের অর্থ হবে “আল্লাহর বাহিনীসমূহের সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।” এ অবস্থায়ও ‘বাহিনীসমূহের সদস্যসংখ্যা’ বুঝাবে না।

এতদসত্ত্বেও তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, এ আয়াতাংশে সেনাবাহিনীসমূহের সদস্যসংখ্যার কথা বলা হয়েছে সে ক্ষেত্রেও ‘১৯’ সংখ্যাটি যে দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা সম্পর্কিত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনায় সর্বত্র ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে জিবরাঈল্, মিকাইল্, আযরা‘ঈল ও ইসরাফীল্ ফেরেশতার কথা এবং বহুবচনে ‘মৃত্যুর ফেরেশতাদের’ (সূরাহ্ আল্- আন্‘আম্ : ৬১) কথা উল্লিখিত আছে।

এমতাবস্থায় উক্ত আয়াত (সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছির্ : ৩০) দৃষ্টে কোরআন মজীদের মতে আল্লাহ্ তা‘আলা কেবল দোযখের তত্ত্বাবধানের জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন, অন্য কোনো কাজে তাঁর পক্ষ থেকে আর কোনো ফেরেশতা নিয়োজিত নেই - মুসলমান ও কাফের নির্বিশেষে

কোনো কোরআন- পাঠকের মনেই এ ধারণা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। কেবল দোযখের তত্ত্বাবধান ছাড়া অন্য কোনো কাজে ফেরেশতা নিয়োজিত নেই ধরে নেয়া হলেই '১৯ জন ফেরেশতা' ও 'ফেরেশতাদের সংখ্যা কেউ জানে না' কথা দু'টির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা দেখা যেতো।

অন্যদিকে '১৯' সংখ্যাটিকে কোরআন মজীদের বর্ণ, শব্দ, আয়াত, সূরাহ্, নাম ইত্যাদির বিভাজক হিসেবে ধরা হলে কাফেরদের পক্ষ থেকে তা অবিশ্বাস করার প্রশ্ন উঠতো না এবং অবিশ্বাস করে তারা এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করতো না : ماذا اراد الله بهذا مثلاً (আল্লাহ্ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন?!) । কারণ, '১৯' সংখ্যাটি দ্বারা চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়ে থাকলে তা বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠতো না, বরং তা হতো মোকাবিলা করার বিষয়। অন্যদিকে '১৯' যদি দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের সংখ্যা হয় কেবল তখনই তা বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ও বিস্মিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে।

এ প্রসঙ্গে সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহর ২৬ নং আয়াতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এ আয়াত অনুযায়ী যে কালামে মশা- মাছির ন্যায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রাণীর উপমা বা দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয়েছে সে কালাম্ আল্লাহর কালাম্ হওয়ার বিষয়টি কাফেরদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে। সেখানেও কাফেরদের প্রতিক্রিয়া অভিন্ন : ماذا اراد الله بهذا مثلاً (আল্লাহ্ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন?!) । একইভাবে দোযখের ফেরেশতাদের সংখ্যার বিষয়টিও তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হয়েছে।

বক্তব্যের ক্রমবিন্যাসের দৃষ্টিতে

সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছির্- এর উপরোদ্ধৃত ৩০ ও ৩১ নং আয়াত ধারাবাহিকভাবে পড়ে এলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কাফেররা ১৯ সংখ্যাটির ব্যাপারে বিস্ময় ও অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলো, কারণ, তাদের ধারণা অনুযায়ী এতো অল্পসংখ্যক ফেরেশতার পক্ষে দোযখের তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়। তাছাড়া ৩১ নং আয়াতে و ما يعلم جنود ربک الا هو (আর আপনার রবের বাহিনীসমূহকে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না" বাক্যটি ماذا اراد الله بهذا مثلاً (আল্লাহ্ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন?) বাক্যের পরে এসেছে। সুতরাং বাহিনীসমূহের সদস্যসংখ্যার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করায় তাদের পক্ষ থেকে তা অবিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। যদি তা- ই হতো, তাহলে এ আয়াতে বাক্য দু'টি অগ্র- পশ্চাত হতো।

ধু তা- ই নয়, '১৯' সংখ্যাটির দ্বারা চ্যালেঞ্জ করাই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে عليها تسعة عشر (তার ওপরে রয়েছে ঊনিশ) আয়াতটি ان هذا الا قول البشر (এটা মানুষের কথা ব নয়) আয়াতের পর পরই স্থানলাভ করতো, এরপর দোযখের বর্ণনা আসতে পারতো; মাঝখানে দোযখের বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন হতো না, বরং মাঝখানে দোযখের বর্ণনা দেয়ার পরে তাকে চ্যালেঞ্জ করার কথা বলা হলে তা সাহিত্যরীতির বিচারে অসঙ্গত হতো।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে কোরআন মজীদ তার যে কোনো একটি সূরাহর বিকল্প রচনার চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর বলেছে যে, তারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না; কেবল এর পরই তাদেরকে দোযখের ভয় দেখিয়েছে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ তথা সাহিত্যরীতির দাবী অনুযায়ী স্বাভাবিক বিন্যাস। সূরাহ্ আল্- বাক্বারাহর উক্ত আয়াত দু'টিতে এরশাদ হয়েছে :

(و ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين.
فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودوها الناس و الحجارة اعدت للكافرين.)

“আর আমি আমার বান্দাহর ওপর যা নাযিল্ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহে থেকে থাকো তাহলে তোমরা এর (এ গ্রন্থের যে কোনো একটি সূরাহর) অনুরূপ সূরাহ্ নিয়ে এসো এবং এ কাজে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের মধ্যকার (বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাতের ক্ষেত্রে) সুদক্ষ সকল ব্যক্তিকে ডেকে নাও, যদি তোমরা (এটি আল্লাহর কালাম্ না হওয়ার মৌখিক দাবীর ব্যাপারে অন্তরে) সত্যবাদী হয়ে থাকো। আর তোমরা যদি তা না পারো - আর (আল্লাহ্ জানেন যে,) তোমরা কখনোই তা পারবে না। অতএব, তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর - যা প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।”

অতএব, সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছির্- এর উপরোদ্ধৃত ৩০ নং আয়াতে যে ‘১৯’ সংখ্যা দ্বারা কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নি, বরং তাতে দোযখের তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে

যৌক্তিকতার দৃষ্টিতেও ‘১৯’ সংখ্যা দ্বারা কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করার বিষয়টি ধোপে টেকে না। কারণ, সর্বসম্মত মত অনুযায়ী সূরাহ্ আল্- মুদ্দাছছির্ নাযিল্ হয়েছে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পরবর্তী মক্কী যিন্দেগীর প্রথম দিকে। অতএব, ঐ সময় তখন পর্যন্ত কোরআন মজীদের যতোটুকু নাযিল্ হয়েছিলো কেবল ততোটুকুর অথবা তার কোনো একটি সূরাহর বিকল্প আনয়নের জন্য কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা সম্ভব ছিলো এবং প্রকৃত পক্ষেও সেভাবেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো - যে চ্যালেঞ্জের মানদণ্ড ছিলো ভাষার প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা, সাহিত্যসৌন্দর্য, সংক্ষিপ্ততা ও জ্ঞানগর্ভতা সহ তাৎপর্যের গভীরতা।

এর পরিবর্তে ঐ সময় সমগ্র কোরআন মজীদের সব কিছু ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবার দাবী করা এবং তার ভিত্তিতে ১৯ সংখ্যার মানদণ্ডে বিকল্প গ্রন্থ রচনার জন্য কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা সম্ভব ছিলো না। এরূপ চ্যালেঞ্জ করতে হলে কেবল পুরো কোরআন নাযিল্ হওয়ার পরেই তা সম্ভব ছিলো। কারণ, পুরো কোরআন মজীদ নাযিল্ হওয়ার পূর্বে এ দাবী গ্রহণযোগ্য হতো না যে, তার সব কিছু ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

কাল্পনিক ভিত্তির প্রয়োজন নেই

বস্তুতঃ যারা কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ বা ঐশী কিতাব্ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের লক্ষ্যে তার সব কিছু ‘১৯’ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা তাঁরা করেছেন কাল্পনিক ভিত্তির ওপরে এবং কোরআন মজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে অথবা অন্যের কৃত মনগড়া ব্যাখ্যা অন্ধভাবে গ্রহণ করে।

কিন্তু কোনো ভিত্তিহীন বিষয়কে অবলম্বন করে কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ বা অলৌকিকত্ব প্রমাণের আদৌ প্রয়োজন নেই; এতে কোনো ফায়দাও নেই, বরং এটা পরিণামে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে সন্দেহ নেই। অতএব, এটি অবশ্য পরিত্যাজ্য।

ধৃষ্টতামূলক কারণ আবিষ্কার

কোরআন মজীদের বর্ণ, শব্দ, আয়াত, সূরাহ্, নাম, হুরুফে মুক্বাত্ত্বা‘আত্, আল্লাহ্র নাম ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারে, অতএব, তার কতক ১৯ সংখ্যা দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারে। এ থেকে ১৯- এর কোনো বিশেষ মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না। তেমনি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ায় তা থেকে কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ও প্রমাণিত হয় না।

১৯ সংখ্যা দ্বারা কোরআন মজীদের মু‘জিযাহ্ প্রমাণের দাবীদাররা বেছে বেছে ঐ সব বিষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন যেগুলোকে তাঁরা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য মনে করেছেন। তবে এতেও তাঁরা পুরোপুরি সফল হন নি। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁরা একদিকে আরবী ভাষা ও কোরআন মজীদের লিপিশৈলী সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন বা অজ্ঞতার ভান করেছেন, অন্যদিকে বহু গোঁজামিলের আ য় নিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা কালামুল্লাহ্ মাজীদের শব্দ বা বর্ণের ব্যবহারের পিছনে এমন সব কল্পিত কারণ আবিষ্কার করেছেন যা আল্লাহ্ তা‘আলা ও কোরআন মজীদের শা’নে অত্যন্ত মারাত্মক। ১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু‘জিযাহ্ প্রমাণের স্বার্থে এ ধরনের ধৃষ্টতা কোরআন মজীদের বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও লিপি নির্বিশেষে যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে প্রদর্শন করা হয়েছে।

সূরাহ্ আন্‌- নামল্‌- এ সাবা'- র রাণী (বিলকিস্‌)কে লেখা হযরত সোলায়মান ('আঃ)- এর পত্র "বিসমিল্লাহির্‌ রাহমানির্‌ রাহীম্‌" দিয়ে রু হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার পর এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তারা দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা "বিসমিল্লাহির্‌ রাহমানির্‌ রাহীম্‌" আয়াতটির সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করার লক্ষ্যেই সূরাহ্‌ আন্‌- নামল্‌- এর মাঝখানে এ আয়াতটি ব্যবহার করেছেন।

একটি বই- এ তো এতাদূর পর্যন্ত দাবী করা হয়েছে যে, সূরাহ্‌ আন্‌- নামল্‌- এর ৩০ নং আয়াতটি অর্থাৎ 'বিস্মিল্লাহ্‌'র আয়াতটি ছাড়াই ঘটনার বর্ণনা পরিষ্কারভাবে বোঝা যেতো, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ধু "বিসমিল্লাহির্‌ রাহমানির্‌ রাহীম্‌" আয়াতটির সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করার লক্ষ্যেই এ আয়াতটি এখানে যোগ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, যদি তা- ই হতো তাহলে সাথে সাথেই মক্কার মোশরেকদের মধ্যকার ফাছ্বাহাত্‌ ও বালাগ্বাতের মহানায়করা এর প্রতিবাদ করতো এবং বলতো যে, শেষ পর্যন্ত ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করতে অক্ষম হয়ে বেদরকারীভাবে কোরআনে একটি অতিরিক্ত 'বিস্মিল্লাহ্‌' ঢুকানো হয়েছে।

উক্ত বইটির লেখকের মতো মূর্খদের ধারণা কি এই যে, এখানে ঘটনা বর্ণনা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য? তা- ই যদি হতো তাহলে তো কোরআন মজীদে আরো যে সব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সে সবের মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণবৈশিষ্ট্য ও প্রশংসার উল্লেখ রয়েছে তা থাকতো না। তাছাড়া কোরআন মজীদে হযরত মূসা ('আঃ)- এর ঘটনাবলী একাধিক জায়গায় বর্ণনা করা হতো না।

এ ধরনের লোকদের হয়তো জানাই নেই যে, কোরআন মজীদ হচ্ছে জ্ঞানের অতল মহাসমুদ্র এবং মানুষের জন্য পথনির্দেশ। কবির কবিতায় যেভাবে ছন্দ ও মাত্রা মিলাবার লক্ষ্যে ক্ষেত্রবিশেষে যথোপযুক্ত শব্দ বাদ দিয়ে অর্থের দিক থেকে দুর্বল শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং কেবল পঙক্তির জোড়া মিলাবার লক্ষ্যে অপ্রাসঙ্গিক কথা যোগ করা হয় কোরআন মজীদ সে ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

[বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত বিখ্যাত কবিরাও তাঁদের কোনো কোনো লেখায় এ কাজ করেছেন। যেমন : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ’ গানে ‘মন ভুলিয়ে নিয়ে যায় কোন্ চুলায় রে’ এবং কবি নজরুল ইসলামের ‘কাজ নেই আর আমার ভালোবেসে, আমি তার ছলনায় ভুলবো না’ গানে ‘সোজা পথ ছাড়া আর চলবো না’ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।]

কিন্তু ১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু‘জিযাহর প্রবক্তারা তাদের মূর্খতার কারণে আল্লাহ্ তা‘আলার ওপর এরূপ দুর্বলতা আরোপ করতেও পিছপা হয় নি। যেমন, বলা হয়েছে : “ক্বাফ্” (ق) হরফটিকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করার লক্ষ্যেই সূরাহ্ “ক্বাফ্”- এ “ক্বাওমে লূত্ব” না বলে “ইখওয়ানু লূত্ব” বলা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদের এক অংশ এর অপর অংশের ব্যাখ্যাকারী - এ হচ্ছে মাযহাব্ ও ফিরক্বাহ্ নির্বিশেষে সকল মুসলিম ওলামায়ে কেরামের দ্বারা সমভাবে স্বীকৃত কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিসমূহের অন্যতম। এ নীতির আলোকে এ বিষয়ের সবগুলো আয়াতকে পাশাপাশি রেখে দৃষ্টিপাত করলেই একটি আয়াতে “ইখওয়ানু লূত্ব্” বলার কারণ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

যেভাবে কোরআন মজীদে “ক্বাওমে নূহ্” বলতে সেই ক্বাওম- কে বুঝানো হয়েছে হযরত নূহ্ (‘আঃ) যে ক্বাওমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেভাবে কোরআন মজীদের যে সব আয়াতে “ক্বাওমে লূত্ব্”- এর কথা বলা হয়েছে তাতে হযরত লূত্ব্ (‘আঃ) যে ক্বাওম্- এ জন্মগ্রহণ করেন সে ক্বাওম্- এর কথা বুঝানো হয় নি। বরং “ক্বাওমে লূত্ব” বলতে সেই ক্বাওম্- কে বুঝানো হয়েছে হযরত লূত্ব্ (‘আঃ)কে যার হেদায়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। কারণ, হযরত লূত্ব্ (‘আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম্ (‘আঃ)- এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁদের উভয়ই ইরাক্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর হযরত লূত্ব্ (‘আঃ) ফিলিস্তিনের মৃত সাগরের উপ লবর্তী একটি ক্বাওমের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এ অর্থেই তাদেরকে “ক্বাওমে লূত্ব্” বলা হয়েছে। সূরাহ্ ক্বাফ্- এর আয়াতে

"ইখওয়ানু লূত্ব্" (লূত্ব্-এর ভ্রাতৃসম্প্রদায়) উল্লেখ থাকায় এটি "ক্বাওমে লূত্ব্" কথাটির ব্যাখ্যাকারী হয়েছে।

সূরাহ্ আল্-আ'রাাফ্-এর ৬৯ নং আয়াতে بصطة শব্দের ص হরফের ওপরে ছোট করে س হরফ লেখা সম্পর্কে দাবী করা হয়েছে যে, এটি ভুল বানান এবং ص হরফটিকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করার লক্ষ্যেই بسطة শব্দটি এ সঠিক বানানে না লিখে ভুল বানানে بصطة লেখা হয়েছে এবং শব্দটি যে আসলে بسطة তা বুঝাতে তার ওপরে ছোট করে س লেখা হয়েছে।

অথচ প্রকৃত ব্যাপার এরূপ হলে এটা বরং কাফেরদের হাতকেই শক্তিশালী করতো। কারণ, তারা বলতে পারতো : 'যে কিতাবে শব্দের বানান ভুল তা কী করে আল্লাহর কালাম্ হয়?' আর সত্যি সত্যিই যদি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার কোনো ব্যাপার থাকতো তাহলে তারা খুব সহজেই বলতে পারতো যে, শব্দের ভুল বানান লিখে ص হরফটিকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছে।

বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সব ভাষাতেই বানানরীতি ও উচ্চারণ বিধিতে কতক শব্দের ক্ষেত্রে একাধিক উচ্চারণের ও একাধিক লেখ্য বানানের বধতা আছে। হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর যুগে আরবী ভাষায় কম হলেও কতক শব্দের একাধিক উচ্চারণ ও লেখ্য বানান থাকা অসম্ভব কিছু ছিলো না। নিঃসন্দেহে তখন এরূপ প্রচলন ছিলো, নইলে কাফেররা এতে আপত্তি তুলতো। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে বলে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বক্তব্যের শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য রূপের পার্থক্য

এবার কোরআন মজীদের সব কিছু ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবার দাবীদারদের বক্তব্য অন্য এক মানদণ্ডে বিচার করা যেতে পারে। তা হচ্ছে যে কোনো ভাষার বণযোগ্য ও দর্শনযোগ্য (লিখিত) রূপের মধ্যকার পার্থক্যের মানদণ্ড।

এখানে কোরআন মজীদের নুযূল্ (অবতরণ) প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, "নুযূল্" মানে 'নীচে নেমে আসা' এবং এর তাৎপর্য যা নীচে নেমে আসে তার প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। কারণ, যা নীচে নেমে আসে তার প্রকৃতি অনুযায়ী এ নীচে নামার কাজটি স্থানগত বা গুণগত হতে পারে; বস্তুগত কিছু হলে তা স্থানগতভাবে উঁচু স্থান থেকে নীচু স্থানে নেমে আসবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু অবস্তুগত কিছু হলে তার নীচে নামা বা অবতরণ হবে গুণগত বা মানগত দিক থেকে।

আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় সত্তার রহস্যলোকে (عالم لاهوت - 'আলমে লাাহূত) নিহিত জ্ঞান পার্থিব জগতে (عالم ناسوت - 'আলমে নাাসূত) এসে পৌঁছতে একাধিক পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং প্রতিটি পরবর্তী পর্যায়েই তা পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে গুণগত বা মানগত দিক থেকে নীচে নেমে এসেছে বা নাযিল্ হয়েছে।

'আলমে লাহূতে আক্ষরিক অর্থেই সৃষ্টিলোক, তার গতিপ্রকৃতি ও ঘটনাবলীর সমস্ত জ্ঞানই হুবহু নিহিত রয়েছে যাতে সৃষ্টির রু থেকে শেষ পর্যন্ত বস্তুগতউপাদান -অবস্তুগত সব কিছুর গঠন -, গঠনকাঠামো -, সর্বাংশে গঠনউপাদানের অনুপাত -, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ, স্পর্শযোগ্যতা, গতি, অনুভূতি ও সকল মাত্রা (Dimension) সহ বস্তুগত ও অবস্তুগত রূপ নিহিত রয়েছে যে জ্ঞানকে -'ইলমে হুযূরী (علم حضورى - Exact Knowledge) বলা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ জ্ঞান থেকে মানুষকে দেয়ার মতো পুরো জ্ঞানই উপরোক্ত সবগুলো বশিষ্ট্য সহকারে, তবে কেবল অবস্তুগত রূপে লাওহে মাহফূযে নাযিল্ করে অর্থাৎ গুণগত ও মানগতভাবে অবতরণ করিয়ে কোরআন মজীদ রূপে সংরক্ষণ করেন। কেবল অবস্তুগত রূপ হলেও এবং দ্বিতীয় স্তরের হলেও এ ও -'ইলমে হুযূরী বটে।

এরপর লাওহে মাহফূযের এ কোরআন লাইলাতুল্ ক্বাদরে হুবহু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর হৃদয়ে প্রবেশ করে স্থানগ্রহণ করে। অতঃপর তা জিবরাঈল ('আঃ)- এর সহায়তায় আরবী ভাষার শব্দ ও বাক্যের আ য়ে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষসমূহে স্থানলাভ করে। এভাবে 'ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ পুনরায় নাযিল্ হয়ে (গুণগত ও মানগতভাবে

নীচে নেমে) ভাষাগত বণযোগ্য প্রতীকী শব্দ ও বাক্যে পরিণত হয় - যাতে তাঁর হৃদয়স্থ কোরআন মজীদের 'ইলমে হুযূরী রূপ অনুপস্থিত। এরপর তা হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর কণ্ঠনিঃসৃত শব্দগত কোরআন মজীদ রূপে আরেক ধাপ নীচে নেমে আসে (নাযিল্ হয়) এবং তাঁর নিয়োজিত ওয়াহী- লেখকগণ তা কালির হরফে লিপিবদ্ধ করে নেন যাতে হুযূর (ছ্বাঃ)- এর পবিত্র কণ্ঠের বণযোগ্য ধ্বনি অনুপস্থিত; এ আরেক ধরনের নুযূল্ বা অবতরণ। এরপর কোরআন মজীদ ছ্বাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে উচ্চারিত ও লিখিত রূপে পরবর্তী প্রজন্মসমূহ হয়ে বর্তমান প্রজন্মসমূহ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে এবং ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।

এটা অনস্বীকার্য যে, বণযোগ্য কোরআন লাওহে মাহফূয ও হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়স্থ 'ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীকী রূপ মাত্র - যা মানুষের প্রতীকী ভাষার বণযোগ্য ও দর্শনযোগ্য শব্দাবলী থেকে মুক্ত। অবশ্য লাওহে মাহফূযে বা হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়স্থ 'ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদে বিভিন্ন মানুষের যে সব উক্তি অন্তঃকর্ণে বণযোগ্য (বস্তুগত কর্ণে নয়) ধ্বনি রূপে সংরক্ষিত রয়েছে সেগুলোর স্বরূপ পাখীর গান ও ঝর্ণার কলকাকলীর সমপর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে নিহিত শব্দ বা ধ্বনির অংশ মাত্র - যা উদ্ধৃতি রূপে পরিগণিত নয়। অনুরূপভাবে এতে নিহিত লিখিত বস্তুর দৃশ্যাবলী প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমপর্যায়ভুক্ত; প্রাকৃতিক বিষয়াদি বা ঘটনাবলীর প্রতীকী ভাষার বর্ণনা থেকে মুক্ত। অন্যদিকে কালির হরফে লিখিত কোরআন মজীদ হচ্ছে কণ্ঠনিঃসৃত বণযোগ্য কোরআন মজীদের প্রতীকী রূপ।

বলা বাহুল্য যে, উচ্চারিত ও লিখিত ভাষিক শব্দমালা হচ্ছে এক ধরনের আপেক্ষিক অস্তিত্ব (وجود اعتباری) মাত্র এবং খোদা- প্রদত্ত প্রতিভা বলে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ) ছাড়া অন্য মানুষের হৃদয় 'ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও আত্মিক তথা সত্তাগত (نفسانی) পরিপক্বতা ও পবিত্রতার অধিকারী নয়, সেহেতু তাদের কাছে স্থানান্তরের জন্য কোরআন মজীদকে উচ্চারিত ও লিখিত ভাষিক শব্দমালার

আপেক্ষিক অস্তিত্বে নামিয়ে আনা (নাযিল্ করা) ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। অতএব, বণযোগ্য ও পঠনযোগ্য প্রতীকী কোরআন মজীদে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়স্থ কোরআন মজীদ ততোখানিই প্রতিফলিত হয়েছে যতোখানি মানুষের ৎ ষ্ঠতম ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিলো। নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর হৃদয়ে কোরআন মজীদের যে প্রকৃত রূপ (حقیقت قرآن) বিদ্যমান তথা 'ইলমে হুযূরী রূপ কোরআন মজীদ, তা কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হতে পারে না। কারণ, তা প্রতীকী বর্ণ, শব্দ ও বাক্য থেকে মুক্ত। অন্যদিকে এর নিম্নতর (নাযিলকৃত) দু'টি রূপ অর্থাৎ বণযোগ্য ও পঠনযোগ্য প্রতীকী কোরআন মজীদের মধ্যে বণযোগ্য প্রতীকী কোরআন পর্যায়গত ও মানগত উভয় দিক থেকেই পঠনযোগ্য প্রতীকী কোরআনের তুলনায় অগ্রবর্তী ও অগ্রাধিকারী।

এটা কেবল এ কারণে নয় যে, পঠনযোগ্য লিখিত কোরআনে হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)- এর কণ্ঠে উচ্চারিত কোরআনের ধ্বনিব্যঞ্জনা ও আবেগ- আন্তরিকতার সংমি ণ অনুপস্থিত এবং আমরা আমাদের প্রত্যেকের আবেগ- আন্তরিকতার স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে তা পাঠ করে থাকি, বরং এই সাথে এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষের উচ্চারিত ভাষাকে স্থানগত ও কালগত ব্যবধানে - যেখানে তার কণ্ঠস্বর পৌঁছে না, সেখানে পৌঁছানোর প্রয়োজনে প্রতীকী লিখিত ভাষার উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই লিখিত ভাষায় উচ্চারিত বাণীর অনেক আনুষঙ্গিক দিকের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানগত দিকের বিচারে কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী লিখিত বাণীর তুলনায় অগ্রবর্তী ও অগ্রাধিকারী।

[অবশ্য কোরআন মজীদ রু থেকেই নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর কণ্ঠ থেকে ছ্বাহাবায়ে কেরামের কণ্ঠে এবং এভাবে আমাদের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে - যাতে নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর কণ্ঠে উচ্চারিত কোরআনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্ভব সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছে।]

মানুষের প্রতিটি ভাষায়ই বণযোগ্য ভাষার লিখিত রূপে তার বণযোগ্য রূপের তুলনায় সীমাবদ্ধতা থাকে। আরবী ভাষার লিখিত রূপে এ সীমাবদ্ধতা সর্বনিম্ন মাত্রায় হলেও তা এ থেকে

পুরোপুরি মুক্ত নয়। আরবী ভাষার লিখিত রূপের ক্রমোন্নতি তথা পরবর্তী কালে নোকতাহ্‌, স্বরচিহ্ন, ই'রাব্‌ চিহ্ন ও যতিচিহ্ন সংযোজন এ কারণেই করতে হয়েছিলো। কিন্তু বণযোগ্য কোরআনে কোরআন- পাঠকের কণ্ঠস্বর ও আবেগানুভূতির পার্থক্য ঘটলেও নোকতাহ্‌, স্বরচিহ্ন, ই'রাব্‌ চিহ্ন ও যতিচিহ্ন সংক্রান্ত কোনো ঘাটতি কখনোই ছিলো না। এছাড়া অন্য সমস্ত ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায়ও বণযোগ্য শব্দের লিখিত রূপে কতক ক্ষেত্রে একাধিক রূপ থাকতে পারে বা বর্ণগত পরিবর্তনের বধতা থাকতে পারে। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে কন্ঠ থেকে কণ্ঠে স্থানান্তরিত বণযোগ্য বাণীতে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে না।

মোদ্দা কথা, মানুষের মাঝে প্রচলিত কথার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কোরআন মজীদের ক্ষেত্রেও বণযোগ্য বাণী ও তার শব্দাবলীই হচ্ছে প্রকৃত বাণী ও শব্দাবলী - লিখিত রূপ তার সীমিত প্রতিনিধিত্ব করছে মাত্র। আর যেহেতু লিখিত রূপে কালের প্রবাহে কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে, এমনকি অন্য বর্ণমালায়ও তা লেখা যেতে পারে এবং তা- ও সমভাবেই বণযোগ্য বাণীর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হতে পারে, সেহেতু কোনো বাণীর বর্ণ (হরফ) ও শব্দ (wor d) নির্ধারণে তার বণযোগ্য রূপকেই বিবেচনা করতে হবে। অতএব, প্রচলিত রেওয়াজের কারণে কোনো শব্দের লিখিত রূপে কোনো বর্ণ বাড়ানো বা কমানো হয়ে থাকলে অথবা রূপ পরিবর্তিত হয়ে থাকলে সে কারণে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা অপরিবর্তিত বণযোগ্য বাণীর শব্দের বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিতে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটার কোনো সুযোগ নেই।

আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতির বিবর্তন

মানবজাতির সকল ভাষারই লিখিত রূপ ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেছে এবং জীবিত ভাষাগুলোর লিখিত রূপে এখনো পূর্ণতার পথে অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। অনুরূপভাবে কোরআন মজীদ যখন নাযিল্ হয় তখনো আরবী ভাষার লিখনপদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে নি। তখনো তা পূর্ণতা অভিমুখী বিবর্তনের পথে ছিলো। ফলে আরবী লিপিতে এ ধরনের বশিষ্ট্য রয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিখনে বণের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে না। তবে আরবদের ভাষার এক অনন্য বশিষ্ট্য এই যে, আরব উপদ্বীপের অশিক্ষিত যাযাবর বেদুঈনদের ভাষাই ছিলো প্রকৃত আরবী ভাষা ও এ ভাষার মানদণ্ড (Standard language)। অন্যদিকে বিজাতীয়দের সাথে মেলামেশার কারণে শহুরে লোকদের ভাষায় অনেক দুর্বলতা প্রবেশ করেছিলো। বস্তুতঃ যাযাবর আরবরা বইপুস্তক পড়ে ন -য়, বরং পুরুষানুক্রমে শ্রুতির মাধ্যমে দ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা করতো ও সে ভাষায় কথোপকথন করতো। পরে আরবদের এ ভাষাকে লিখিত রূপ দানের প্রক্রিয়া রু হয় এবং তার লিখিত রূপ ধাপে ধাপে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়।

আরবী ভাষার লিখিত রূপে প্রথম দিকে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া- জানা আরবরা কোনো লিখিত জিনিস পড়তে গিয়ে তা থেকে ভুল তাৎপর্য গ্রহণ করতো না। কারণ, অভ্যাসগত কারণে তারা তা সঠিক উচ্চারণেই পড়তো। ব্যাকরণিক নিয়মগুলোর ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ছিলো অভ্যাসগত। প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, যাযাবর বেদুঈনদের ভাষা ও কোরআন মজীদের ভাষা বিশ্লেষণ করেই পরবর্তীকালে আরবী ব্যাকরণের নিয়মাবলী উদঘাটন করা হয়।

এখানে আরবী লিপির পূর্ণতাভিমুখী অভিযাত্রার কয়েকটি ধাপ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রথমে আরবী ভাষার লিপিতে নোকতাহ্ ব্যবহার করা হতো না। ফলে, উদাহরণস্বরূপ, "সীন্" (س) ও "শীন্" (ش) উভয় হরফই (س) রূপে লেখা হতো। কিন্তু আরবরা অভ্যাসগত কারণেই বুঝতে পারতো কোথায় "সীন্" (س) উচ্চারিত হবে এবং কোথায় "শীন্" (ش) উচ্চারিত হবে।

পরবর্তীকালে অনারবদের উচ্চারণের সুবিধার্থে এ ধরনের হরফগুলোতে নোকতাহ্ যোগ করা হয়। ফলে উচ্চারণ অনুযায়ী কতক শব্দে "সীন্" (س) কে লেখা হতে থাকলো "শীন্" (ش)। কিন্তু মূলতঃ আরবী ভাষায় এ দু'টি অভিন্ন হরফ। তাই প্রথমটির নাম দেয়া হলো سا ء معربة (আরবীকৃত সীন্) এবং দ্বিতীয়টির নাম দেয়া হলো سا ء معجمة (অনারবীকৃত সীন্)।

[অন্যান্য ভাষায়ও একই বর্ণের শব্দমধ্যে অবস্থানভেদে বা অন্য কারণে একাধিক উচ্চারণ, এমনকি দুই বর্ণের মধ্যে উচ্চারণ বদলের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন : বাংলা ভাষায় 'সকাল' লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ করা হয় 'শকাল', তেমনি 'বসবাস' লিখে 'বশোবাশ্' উচ্চারণ করা হয়। অন্যদিকে ' াবণ' লিখে উচ্চারণ করা হয় 'স্রাবণ' ও 'বি ী" লিখে পড়া হয় 'বিস্রি'।]

এছাড়া আরবী ভাষায় "আলিফ" ও "হামযাহ্" দু'টি স্বতন্ত্র বর্ণ এবং দু'টিতে আসমান- যমীন পার্থক্য। হামযাহ্ বর্ণটি প্রথাগতভাবে আরবী ভাষায় হামযাহ্ (ء) ও আলিফ্ (ا) এই দুইভাবে লেখা হয় এবং আলিফরূপে ব্যবহৃত হামযাহকে সাধারণতঃ "আলিফ্" বলা হয়। কিন্তু এ রকম লেখা হলেও কার্যতঃ আলিফ্ ও হামযাহ্ স্বতন্ত্র বর্ণ। (অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে হামযাহ্ বুঝানোর জন্য আলিফ্- এর ওপরে বা নীচে ছোট করে হামযাহ্ লেখা হয় (إ/أ)।) এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝার জন্যে মনে রাখতে হবে যে, আলিফ হচ্ছে স্বরচিহ্ন। আর যেহেতু তা চিহ্নমাত্র, বর্ণ নয়, সেহেতু শব্দমধ্যে ব্যতীত তার কোনো নিজস্ব ধ্বনি নেই এবং তা কোনো হারাকাত্ (যবর, যের ও পেশ) গ্রহণ করে না, বা তা সাকিন্ও হয় না, তাশদীদযুক্তও হয় না এবং শব্দের রুতে বসে না; আলিফ্ কেবল যবরযুক্ত বর্ণের পরে বসে যবরের তথা আ- কারের উচ্চারণকে দীর্ঘ করে। অতএব, أُ /إِ /أَ আলিফ নয়, হাম্যাহ্ (ء)।

এছাড়া আলিফ দুইভাবে লেখা হয় : আলিফ্ (ا) আকারে ও ইয়া (ى) আকারে। শেষোক্ত আলিফকে আলিফে মাকসূরাহ্ (الف مكسورة - ভাঙ্গা আলিফ্) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ موسا (মূসা)কে موسى রূপে লেখা হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা কম্পিউটারের সাহায্যে কোরআন মজীদের হরফ সমূহ গণনা করে ১৯ দিয়ে ভাগ করতে চান তাঁরা আলিফ- রূপী হামযাহকে আলিফ থেকে এবং ইয়া- রূপী আলিফকে ইয়া থেকে কীভাবে আলাদা করবেন?

এছাড়া আরবী ভাষায় কোনো শব্দের মাঝে বা শেষে কোনো বর্ণ পর পর দুই বার থাকলে এবং প্রথমটি সাকিন্ হলে তা এক বার লেখা হয় এবং বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। লেখায় একটি থাকলেও প্রকৃত পক্ষে সেখানে বর্ণ হচ্ছে দু'টি। যদিও পরবর্তীকালে আরবী লিপিতে ই'রাব্- চিহ্ন যোগ করার সময় একটি দ্বিত্বচিহ্ন (তাশদীদ)ও যোগ করা হয়, কিন্তু মূল আরবীতে হরফ একটিই। প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটারের সাহায্যে গণনার ক্ষেত্রে সেটিকে দু'টি গণনা করা হবে, নাকি একটি ধরা হবে? এটা একটা বিচার্য বিষয় বটে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বিশেষভাবে কোরআন মজীদের লিপিতে কতক আলিফ বাদ দেয়া হয়েছে। শ্রুতির ভিত্তিতে পুরুষানুক্রমে চলে আসা পঠনে তা উচ্চারিত হচ্ছে, কোরআন ভিন্ন অন্যান্য লেখায়ও তা লেখা হচ্ছে, কিন্তু কোরআন মজীদের ঐতিহ্যিক লিপিতে তা নেই, যদিও তা না থাকার কারণে কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে উচ্চারণে ভুলের কোনো কারণ নেই। কারণ, কোরআন পাঠ শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা হয় অথবা তার প্রস্তুতিপর্বের অধ্যয়ন থেকে জেনে নেয়া হয় যে, ঐ সব ক্ষেত্রে আলেফ উহ্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ رحمان শব্দটি কোরআন মজীদের লিপিতে رحمن রূপে লেখা হয়, কিন্তু লেখায় আলিফ বাদ গেলেও কোরআন তেলাওয়াতে আলিফ উচ্চারিত হয় অর্থাৎ م হরফটি দীর্ঘায়িত করে উচ্চারণ করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটার কি এ সব ক্ষেত্রে আলিফকে গণনা করবে, নাকি করবে না?

[অবশ্য বিশেষ করে অনারবদের জন্যে কোরআন মজীদের অনেক লিপিতেই এ ধরনের ক্ষেত্রে বিলোপকৃত আলিফের পূর্ববর্তী বর্ণের ওপরে (যেমন : رحمان শব্দের বেলায় م বর্ণের ওপরে) ছোট করে আলেফ লেখা হয়; বাংলাভাষীদের নিকট এটি "খাড়া যবর" নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে তা আলেফ।]

এছাড়া আরবী ভাষায় তানভীনের ব্যবহার কম্পিউটার- গণনার জন্য আরেকটি সমস্যা। আরবী ভাষায় বিশেষ্য ও বিশেষণের শেষে যে তানভীন্ যুক্ত হয় তা মূলতঃ একটি সাকিন্ নূন্ (ن) এবং বাক্যের শেষে ব্যতীত সব ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হয়। যেমন : كتابٌ (কিতাাবুন্)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তানভীনগুলোকে কি নূন্ (ن)- এর সাথে গণনা করা হবে, নাকি হবে না? বিশেষ করে যেহেতু বাক্যশেষের তানভীন্ উচ্চারিত হয় না, এমতাবস্থায় তা কি গণনা করা হবে, নাকি হবে না?

এছাড়া কোরআন মজীদের লেখ্য রূপে বিভিন্ন হরফ দ্বারা যতিচিহ্ন ও উচ্চারণ- নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটার কি সেগুলোকে গণনা করবে, নাকি করবে না? গণনা করলে তা কি সংশ্লিষ্ট হরফ সমূহের প্রকৃত সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটাবে না?

কোরআন মজীদের লিপিতে বর্ণবিলুপ্তি (حذف) ও শব্দমিলন (ادغام) আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন : الله শব্দের আগে لِ শব্দ (স্মর্তব্য, ل একটি প্রতীকী হরফ হলেও - যার কোনো নিজস্ব অর্থ নেই - এখানে এটি একটি শব্দও (অব্যয়) বটে যার মানে '- এর/- এর জন্য') যোগ হলে তা لله রূপে লেখা হয়, لالله রূপে নয়। এখানে الله শব্দের ال বিলুপ্ত হয়েছে। এ ধরনের বিলুপ্তি আরো বহু ক্ষেত্রে রয়েছে। তেমনি কোরআন মজীদের "বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম্" আয়াতে সবখানেই بسم الله লিখতে اسم শব্দের আলিফ (ا = প্রকৃত পক্ষে হামযাহ্) বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ ধরনের বিলোপকে বহু ব্যবহার (كثرة الاستعمال) জনিত বিলোপ বলা হয়। কিন্তু এ বিলোপ সত্ত্বেও সর্বাবস্থায়ই الله ও اسم আলিফ/ হামযাহ্ (ا) দ্বারা সূচিত শব্দ। সূরাহ্ আল্- 'আলাক্- এর প্রথম

আয়াতে باسم লিখতে আলিফ (ا) বিলুপ্ত করা হয় নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটার এ বিলুপ্ত হরফগুলো কীভাবে গণনা করবে?

এছাড়া কোরআন মজীদে যেভাবে لِ শব্দ الله শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে لله হয়েছে এবং ب শব্দ اسم শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে بسم হয়েছে সেভাবে আরো অনেক শব্দই অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কম্পিউটার এ ধরনের যুক্ত শব্দগুলোকে কীভাবে গণনা করবে - এক শব্দ হিসেবে, নাকি দুই শব্দ হিসেবে?

সব কিছু ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়

এবার ১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তাদের দাবীকে প্রায়োগিক দিক থেকে ও বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাক।

দাবী করা হয়েছে যে, بسم الله الرحمن الرحيم আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এতে বর্ণসংখ্যা তাদের দাবীর তুলনায় বেশী। কারণ, মূলতঃ বাক্যটি হচ্ছে : باسم الله الرحمان الرحيم এবং এতে বর্ণসংখ্যা ২১টি। আর الله শব্দটি মূলতঃ الإلاه (আল্- ইলা◌াহ্); সে হিসেবে বর্ণসংখ্যা ২৩টি।

১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তাদের পক্ষ হতে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন মজীদের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত সমূহ অর্থাৎ সূরাহ্ আল্- 'আলাক্ব- এর প্রথম পাঁচ আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সমূহ ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। বরং এ পাঁচটি আয়াতে শব্দসংখ্যা ২৫ ও বর্ণসংখ্যা তাশদীদযুক্ত হরফকে এক হরফ ধরলে ৭৮ এবং দুই হরফ ধরলে ৮৪ - যা ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

আয়াতগুলো হচ্ছে :

(اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم.)

এবার এ আয়াতসমূহের শব্দগুলো গুণে দেখা যাক :

(১)اقرأ (٢) ب (٣) اسم (٤) رب (٥) ک (٦) الذى (٧) خلق (٨) خلق (٩) الانسان (١٠) من (١١) علق (١٢) اقرأ (١٣) و (١٤) رب (١٥) ک (١٦) الاکرم (١٧) الذى (١٨) علم (١٩) ب (٢٠) القلم (٢١) علم (٢٢) الانسان (٢٣) ما (٢٤) لم (٢٥) يعلم.

এখানে ২৫টি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই সাথে ২ বার انسان শব্দে, ১ বার اكرم শব্দে ও ১ বার قلم শব্দে যুক্ত আলিফ- লাম্ (ال) কে আলাদা শব্দ হিসেবে গণ্য করলে মোট শব্দসংখ্যা দাঁড়ায় ২৯টিতে, আর ال - কে শব্দ হিসেবে গণ্য না করলে শব্দসংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে।

১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তারা সম্ভবতঃ তাঁদের গণনা থেকে দু'টি ب, দু'টি ک ও একটি لم বাদ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু আরবী ভাষায় এর সবগুলোই শব্দ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কারণ ک হচ্ছে ما ও الذى - এর ন্যায় সর্বনাম এবং ب হচ্ছে مِن - এর ন্যায় অব্যয়। এমতাবস্থায় একটিকে গণনা করা ও একটিকে গণনা না করা সম্ভব নয়। তবে এগুলো গণনা না করলেও শব্দসংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি। তাঁরা আর কোন্ শব্দ বাদ দিয়েছেন বোঝা মুশকিল।

গোঁজামিলের আশ্রয়গ্রহণ

কোরআন মজীদের সূরাহ্- সংখ্যা ১১৪টি যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। [তবে আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এ সংখ্যাটি একই সাথে ২, ৩ ও ৬ দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য।] ১১৪টি সূরাহর মধ্যে সূরাহ্ আত্- তাওবাহ্ বাদে বাকী ১১৩টি সূরাহর রুতে بسم الله الرحمن الرحيم রয়েছে এবং সূরাহ্ আন্- নামল্- এর মাঝখানে আরো একবার এ আয়াতটি রয়েছে। ফলে এর সংখ্যা দাঁড়ালো ১১৪তে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। এখানে ১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তারা সবগুলো "বিসমিল্লাহ্"কে হিসাব করেছেন। কিন্তু এ আয়াতে ব্যবহৃত الرحمن ,الله ,اسم ও الرحيم - এই চারটি শব্দ সমগ্র কোরআন মজীদে যতোবার ব্যবহৃত হয়েছে তাকে ১৯ দিয়ে ভাগ করতে গিয়ে তাঁরা সূরাহ্ আল্- ফাতেহাহ্ ব্যতীত বাকী সূরাহগুলোর (১১২টি সূরাহর) রুতে ব্যবহৃত

بسم الله الرحمن الرحيم কে হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন। কারণ, অন্যথায় তা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা একই আয়াত একবার হিসাব করেন এবং একবার হিসাব থেকে বাদ দেন কোন্ যুক্তিতে?

১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তাদের বক্তব্যে এ ধরনের গোঁজামিল আরো অনেক রয়েছে। যেমন : কোরআন মজীদে ১৪টি হরফ দিয়ে ১৪ ধরনের "হুরূফে মুক্বাত্বত্বা'আত্" তরী করা হয়েছে এবং তা ২৯টি সূরাহর রুতে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ তিনটি সংখ্যা যোগ করলে হয় ৫৭ - যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনটি বিষয়ের সংখ্যা একত্রিত করে কেন ভাগ করতে হবে? প্রতিটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে কেন ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়?

১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তারা স্বীকার করেছেন যে, الله, الرحمن ও الرحيم - এই তিনটি নাম বাদে কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলার আর যে সব গুণবাচক নাম উল্লিখিত হয়েছে তার কোনোটিই ১৯ সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে : কেন? ১৯ সংখ্যার মু'জিযাহর দাবী সত্য হলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি গুণবাচক পবিত্র নামই স্বতন্ত্রভাবে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া উচিত ছিলো। আর প্রকৃত পক্ষে উক্ত তিনটি পবিত্র নামও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় - তা আমরা পূর্বেই প্রমাণ করেছি।

সংখ্যা কলুষিত!

১৯ সংখ্যার তথাকথিত মু'জিযাহর প্রবক্তাদের পক্ষ থেকে ১৯ সংখ্যাটি গ্রহণের পক্ষে একটা উদ্ভট যুক্তি পেশ করা হয়েছে। তা হলো, অন্যান্য মৌলিক সংখ্যা বিভিন্ন ধরনের ভুল অর্থ আরোপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেছে যে, ১৩ সংখ্যাকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হয়, কিন্তু ১৯ সংখ্যাটি নিষ্কলুষ রয়ে গেছে। [স্মর্তব্য, এটা পুরোপুরি বাহাইদের যুক্তি। কারণ, তারা ১৯ সংখ্যকে পবিত্র গণ্য করে থাকে।]

প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো সংখ্যাকে কি কলুষিত করা যায়? কোনো সংখ্যার কলুষিত হওয়ার বিষয়টি কি বিচারবুদ্ধি গ্রহণ করে? পাশ্চাত্য জগতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারার কারণে লোকেরা ১৩ সংখ্যাকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করে এবং অনেক ক্ষেত্রে নাকি ১৩তম ক্রমিক খালি রাখা হয় অর্থাৎ ক্রমিক নং ১২-র পরেই ১৪ আসে বা ১২-র পরে '১২-এ' এবং তার পরে ১৪ ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এর কোনো মূল্য আছে কি? বিশেষ করে কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের কুসংস্কারের কোনো মূল্য আছে কি? যদি তা-ই থাকতো তাহলে কোরআন মজীদে ১৩তম ক্রমিকে কোনো সূরাহ্ থাকতো না।

আমরা যদি যুক্তির খাতিরে স্বীকার করে নেই যে, সংখ্যা কলুষিত হতে পারে বা সংখ্যাকে কলুষিত করা যেতে পারে, তাহলে বলবো যে, ১৯ সংখ্যাও কলুষিত হয়েছে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সৃষ্ট বাহাই ধর্মে ১৯ সংখ্যাটি পবিত্র; তাদের সপ্তাহ্ ৭ দিনে নয়, ১৯ দিনে এবং এ ধরনের ১৯ সপ্তাহে মাস ও ১৯ মাসে বছর। এমতাবস্থায় ১৯ সংখ্যার কলুষিত হয়ে পড়ার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে কি?

এ থেকে প্রায় নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, ১৯ সংখ্যা দ্বারা কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ প্রমাণ করা সম্ভব বলে যে তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে তার উদ্ভবের পিছনে অবশ্যই বাহাইদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র কার্যকর রয়েছে।

১৯ সংখ্যার মু'জিযাহ্ স্বীকারের বিপদ

অনেকে মনে করেন যে, ১৯ সংখ্যার দ্বারা কোরআন মজীদের মু'জিযাহ্ প্রমাণের তত্ত্বটি ঠিক না হলেও এটিকে যেহেতু কোরআন মজীদের সপক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এর দ্বারা অনেকের মনে, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের মনে কোরআনের ওপর বিশ্বাস মযবূত হবে। অতএব এটি ভুল হলেও এটিকে খণ্ডন করা ঠিক নয়।

এ এক ধরনের বিপজ্জনক প্রবণতা। প্রথমতঃ অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্মসমূহের ন্যায় ইসলাম কোনো অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন পন্থায় নিজেকে গ্রহণ করানোর পক্ষপাতী নয়, বরং এর বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন পন্থা সাময়িকভাবে ইসলামের

গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও তার প্রচারের জন্য সহায়ক হিসেবে দেখা গেলেও চূড়ান্ত পরিণতিতে তা ইসলামের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হিসেবে প্রমাণিত হতে বাধ্য।

১৯ সংখ্যার মু'জিযাহর তত্ত্ব যদি গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায় তাহলে লোকেরা কোরআন মজীদের সব কিছুকেই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বসবে। অতঃপর তারা যখন দেখবে যে, কোরআন মজীদের অনেক কিছুই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় আর আমরা) ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি যে, কোরআন মজীদের অনেক কিছুই ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়(, তখন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব্ সমূহের ন্যায় কোরআন মজীদও বিকৃত হয়েছে বলে তাদের মনে ধারণা সৃষ্টি হবে। এর ফলে তাদের ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এ ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা তত্ত্বের প্রচার বন্ধ করা এবং যেহেতু ইতিমধ্যেই তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে সেহেতু তার ভিত্তিহীনতার বিষয়টি তুলে ধরা অপরিহার্য।

পরিশিষ্ট- ৩

ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

(‘**আঃ**) : নবী- রাসূলগণ ও হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইতের ধারায় আগত মা‘ছুম্ ইমামগণ সহ মা‘‘ছুম্ ব্যক্তিত্বগণের নাম উচ্চারণের পর পঠিতব্য দো‘আর নির্দেশক। মূল বাক্যাবলী : ‘আলাইহিস্ সালাম - তাঁর (পুরুষ) ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, ‘আলাইহাস্ সালাম - তাঁর (নারী) ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, : ‘আলাইহিমাস্ সালাম - তাঁদের উভয়ের (দু’জন পুরুষ, দু’জন নারী বা দু’জন নারী- পুরুষ) ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, ‘আলাইহিমুস সালাম - তাঁদের (পুরুষ বা নারী- পুরুষ) ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আকরাম(اکرم)) : অধিকতর বা সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী ও সম্মানার্হ। দহু ব্যক্তির মধ্যে একজনকে “আকরাম” বলা হলে তার অর্থ হবে ‘অধিকতর সম্মানিত ও সম্মানার্হ’ এবং বহু জন বা সকলের মধ্যে ‘আকরাম’ বলা হলে তার অর্থ হবে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বা সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও সম্মানার্হ। হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে সকল নবী- রাসূলের (‘আঃ) মধ্যে তথা সমগ্র মানব প্রজাতির মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও সম্মানার্হ অর্থে “রাসূলে আকরাম” বলা হয়।

‘**আক্বাএদ্** (عقائد) : عقيدة (‘আক্বীদাহ্) শব্দের বহুবচন। ‘আক্বীদাহ্ মানে ‘বিশ্বাস’, তবে ভিত্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস নয়। পারিভাষিক অর্থে জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির অকাট্য রায় ও ঐশী কিতাব্ ভিত্তিক ধারণা। ইসলামে এ ধারণার মধ্যে রয়েছে তিনটি মৌলিক বিষয় এবং তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখা- প্রশাখাগত ধারণা। তিনটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে তাওহীদ, আখেরাত ও নবুওয়াত। এ তিনটি বিষয়কে اصول عقاءد (‘আক্বাএদের মূলনীতিমালা বা ‘আক্বাএদের ভিত্তিসমূহ) বলা হয়। (১) তাওহীদ বলতে বুঝায় : এ পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল জীবন ও জগতের পিছনে একজন মহাজ্ঞানময় ও সীমাহীন শক্তি-

ক্ষমতার অধিকারী একজন অক্ষয়- অব্যয় চিরন্তন চিরজীবী সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে - আরবী ভাষায় যাকে "আল্লাহ্" বলা হয়েছে। তিনি সকল পূর্ণতাবাচক গুণাবলীর অধিকারী এবং সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে মুক্ত। (২) আখেরাত্ বলতে বুঝায় : যেহেতু এ দুনিয়ার বুকে সকল ভালো- মন্দ ও ন্যায়- অন্যায়ের পুরস্কার ও শাস্তি কার্যকর হতে দেখা যায় না সেহেতু মানবপ্রকৃতি দাবী করে যে, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করে সৃষ্টিকর্তা এ পার্থিব জগতের শাস্তি ও পুরস্কারের অপূর্ণতাকে ৩১০ সম্পূরণ করুন। আর যেহেতু তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই মানুষের মনে এ ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন সেহেতু অবশ্যই তিনি তা করবেন। (৩) নবুওয়াতবলতে বুঝায়: যেহেতু মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধি সব ক্ষেত্রে তাকে পথ দেখাতে সক্ষম নয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে সহজাত প্রকৃতি ও বিচারবুদ্ধি দুর্বল ও বিকৃত হয়ে পড়ে, সেহেতু সহজাত প্রবণতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা, অসুস্থ হয়ে পড়া বিচারবুদ্ধির ভুল সংশোধন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলোতে পথ দেখানোর লক্ষ্যে সে খোদায়ী পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী। সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে তাঁর সর্বোত্তম বান্দাহদের মাধ্যমে এ ধরনের পথনির্দেশ দিয়েছেন। এ পর্যায়ের সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও সকল প্রকার ভুলত্রুটি ও বিকৃতি থেকে সুরক্ষার অধিকারী ক্বিয়ামত্ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পথনির্দেশ কোরআন মজীদ নাযিল্ হয় এখন থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর ওপর। তিনি সর্বশেষ নবী বিধায় তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবীর আগমন ঘটবে না। ফেরেশতা, বেহেশত- দোযখ ইত্যাদি বিষয় হচ্ছে 'আক্বাএদের প্রশাখাগত বিষয়। প্রথমতঃ 'আক্বাএদের তিনটি মৌলিক বিষয়ে বিচারবুদ্ধির আলোকে পর্যালোচনা করে ফয়ছালায় পৌঁছতে হবে। বিচারবুদ্ধি তাওহীদ, আখেরাত ও শেষ নবীর নবুওয়াতের সত্যতায় উপনীত হলে অতঃপর বিচারবুদ্ধির কাছে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে প্রমাণিত কোরআন মজীদের আলোকে 'আক্বাএদের এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান সম্প্রসারিত হবে ও অধিকতর শক্তিশালী হবে এবং সেই সথে 'আক্বাএদের প্রশাখাগত বিষয়গুলোর জ্ঞানও অর্জিত হবে।

'আক্বীদাহ্ (عقيدة): 'আক্বাএদ্- এর একবচন।

আখলাক্ : (اخلق) আচার- আচরণ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক এর মধ্যে শামিল।

আখলাক্বী (اخلقى): আখলাক্ সম্বন্ধীয়।

আখেরাত্ (آخرة): পরকাল। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, পার্থিব জীবনের ভালোমন্দ কাজের বিচার এবং তদনুযায়ী শাস্তি ও পুরষ্কার সহ অনন্ত জীবন। মৃত্যু ও পুনর্জীবনের মধ্যবর্তী সময়টিতে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে (نفس) একটি অন্তবর্তী জগতে রাখা হয় যাকে ‘আলমে বারযাখ বলা হয়।

আযাব্ (عذب): ইসলামী পরিভাষায় প্রাকৃতিক পন্থায় বা অতিপ্রাকৃতিক পন্থায় কোনো জনগোষ্ঠীকে সাধারণভাবে প্রদত্ত শাস্তি। এছাড়া অপরাধীদেরকে ‘আলমে বারযাখে বা কবরের জগতে যে শাস্তি দেয়া হয় এবং শেষ বিচারের পরে যে শাস্তি দেয়া হবে তাকেও ‘আযাব্ বলা হয়।

‘আরশ (عرش): শাব্দিক অর্থ ‘ডেক্’, যেমন : জাহাযের ডেককে ‘আরশ বলা হয়। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় ‘আরশ হচ্ছে এ পৃথিবীর বহির্ভূত ও মানবীয় জ্ঞানের আওতার বাইরে অবস্থিত এক বিশাল- বিস্তৃত ও বিস্ময়কর মহাসৃষ্টি - যার স্বরূপ একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলাই জানেন।

আলে ইব্রাহীম্ (آل ابرا هھم): হযরত ইবরাহীমের (‘আঃ) বংশধরগণ। পারিভাষিক অর্থে তাঁর বংশে আগত নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত মা‘ছুম্ ইমামগণ (‘আঃ)।

আলে ‘ইমরান (آل عمران): হযরত মূসা (‘আঃ)- এর পিতার নাম ছিলো ‘ইমরান। তেমনি হযরত মারইয়ামের (‘আঃ) পিতার নামও ছিলো ‘ইমরান। তবে আালে ‘ইমরান বলতে প্রথমোক্ত ‘ইমরানের বংশে আগত নবী- রাসূলগণ (‘আঃ) ও আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে মনোনীত মা‘ছুম্ ইমামগণকে (‘আঃ) বুঝানো হয়। আালে মুহাম্মাদ (آل محمد) : আহলে বাইত্ (‘আঃ)।

আশা'এরী (اشاعرى): আবূ মূসা আশ্'আরীর চিন্তা- বিশ্বাসের অনুসারী। আবূ মূসার মতে, মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই; আল্লাহ্ যা চান মানুষকে দিয়ে তা- ই করিয়ে নেন এবং মানুষ তা- ই (পাপ- পুণ্য নির্বিশেষে) করতে বাধ্য।

আহলে বাইত্ (اهل البيت): আভিধানিক অর্থ 'গৃহের অধিবাসী' অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তির বাড়ীতে বসবাসকারী তার পরিবারের সদস্য ও পোষ্যগণ। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় আহলে বাইত্ মানে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর আহলে বাইত্ - ব্যক্তি হিসেবে নয়, রাসূল হিসেবে। এতে শামিল নবী করীম (ছ্বাঃ)- এর কন্যা হযরত ফাত্বেমাহ্ ('আঃ) ও জামাতা হযরত আলী ('আঃ), তাঁদের দু'জনের সন্তান হযরত ইমাম হাসান ('আঃ) ও হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ) এবং হযরত ইমাম হোসেন ('আঃ)- এর বংশে আগত নয়জন মা'ছুম ইমাম ('আঃ)।

আয়াত (آية): শাব্দিক অর্থ নিদর্শন বা চিহ্ন। পারিভাষিক অর্থ বিশেষ খোদায়ী নিদর্শন। এ কারণেই মু'জিযাহকেও আয়াত্ বলা হয়। তবে শব্দটির প্রথম ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে কোরআন মজীদের বিশেষ তাৎপর্যজ্ঞাপক বাক্য, বা বাক্যসমষ্টি।

ইজতিহাদ (اجتهاد): গবেষণা। দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানসূত্রসমূহ অধ্যয়ন ও তা নিয়ে গবেষণা করে যুগসমস্যাবলীর সমাধান উদ্ভাবনের নাম ইজতিহাদ। এ কাজ যিনি করেন তাঁকে বলা হয় মুজতাহিদ্।

ইবেন রাসূলিল্লাহ্ (ابن رسول الله): আল্লাহর রাসূলের পুত্র বা বংশধর। আরবী ভাষায় ابن শব্দ 'পুত্র' ও 'পুরুষ বংশধর' - এ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর বংশধর তথা হযরত ফাত্বেমাহ্ ('আঃ)- এর বংশধর বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে সম্মান সহকারে "ইবেন রাসূলিল্লাহ্" বলে সম্বোধন করা হতো। তেমনি হযরত ফাত্বেমাহ্ ('আঃ) ও তাঁর কন্যা বংশধর মহীয়ষী নারীদেরকে "বিন্তে রাসূলিল্লাহ্" বলে সম্বোধন করা হতো।

'ইবাদত্ (عبادة): উপাসনা।

ইমাম (امام): নেতা। ইসলামী পারিভাষিক অর্থে বিশেষ দ্বীনী মর্যাদা সম্পন্ন দ্বীনী নেতা। যেমন : আহলে বাইতের ধারাবাহিকতায় আগত ইমামগণ (‘আঃ), চার সুন্নী মাযহাবের চার ইমাম। এছাড়া “ছ্বিহাহ্ সিত্তাহ্” নামে বিখ্যাত ছয়টি হাদীছগ্রন্থের সংকলকগণ ও আরো অনেক বিখ্যাত দ্বীনী ব্যক্তিত্বকে, যেমন : ইমাম খোমেইনী (রহ্ঃ) কে ইমাম বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া সাধারণ অর্থে, নামাযে যিনি সবার সামনে থাকেন - অন্যরা যার অনুসরণে নামায আদায় করে, তাঁকেও ইমাম বলা হয়।

ইলাহ (اله): উপাস্য। ইসলামে ‘ইবাদত্- উপাসনা ও নিরঙ্কুশ- নিঃশর্ত আনুগত্য লাভের একমাত্র অধিকারী (আল্লাহ্)।

ঈমান (ایمان): আভিধানিক অর্থ ‘নিরাপদকরণ’। ইসলামী পারিভাষিক অর্থ আল্লাহকে জীবন ও জগতের একমাত্র আদি উৎস ও ‘ইবাদত্- আনুগত্যের একমাত্র অধিকারী, মৃত্যুর পরে আল্লাহ্ মানুষকে পুনরায় জীবিত করে তাদের পার্থিব কাজের ভালোমন্দের পুরষ্কার ও শাস্তি দেবেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) মানুষের কাছে আল্লাহর আদেশ- নিষেধ পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বশেষ নবী ও রাসূল - এ বিষয়গুলোকে সত্য জানার পর তা মুখে ঘোষণা করা এবং তদনুযায়ী কাজ করে পরকালীন জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ করা।

‘ঈসা (عیسی): আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নবী - খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরা যাকে যীশূখৃস্ট বলে থাকে।

উম্মাত্ উম্মাহ্ /(امة): আদর্শভিত্তিক জাতি বা জনগোষ্ঠী। সমস্ত মুসলমানকে একত্রে “মুসলিম উম্মাহ্” বা “ইসলামী উম্মাহ্” বলা হয়।

এখতিয়ার (اختیار): আভিধানিক অর্থ ‘বেছে নেয়া’। ইসলামী কালামশাস্ত্রের পরিভাষায় মানুষের নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কাজ করা বা করা হতে বিরত থাকার ক্ষমতা। বাংলা ভাষায় আইনগত অধিকার ও কর্তৃত্ব অর্থে ব্যবহার করা হয়।

ওয়াহী (وحى): ঐশী প্রত্যাদেশ। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী- রাসূলগণের ('আঃ) নিকট সরাসরি বা ফেরেশ্তার মাধ্যমে পৌঁছানো জ্ঞান, বাণী ও নির্দেশাবলী।

করীম (كريم): সম্মানিত, সম্মানার্হ। নবী করীম - সম্মানিত নবী। কোরআনে করীম - বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সম্মানার্হ গ্রন্থ কোরআন।

ক্বাছীদাহ্ (قصيدة): বিশেষ ধরনের আরবী, ফার্সী বা উর্দূ কবিতা। সাধারণতঃ প্রশংসাবাচক বা গৌরবগাথা মূলক নাতিদীর্ঘ কবিতা।

কাফের (كافر): ইসলামী পরিভাষায় অমুসলিম - প্রধানতঃ নাস্তিক ও অংশীবাদী।

কা'বাহ্ (كعبة): পবিত্র মক্কাহ্ নগরীতে অবস্থিত মানবজাতির ইতিহাসের প্রাচীনতম গৃহ ও 'ইবাদত- গৃহ - যা প্রথমে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম ('আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয় এবং পরে তা হযরত ইব্রাহীম্ ('আঃ) কর্তৃক পুনঃনির্মিত হয়। এটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রতম গৃহ এবং মুসলমানরা এ গৃহের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে।

কায্যাব্ (كذاب): যে ব্যক্তি অত্যন্ত বেশী বা নিয়মিত মিথ্যা বলে। মুসাইলামাহ্ যেহেতু মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করেছিলো, সেহেতু (এহেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়ে মিথ্যা বলার কারণে) তাকে "মুসাইলামাহ্ কায্যাব্" (অতি বড় মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ্) বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্বারী (قارى): পাঠক। ইসলামী পারিভাষিক অর্থে যিনি দ্ধ করে ও নির্ধারিত সুললিত ভঙ্গিতে কোরআন পাঠ করেন। তবে ইসলামের প্রথম যুগে ক্বারী বলতে ধু দ্ধ ও সুন্দর করে কোরআন পাঠ সহ কোরআনের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে বুঝাতো।

কালাম্ (كلم): কথা, বক্তব্য। কালামশাস্ত্র ('ইলমে কালাম্) মানে ইসলামী 'আক্বাএদ্ সংক্রান্ত শাস্ত্র।

ক্বিবলাহ্ (قبلة): কেন্দ্র - যাকে সামনে রাখা হয়। ইসলামী পরিভাষায় মসজিদুল হারাম - মুসলমানরা যেদিকে মুখ করে নামায আদায় করে থাকে।

ক্বিয়াম্ (قيام): দাঁড়ানো। ইসলামী পরিভাষায় নামাযের একটি অংশ আদায়ের সময় দাঁড়ানো অবস্থা। এছাড়া ক্বিয়াম্- এর আরো অর্থ আছে, যেমন : জাগরণ ও অভ্যুত্থান।

ক্বিয়ামত্ (قيامة): শেষ বিচারের আগে সমগ্র সৃষ্টিলোকের ধ্বংস।

কেরাম (كرام): كريم - এর বহুবচন।

খবরে ওয়াহেদ্ (خبر واحد): হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রকরণ বাচক পরিভাষা। যে সব হাদীছ বিশেষ করে প্রথম দিককার কোনো স্তরে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু একাধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হলেও বর্ণনাকারীদের সংখ্যা তাওয়াতোর পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মতো বেশী নয়।

খোদা (خدا): "আল্লাহ্"র সমার্থক ফার্সী শব্দ।

গযব (غذب): ক্রোধ, অসন্তুষ্টি, আক্রোশ। পারিভাষিক অর্থে পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত শাস্তি। গ্বাফেল্ (غافل) : অমনোযোগী।

ছ্বাহীফাহ্ (صحيفة): ঐশী পুস্তিকা।

ছ্বালাত্ (صلة/ صلوة): নামায। কোরআন মজীদে এর ক্রিয়াপদ দরূদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

ছ্বাহাবী (صحابى): সঙ্গী। পারিভাষিক অর্থে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর সঙ্গী- সাথীগণ।

জান্নাত্ (جناة): বেহেশত, স্বর্গ; পরকালীন জীবনে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের বসবাসের স্থান।

জাবর (جبر) : বাধ্যতামূলক অবস্থা। কালামশাস্ত্রে "এখতিয়ার"- এর বিপরীত। অর্থাৎ মানুষ ধু তা- ই করে আল্লাহ্ তাকে দিয়ে যা করান - এ বিশ্বাস।

জাহান্নাম (جهنم): দোযখ, নরক।

জাহেলী যুগ (ايام جاهلية/ عهد جاهلية): মূর্খতার যুগ, অজ্ঞতার যুগ। আরবের ইসলাম- পূর্ব যুগ। তৎকালে আরবরা শিক্ষা, জ্ঞান- বিজ্ঞান, সভ্যতাসং স্কৃতি ও দ্বীনী হেদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিলো।

জিবরাঈল (جبرئيل): নবী- রাসূলগণের ('আঃ) নিকট ঐশী ওয়াহী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতা।

জ্বিন্ (جن): আগুনের উপাদানে তরী সূক্ষ্ম দেহধারী বুদ্ধিমান প্রজাতি।

তা'আলা (تعالى): সমুন্নত, মহান।

তাওহীদ্ (توحيد): এ সৃষ্টিলোকের অস্তিত্ব দান ও টিকিয়ে রাখার পিছনে একজন মাত্র চিরন্তন পরম জ্ঞানী ও অসীম ক্ষমতাবান সত্তা আছেন (আরবী পরিভাষায় যার নাম "আল্লাহ্") - যার সৃষ্টি ও পরিচালনায় অন্য কোনো অংশীদার নেই এবং এ কারণে তিনি ছাড়া কেউ ইবাদত- উপাসনা ও নিঃশর্ত আনুগত্যের অধিকারী নেই - এ মর্মে অকাট্য প্রত্যয় এবং তার মৌখিক ও কার্যতঃ স্বীকৃতি।

তাওয়াজ্জুহ্ (توجه) : মনোযোগ, দৃষ্টিদান।

তাওয়াতোর (تواتر): কোনো ঘটনার বর্ণনা বা কোনো উক্তির উদ্ধৃতি বর্ণনাকারীদের প্রতিটি স্তরে এতো বেশী সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত হওয়া যে সংখ্যক লোকের পক্ষে মিথ্যা রচনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্ভব বলে মনে করে না। এরূপ সূত্রে বর্ণিত হাদীছকে মুতাওয়াতির ((متواتر হাদীছ বলা হয়।

তাক্ওয়া (تقوى): আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা (ক্ষতিকর জিনিস থেকে)। ইসলামী পরিভাষায় পারলৌকিক জীবনে চরম ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত ও

সন্তুষ্টিদায়ক কার্যাবলী সম্পাদন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী ও সন্দেহজনক কার্যাবলী পুরোপুরি পরিহার করে চলা।

তাকভীনী (تكوينى): সৃষ্টি ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ঐশী কাজকর্ম।

দরূদ (درود): আভিধানিক অর্থ দো'আ। পারিভাষিক অর্থে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর জন্য বিশেষ দো'আ যাতে তাঁকে ও তাঁর নেককার বংশধরদেরকে অভিনন্দিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবেদন জানানো হয়। এ জন্য বিভিন্ন বিধিবদ্ধ বাক্য আছে। এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম বাক্য হচ্ছে : "আল্লাহুম্মা ছ্বাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ্ ওয়া আালে মুহাম্মাদ্ - হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আালে মুহাম্মাদেক অভিনন্দিত করুন।"

দলীল (دليل): প্রমাণ। লিপিবদ্ধ ডকুমেন্ট, সাক্ষ্য ও যুক্তিতর্ক তথা যার সাহায্যে কোনো কিছু প্রমাণ করা যায়। এর মধ্যে ডকুমেন্ট ও সাক্ষ্যকে বলা হয় دليل نقلى - উদ্ধৃতিযোগ্য দলীল এবং যুক্তিতর্ককে বলা হয় ليل عقليد - বিচারবুদ্ধিজাত দলীল।

দ্বীন (دين): পথ, পন্থা, ব্যবস্থা। এ পরিভাষাটির আরো অনেক অর্থ আছে। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য দেয়া জীবনের সকল দিক সম্পর্কে বিধিবিধান সম্বলিত ব্যবস্থা।

দো'আ (دعا): আভিধানিক অর্থ 'আহ্বান'। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের বা অন্যের ইহকালীন ও পরকালীন যে কেনো প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা।

দোযখ (دوزخ): জাহান্নাম, নরক।

নবী (نبى): আভিধানিক অর্থ বার্তাবাহক। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে আল্লাহর পসন্দনীয় ও আদিষ্ট পথ দেখানো ও সেদিকে আহ্বান করা এবং তাঁর পসন্দনীয় পথে চলার ভ পরিণতি, বিশেষতঃ পরকালীন পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদানের এবং

তাঁর অপসন্দনীয় পথে চলার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে, বিশেষতঃ পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

নবুওয়াত্ (نبوة): নবীর পদ।

না'উযু বিল্লাহি মিন্ যালিক্ (نعوذ بالله من ذالک): দো'আ বিশেষ - যার অর্থ : "আমরা ঐ (বিষয়/ বস্তু/ জিনিস/ কাজ/ কথা) থেকে আল্লাহর কাছে আ য় নিচ্ছি।" যা শোনা অনুচিত এমন কথা কানে এলে অথবা যা উচ্চারণ বা উদ্ধৃত করা অনুচিত অপরিহার্য প্রয়োজনে তা উচ্চারণ বা উদ্ধৃত করলে এ দো'আ পড়তে হয়। এক বচনে "নাঊযু" স্থলে "আ'উযু" বলা হয়।

নাযিল্ (نازل) : যা অবতরণ করে। খোদায়ী ওয়াহী অবস্তুগত জগত থেকে মানবিক জগতে মানগভাবে অবতরণ করে বিধায় একে ওয়াহী নাযিল্ হওয়া বলে।

নে'আমত্ (نعمة): দান, অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শারীরিক, মানসিক, নতিক এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত কল্যাণকর যতো কিছু দিয়েছেন তার সবই এর মধ্যে শামিল। এমনকি সে নিজ চেষ্টা-সাধনায় উত্তম ও কল্যাণকর যা কিছু অর্জন করে তা-ও আল্লাহ্ তা'আলার নে'আমত্। কারণ, সে সবের উপায়-উপকরণ এবং অর্জনকারী নিজে ও তার শক্তিক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলারই দান।

পরহেযগারী (پرهیزکاری): (ফার্সী শব্দ) তাক্ওয়ার অধিকারী হওয়া।

ফক্বীহ্ (فقيه): ইসলামের সকল দিক সম্পর্কে, বিশেষ করে সকল প্রকার করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী।

ফাসাদ (فساد): বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অমান্যমূলক কাজ, দুর্নীতি ইত্যাদি।

ফাছ্বাহাত্ (فصاحة): সাহিত্যগুিত বাচনৈপুণ্য। এ সম্পর্কে মূল গ্রন্থে 'বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ কী?' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফিকহী (فقهى): ফিক্বাহ্ সংক্রান্ত।

ফিক্বাহ্ (فقه): ‘ইবাদত- বন্দেগী, আচার- আচরণ, লেনদেন, আইন ও বিচার সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান।

ফিতনাহ্ (فتنة): পরীক্ষা। পারিভাষিক অর্থে দ্বীনী বিষয়ে বিভ্রান্তি, দিশাহারা অবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়।

ফিরক্বাহ্ (فرقة): প্রধানতঃ গৌণ ও বিশেষ ইজতিহাদী মতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধর্মীয় উপদল।

ফেরে া (فرشته): (ফার্সী শব্দ) সদাসর্বদা আল্লাহ্ তা‘আলার হুকুম পালনে নিরত একদল অবস্তুগত আত্মিক সৃষ্টি (আরবী : মালাক্; বহুবচনে মালাএকাহ্)।

বে গী (بندگى): (ফার্সী শব্দ) ‘ইবাদত- উপাসনা, দাসত্ব (আরবী : ‘ইবাদত্)।

বা াহ্ (بنده): (ফার্সী শব্দ) গোলাম, দাস (আরবী : ‘আব্দ্)।

বালাগ্বাত্ (بلغة): সাহিত্যমণ্ডিত বাচননৈপুণ্য। এ সম্পর্কে মূল গ্রন্থে ‘বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ কী?’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বেহে ্ (بهشت): (ফার্সী শব্দ) জান্নাত্, স্বর্গ।

মজীদ (مجيد): সম্মানিত, বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এ অর্থেই কোরআনকে “কোরআন মজীদ” বলা হয়।

মা হাব (مذهب): আভিধানিক অর্থ চলার পথ। পারিভাষিক অর্থ ইসলামের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উপদল এবং তার অনুসৃত বিধিবিধান।

মাসীহ্ : (مسيح) হযরত ‘ঈসা (‘আঃ)।

মুক্বাদ্দামাহ : (مقدمة) পটভূমি, ক্ষেত্র, পূর্বশর্ত, পূর্বপ্রস্তুতি, ভূমিকা। মূল কথা বা কাজের আগে অবস্থানের কারণে মুক্বাদ্দামাহ্ বলা হয়।

মুজতাহিদ্ : (مجتهد) ইজতিহাদকারী ও ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি।

মুতাওয়াতির: (متواتر) তাওয়াতোর পর্যায়ভুক্ত (হাদীছ ও বর্ণনা)।

মুনাজাত : (مناجات) দো'আ (প্রধানতঃ হাত তুলে)।

মুফাসসির: (مفسر) কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাকারী।

মুফাসসিরীন্ : (مفسرين) "মুফাসসির"- এর বহু বচন।

মুহাম্মাদ : (محمد) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বে ষ্ঠ নবীর নাম।

মোশরেক : (مشرک) অংশীবাদী, বহু- ঈশ্বরবাদী, পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারী।

মোস্তফা : (مصطفى) মহাসম্মানিত। রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)- এর অন্যতম খেতাব। (রহ্ঃ) : "রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি - তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত হোক।" মৃত বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তির নামোল্লেখের পর দো'আ বাচক বাক্য (এক বচনে পুরুষের জন্য)। এক বচনে নারীর জন্য "রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহা", দ্বিবচনে নারী- পুরুষ নির্বিশেষে "রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহিমা" ও বহুবচনে "রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহিম্" বলা হয়।

রাসূল্ : (رسول)"নবী" দ্রষ্টব্য।

রিসালাত্ : (رسالة) রাসূলের পদ।

রেওয়াইয়াত্ : (رواية) বর্ণনা। সাধারণতঃ ছ্বাহাবী ও তদপরবর্তী দ্বীনী ব্যক্তিত্বগণের বক্তব্য। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে নবী করীম (ছ্বাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছকেও রেওয়াইয়াত্ বলা হয়।

শরী'আত্ : (شرعية) দ্বীনী বিধিবিধান (সমষ্টিগতভাবে)।

শহীদ : (شهيد) আল্লাহর দ্বীনের প্রচার- প্রসার ও হেফাযতের চেষ্টা করার পরিণামে ইসলামের দুশমনদের হাতে নিহত ব্যক্তি।

শিয়া : (شيعة) মুসলমানদের মধ্যকার প্রধান দু'টি মাযহাবী ধারার অন্যতম। শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ওফাতের পর উম্মাতের দ্বীনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকার হযরত আলীর ('আঃ) এবং তাঁর ও হযরত ফাতেমার ('আঃ) সন্তান ও বংশধর আরো এগারো জন নিস্পাপ দ্বীনী ব্যক্তিত্বের (পর্যায়ক্রমিকভাবে) বলে 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে।

(**ছ্বাঃ**: (হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নামোচ্চারণ ও বণের পর দরূদ পড়ার নির্দেশক যাতে বলা হয় : "ছ্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম্ - আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠান"। বাংলা ভাষায় অতীতে এ জন্য সাধারণতঃ (দঃ) লেখা হতো, কারণ, তা আল্লাহ্ তা'আলার দরূদ পাঠানোর উল্লেখ নয়, বরং দরূদ পাঠের নির্দেশক। এ অর্থে, হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নামোচ্চারণ ও বণের পর দরূদ পড়তে হবে যার সংক্ষিপ্ততম হচ্ছে "আল্লাহুম্মা ছ্বাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ্ ওয়া আলে মুহাম্মাদ্ - হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের প্রতি দরূদ বর্ষণ করুন"।

সালাম্ : (سلم) শান্তি। মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে পরস্পরের উদ্দেশে আন্তরিক সম্ভাষণ ও দো'আ। সংক্ষিপ্ততম সালাম হচ্ছে : "সালামুন্ 'আলাইকুম" ও "আস্- সালামু 'আলাইকুম" যার মানে "আপনাদের ওপর সালাম" এবং এর জবাব "ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম" - যার অর্থ অভিন।ড়ব সেই সাথে আরো শব্দ যোগ করা যেতে পারে, যেমন : "আস্- সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়্ বারাকাতুহ্" ("আপনাদের ওপর সালাম্ এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক)।

সালামুল্লাহি 'আলাইহা : (سلم الله عليها) 'আলাইহাস্ সালাম্- এর বিকল্প।

সুন্নাত্ : (سنة) আদর্শ,   নীতি,   নিয়ম। ইসলামী পরিভাষায় হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর নির্দেশিত বা আচরিত অনুসরণীয় নীতি ও আচরণ। কথাটি ছ্বাহাবীগণের অনুসরণীয় আচরণ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়। সে ক্ষেত্রে "সুন্নাতে ছ্বাহাবাহ্" বলা হয়।

সুন্নী : (سنى) মুসলমানদের মধ্যকার প্রধান দু'টি মাযহাবী ধারার অন্যতম। সুন্নী মতে,   হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর ইন্তেকালের পর উম্মাতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বেছে নেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং উম্মাতের।

সূরাহ্ : (سورة) কোরআন মজীদের স্বতন্ত্র শিরোনামযুক্ত অধ্যায় সমূহ।

হযরত : (حضرت) বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিত্বগণের নামের রুতে উল্লেখনীয় সম্মানার্থক শব্দ যা ইংরেজী Excel l ency- এর সমার্থক।

হাদীছ : (حديث) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)- এর কথা ও কাজ এবং তাঁর সামনে সম্পাদিত ছ্বাহাবীগণের কাজ। সম্প্রসারিত অর্থে ছ্বাহাবীগণের শিক্ষণীয় কথা ও কাজকেও হাদীছ বলা হয় এবং এ জন্য সাধারণতঃ "হাদীছে ছ্বাহাবী" পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে হাদীছ অর্থে "রেওয়াইয়াত্" পরিভাষারও ব্যবহার আছে।

হাফেয : (حافظ) আভিধানিক অর্থ সংরক্ষক। পারিভাষিক অর্থ পুরো কোরআন মজীদ মুখস্তকারী ব্যক্তি।

হিকমত্ : (حكمة) পরম জ্ঞান,   অকাট্য জ্ঞান,   প্রজ্ঞা।

হিজরত : (هجرة)ইসলাম গ্রহণ বা ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের কারণে ইসলামের দুশমনদের দুশমনীর ফলে নিজ জন্মভূমি বা বাসস্থানে বসবাস করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ায় অন্যত্র চলে যাওয়া ও তথায় অভিবাসী হওয়া।

হুরূফে মুক্বা ত্বা'আত্ : (حروف مقطعات) কোরআন মজীদের কোনো কোনো সূরাহর শুরুতে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি যা ঐ সূরাহর প্রথম আয়াত্ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, যেমন : الم، الر، يس ইত্যাদি। এসব হরফের তাৎপর্য নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিশ্চয়তার সাথে যা বলা যায় তা হচ্ছে, তৎকালে আরবদের মধ্যে বক্তৃতা ভাষণের শুরুতে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণসমষ্টি উচ্চারণের প্রচলন ছিলো এবং এ কারণেই মোশরেকরা এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলে নি এবং ছ্বাহাবীগণও এগুলোর অর্থ জানতে চান নি।

হেদায়াত্ : (هداية) পথনির্দেশ, পথপ্রদর্শন, পরিচালনা করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়া।

সূচীপত্র:

ভূমিকা 2

মানুষ খোদায়ী পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী 3

কোরআন মজীদ ও আরবী ভাষার চূড়ান্ত বিকাশ 8

কোরআন ও নুযূলে কোরআন 17

কোরআনের স্বরূপ 25

কোরআন নাযিলের ধরন 32

কোরআনের ভাষাগত রূপ আল্লাহর 36

সাত যাহের্ ও সাত বাত্বেন্ 42

কোরআন কেন আরবী ভাষায় নাযিল্ হলো 47

রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) ও কোরআনের বিশ্বজনীনতা 52

আরবী ভাষার বিকাশে খোদায়ী হস্তক্ষেপ 58

কোরআন আরবী হওয়ার মানে কী? 65

আরবী ভাষার শব্দবিবর্তন সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত 73

বালাগ্বাত্ ও ফাছ্বাহাত্ কী? 85

কোরআনকে জাদু বলার কারণ 97

কোরআনের অলৌকিকতা 101

নবুওয়াত প্রমাণে মু'জিযাহর ভূমিকা 110

মু'জিযাহর যথোপযুক্ততা 115

কোরআন অবিনশ্বর মু‘জিযাহ্ 121
জাহেলী আরবদের পথনির্দেশনায় কোরআনের ভূমিকা 133
জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-মনীষী জন্মদানে কোরআনের অবদান 136
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে কোরআনের অলৌকিকতা 143
বাইবেলে আল্লাহ্ ও নবীদের (আঃ) পরিচয় 154
সামঞ্জস্যের বিচারে কোরআনের অলৌকিকতা 167
কোরআনে স্ববিরোধিতা নেই 168
প্রচলিত ইনজীলে স্ববিরোধিতা 172
ধর্মীয় বিধান ও আইন প্রণয়নে কোরআন 175
জাহেলী আরবদের বিস্ময়কর পরিবর্তন 176
ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা 179
দানে উৎসাহ ও কার্পণ্যের নিন্দা 181
অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ 182
নরহত্যার শাস্তি 184
ইহ-পারলৌকিক বিধিবিধানের সমন্বয় 185
বিবাহে উৎসাহ প্রদান 189
ভালো কাজে আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিরোধ 192
শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড জ্ঞান ও ন্যায়নিষ্ঠা 194

অকাট্য তথ্য উপস্থাপনে কোরআন মজীদ 197
কোরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণী 200
মক্কাহ্ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী 206
কতিপয় বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী 208
কোরআন মজীদে সৃষ্টিরহস্য 213
কোরআন মজীদের বালাগ্বাত্-ফাছ্বাহাত্ ও জ্ঞানগর্ভতার একটি দৃষ্টান্ত 228
অন্ধ আপত্তি : বিভ্রান্তি সৃষ্টিই উদ্দেশ্য 235
কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ (!) 284
সূরাহ্ কাওছারের বিকল্প ! 296
কোরআন মজীদ রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) শ্রেষ্ঠতম মুজিযাহ্ 303
মু'জিযাহর দাবী প্রত্যাখ্যানের দলীল - ১ 308
মু'জিযাহর দাবী প্রত্যাখ্যানের দলীল - ২ 321
মু'জিযাহর দাবী প্রত্যাখ্যানের দলীল - ৩ 331
তাওরাত্-ইনজীলে হযরত মুহাম্মাদের (ছ্বাঃ) নবুওয়াত্ 338
কোরআনে ফির্'আউনের উক্তির উদ্ধৃতি কি মু'জিযাহ্? 342
১৯ সংখ্যার মু'জিযাহর নামে বিভ্রান্তি 347
কোরআন অবিনশ্বর মু'জিযাহ্ 348
আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতির বিবর্তন 371

ব্যব ত কতিপয় পরিভাষা.................................. 380